শারদীয় যুগ্মসংখ্যা ১৩৮৩

পরিচয়

"Ye shall know the truth and the truth shall make you free"

— *The New Testament*

অন্নদাশঙ্কর রায়—সাহিত্যের সঙ্কট

মোহিতলালের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

বিভূতিভূষণের "নোটবুক"

হিরণ কুমার সান্যাল—সুকুমার রায় প্রসঙ্গে

ফকিরমোহন সেনাপতি—আত্মজীবনচরিত

সল্‌ঝেনিট্‌সিন—পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতি চেতাবনী

বারিদবরণ ঘোষ—রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা গ্রন্থ

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক—প্রাচীন পল্লীগাথার সুর ও কাব্যসংবাদ

নীলরতন সেন—শিক্ষা প্রসঙ্গ

সাধনকুমার ঘোষ – পথে-বিপথে

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার-মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প-প্রত্যয়

এ ছাড়া দুটি গল্প, একটি ধারাবাহিক উপন্যাস, ১০টি কবিতা, সমাজচিন্তা প্রভৃতি

দীঘার সমুদ্র সৈকতে

হোটেল 'সী'-হক

রেস্তরা ও বার সহ

অতি আধুনিক ভাবে সুসজ্জিত।

ভারত সরকারের পর্যটক মন্ত্রণালয় এবং কেসামরিক বিমান পর্যটক বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত।

ফোন, কলিকাতা ৫৭ ২০৪৮/৩৩৮২
ফোন, দীঘা ৩৫ এবং ৪৬

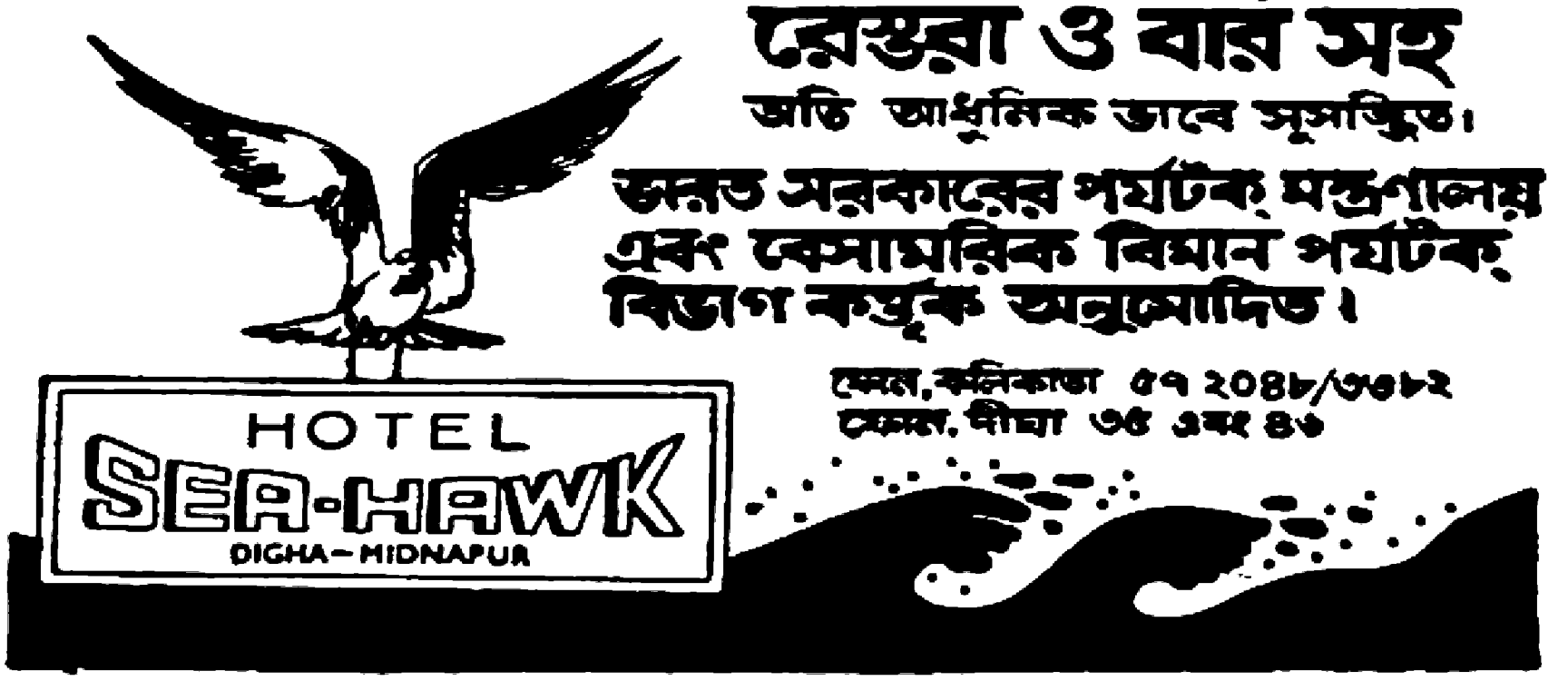

একটি শিশুর সোনার থালা
দুটি হলেও আদর।
অধিক মানে অবহেলা
কেবলই চড়চাপড়।

আগে সঞ্চয় পরে সন্তান

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBI PUBS768B

ডব্লিউ-বি-আই-ডি-সি কি আপনার তালিকায় আছে ?

মঞ্জুরীকৃত মোট অর্থ ৩০ কোটিরও বেশী। গত বছরে মোট প্রদত্ত অর্থ ২·৪৭ কোটি টাকা। (তার আগের বছরের ৪৬ লক্ষ তুলনীয়) সাহায্যপ্রাপ্ত মোট শিল্পের সংখ্যা — ৯৭

এদের মধ্যে ২৫টির উৎপাদন ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে।

কাদের সাহায্য করা হচ্ছে ? মাঝারী বা বড় বেসরকারী শিল্প যাদের শিল্প সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বাবদ স্থায়ী বিনিয়োগ ১০ লক্ষ টাকার বেশী।

কি জন্য ? বর্তমান শিল্পের যথেষ্ট সম্প্রসারণ (স্থায়ী সম্পদের ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি), বিকীর্ণকরণ বা পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প স্থাপন।

কেমন করে ? পরিকল্পনা রূপায়নে কার্যকারিতা সম্বন্ধে গবেষণা, শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ, বিক্রয়কর ফেরৎ, বৈদ্যুতিকশক্তি বাবদ ব্যয়ের আংশিক পরিপূরণ, অকট্রয় করের পরিপূরণ এবং অনুন্নত এলাকায় শিল্পস্থাপনে বিশেষ সাহায্যদান।

ডব্লিউ-বি-আই-ডি-সির সঙ্গতি কতখানি ? শেয়ার মূলধন ৩·৪৩ কোটি টাকা এবং বণ্ড বিক্রয়লব্ধ আয় ৮·৮ কোটি টাকা। শিল্পকে উৎসাহমূলক সাহায্যদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য সরকার দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া শিল্পোদ্যোগীদের শিল্প পরিকল্পনায় এবং শিল্পোন্নয়নে যথাযথ পরামর্শ দেবার জন্য আছেন প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ কর্মীবৃন্দ।

আর কিছু প্রশ্ন আছে ? ডনসংযোগ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করুন।

WbidC

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভালেপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ

২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

টেলিফোন : ২২-২৪৪৮, ২৩-১৬১৫, ২৩-১৬২৮

With Compliments from :

BABLONS

16, Maulana Abul Kalam Azad Road
Howrah-711101

Manufacturers of Readymade Garments
Exporters and Importers.

রপ্তানী বাড়াতে হবে

- বৈদেশিক মুদ্রা চাই আমাদের
  পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য
- ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যে চাই আরো বাজার

॥ ক্ষুদ্রশিল্প থেকে রপ্তানী ক্রমশ বাড়ছে ॥

॥ আমাদের পণ্যের বাজার দেশে বিদেশে ॥

খবরাখবর এবং সাহায্যের জন্যে
আসুন

এক্সপোর্ট সেল, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পাধিকার

নতুন মহাকরণ ভবন (দশমতল)
কলিকাতা-১

কাশ্মীর চলুন

কাশ্মীর সরকার অনুমো দত একমাত্র বাঙালী হোটেল

হোটেল এমব্যাসী

ডালগেট, শ্রীনগর

সপরিবারে সঠিক খরচে কাশ্মীরে থাকা-খাওয়া, দর্শনীয় স্থান দর্শনের ব্যবস্থা অথবা কলকাতা থেকে সরাসরি কাশ্মীর প্যাকেজটুরে এবং দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারত প্রভৃতি ভ্রমণের ব্যবস্থা। গ্রুপক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা।

মহারাজা ট্রাভেল্‌স্‌

৯, লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩-০৪৯১

দেশের কল্যাণে

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা

আজই যে কোন পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়ে ছোট পরিবার সম্পর্কে খবর নিন।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা—৩১০/৭৬-৭৭

পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সংস্থা হইতে প্রচারিত।

উৎসবে আনন্দে

বাংলার রেশম

প্রাধিকারিক (রেশম)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩/১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১

ফোন নং : ২৩-২২১৪

আমরা দুঃখিত আমরা অসহায়

সারা রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজটা কিছু ছেলে-খেলা নয়। মাঠ, ঘাট, নদী, নালা, পাহাড় পেরিয়ে বিদ্যুৎবাহী স্তম্ভ রাজ্যের আনাচে কানাচে বিদ্যুৎ বয়ে নিয়ে চলেছে। আর এই কাজে নিয়োজিত আছেন আমাদের অসংখ্য কর্ম্মী। কিন্তু কিছু সমাজবিরোধীদের দৌরাত্মে আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম পণ্ড হতে চলেছে। বিদ্যুৎ স্তম্ভের নানা অংশ চুরি করে এই সব দুর্বৃত্ত গোটা ব্যবস্থাকেই বানচাল করে দিতে বসেছে। এ ধরণের চুরি চামারির ফলে বিদ্যুৎ স্তম্ভের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং কালবৈশাখীর ঝাপটায় সেগুলি সহজেই ভূমিসাৎ হচ্ছে। ফল তো আপনারা নিজেরাই দেখছেন—বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষেতে জল যাচ্ছে না, ট্রেন মাঝ পথে আটকে পড়ছে, কল-কারখানার কাজ বন্ধ হবার উপক্রম। এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য আমরা আন্তরিত দুঃখিত। কিন্তু আমরা একান্তই অসহায়। সারা রাজ্য জুড়ে এ ধরণের দৌরাত্ম্য বন্ধ আমাদের সাধ্যের বাইরে, এমন কি পুলিশেরও। অথচ চুরি বন্ধ না হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা প্রায় অসাধ্য।

এর প্রতিকার আপনাদেরই হাতে। আপনারা যদি সংঘবদ্ধ-ভাবে সমাজবিরোধীদের মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন, তাহলে কিছুটা সুরাহা হতে পারে। কোন চুরির খবর পেলেই পর্ষতের দপ্তরে বা পুলিশে খবর দিন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে পুরস্কারও পেতে পারেন।

সমাজবিরোধীদের প্রতিহত করতে এগিয়ে আসুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

Build to Last With

A. C. C. CEMENT

Ask For

Silvicrete

A. C. C. WHITE CEMENT

ACCOPROOF WATERPROOFING ADDITIVE

Jyotsna Majumder

Authorised Stockist of A. C. C. CEMENT

A/9-12 SHOP

Post. KALYANI, Dist, NADIA.

Phone : 622 Kalyani

লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিপার্টমেণ্ট অব লেবার কর্তৃক প্রকাশিত, লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এ অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে আছে অমূল্য আকর্ষণীয় গ্রাফসমূহের পাশাপাশি শ্রমসম্পর্কিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন ডাইরেক্টরেটসমূহের কার্যাবলীর উপর বাৎসরিক, তথ্যমূলক ও পরিসংখ্যানগত খবরাখবর, যেমন সরকারের শ্রমনীতি, শ্রম-আইন, শিল্পগত সম্পর্ক, বয়লার সার্ভিস, চাকরি, বেতন ও আয়, সমাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাবলী, ই এস আই স্কীম, এমপ্লয়িজ ইনসিওয়েন্স কোর্ট, শ্রমকারী মানুষের ক্ষতিপূরণ, এমপ্লয়িজ প্রোভিডেণ্ট ফাণ্ড স্কীম, গ্রাচুইটি, বেতনহারের জীবনযাত্রার খরচের সাধারণ পরিমাণ, ইণ্ডাজট্রিয়াল হাউসিং শ্রমিকদের শিক্ষা, অনুসন্ধান ও পুংখানুপুংখ পরীক্ষা, কৃষিজ শ্রমিকবৃন্দ ইত্যাদি।

শ্রম তথ্য সম্পর্কে এটি বাস্তবিকই একটি প্রয়োজনীয় পুস্তক এবং এটি নিয়োগকর্ত্তাবৃন্দ, চাকরিতে নিযুক্তদের ও তারপরে ব্যাপকভাবে কৌতুহলী জনসাধারণকে উপকৃত করতে পারে। এই বাৎসরিক প্রকাশনের মূল্য ধার্য হয়েছে প্রতি কপি ৫টাকা।

সুপারিনটেনডেণ্ট, গভর্নমেণ্ট প্রিণ্টিং ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ৩৮ গোপালনগর রোড, কলকাতা-২৭ থেকে বা পাবলিকেশন সেলস কাউণ্টার, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ কে. এস. রায় রোড, কলিকাতা-১ থেকে কপিসমূহ পাওয়া যেতে পারে।

লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৯৭৪ প্রকাশিত হয়েছিল মা ১৯৭৫-এ এবং লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ১৯৭৫ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ৬৯০৩/৭৬

With Compliments from :

RAMSARUP INDUSTRIAL CORPORATION

Prop: Ramsarup Engineering Industries (P) LTD

Manufacturers of All types of Steel wires
and Bright bars.

Regtd. Office :
66, Parwati Ghosh Lane,
Calcutta-700007
Phone : 34-5146
34-7574

Factory :
D' Block Kalyani (W.B.)
Phone : Kalyani 300
Gram : REJOICE

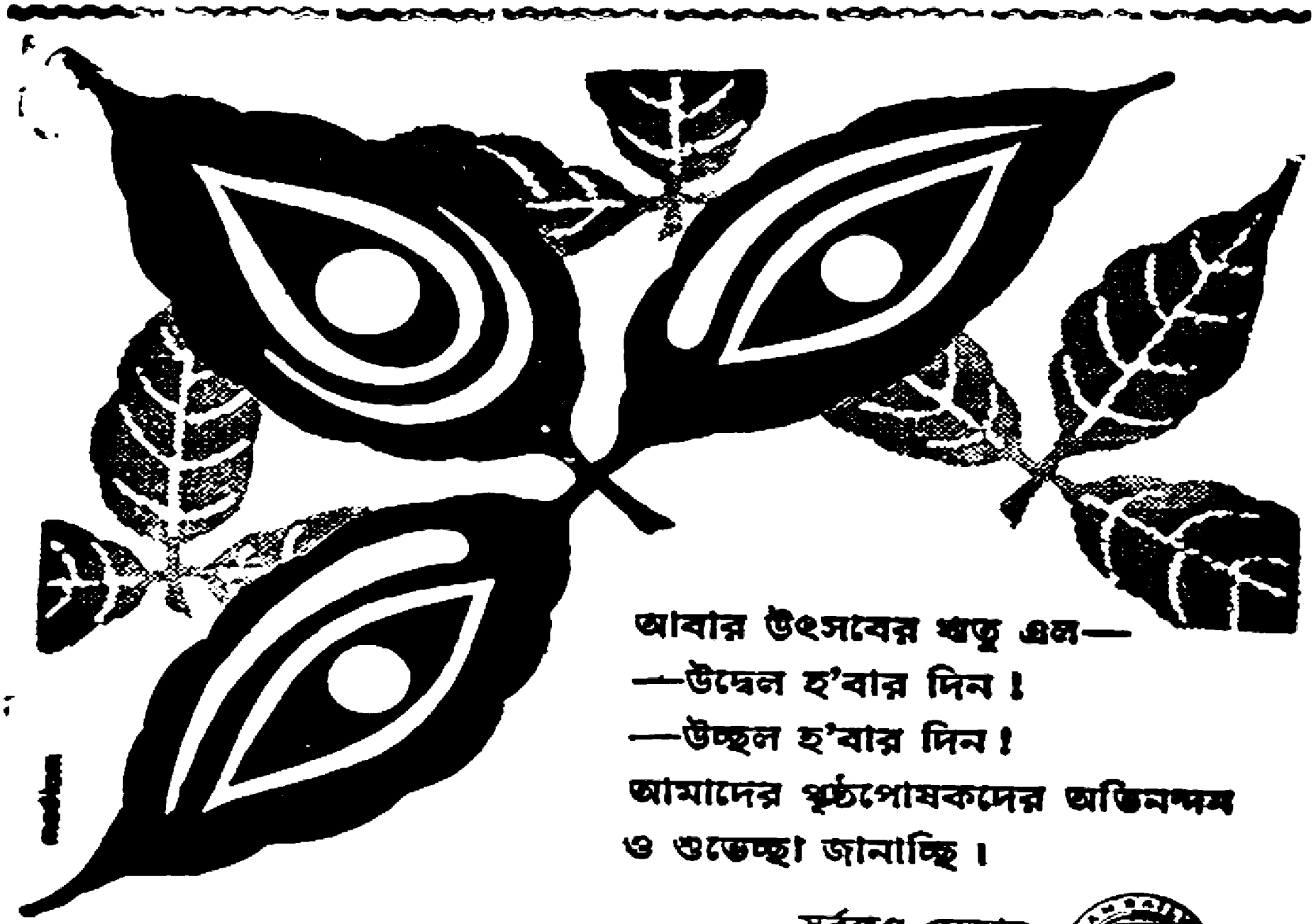

আবার উৎসবের ঋতু এল—
—উদ্বেল হ'বার দিন।
—উচ্ছল হ'বার দিন।
আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের অভিনন্দন
ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বক্ষণ সেবায়
দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ

For your Pleasant DEEGHA trip

Reserve accommodation at

"Bank of Baroda—
M. G. Road Branch—
Staff-Holiday Home"

Contact :

Dial—33-8834
33-1470

Staff Recreation Committee
Bank of Baroda
172, Mahatma Gandhi Road
Calcutta-7

By Courtesy of :

Bhikamchand Dwipchand Bhura

King Cotton Exporters

35, Armenian Street,
Calcutta-700001

Puhlicalion of University Text books :

Undergraduate Level

English Text-books for U.E., B.A. & B. Com. Courses

Essays & Stories **Rs. 5·00**

Poems & Plays **Rs. 5·00**

Sanskrit Text-book for U.E., & B. A. Courses

সংস্কৃত পাঠমালা ৭·৫০ টাকা

Bengali Text-books for U.E., B.A. & B. Com. Courses

সাহিত্য সঙ্কলন ৩·০০ টাকা **বাংলা প্রবন্ধ** ৬·০০ টাকা

আধুনিক কালের কবিতা ৫·০০ টাকা

General Books : Recently Published

Professional Ethics of the Advocate :

Ex. C J. Dr. P. B, Mukherjee

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের

তিনটি অমূল্য গ্রন্থ—

তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত (১ম ও ২য় খণ্ড)

প্রতি খণ্ড ১০·০০

Aspects of Indian Thought **Rs. 25·00**

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ, বর্ধমান।

নূতন ও পুরাতন সব আলেখ্যর জন্য

খোঁজ করুন—

শঙ্কর বুক ষ্টল

২১০/১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

(গড়িয়াহাট জংশনের নিকট)

Puja Greetings

From

M|s. B. C. DAS

Agent (Registered Stockist)

HINDUSTHAN LEVER LTD

17/16 (S) Market No. 2

KALYANI

Dist. —NADIA

W. Bengal

রবীন্দ্রসাহিত্য

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা

'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৩৪) প্রকাশিত শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রালংকৃত 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'র স্বত বিশেষ সংস্করণ। মূল্য ৭·৫০, শোভন ১২·০০ টাকা।

বৈকালী

'প্রবাসী' পত্রে প্রেরিত বৈকালী'-র পাণ্ডুলিপি এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের পঞ্চাশবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) প্রচারিত অসম্পূর্ণ 'বৈকালী' একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে মুদ্রিত এই গ্রন্থ 'লেখন'-এর সগোত্র। গ্রন্থশেষে রচনার ইতিহাস ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংকলিত। মূল্য ১৪·০০, শোভন ১৮·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

১০ প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭১

* দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং ও কালিম্পং পার্বত্য বনাঞ্চলের অরণ্য সম্পদের সমৃদ্ধি সাধনে—

* বনজদ্রব্যভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে—

* উত্তরবঙ্গের অনুন্নত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে—

এক টি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ !

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন করপোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-৭০০০১৩

MANY PHYSICAL DISABILTIES
CAN BE PREVENTED
AND
SOME DISABILITIES CAN BE
MINIMISED

**LET US KNOW YOUR PARTICUIAR PROBLEM,
AND IN CASE**

You require any PROSTHETIC AID like a Caliper or an artificial limb or a pair of crutches or orthopaedic shoes or a hearing aid or even an invalid chair or any other aid, BUT CANNOT AFFORD TO PURCHASE IT,—

Let Us Do it For You

Apply to :

The Directorate Of Social Welfare,
West Bengal,

45, Ganesh Chandra Avenue,
Calcutta-13

৭ম বর্ষ
১ম ও ২য় সংখ্যা

আলেখ্য

আষাঢ়-শ্রাবণ
ভাদ্র-আশ্বিন
১৩৮৩

সূচীপত্র

সাহিত্যিকের সঙ্কট ॥ অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ ১
মোহিতলালের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ॥ ৮
রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা গ্রন্থ ॥ বারিদবরণ ঘোষ ॥ ২৮
বিভূতিভূষণের "নোটবুক" ॥ চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪৩
সুকুমার প্রসঙ্গ ॥ হিরণকুমার সান্যাল ॥ ৫৫
পথে-বিপথে ॥ সাধনকুমার ঘোষ ॥ ৬৫
আঁধারের ওপারে (উপন্যাস) ॥ মৈনাক ॥ ৮১
পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথা-সাহিত্যের সুর ও কাব্যসম্পদ ॥
ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ॥ ৯৩
একারম্যান ও গ্যোটের আলাপচারী ॥ অনুঃ তীর্থরেণু দাস ॥ ১০৫
আনন্দ (গল্প) ॥ চুনীলাল রায় ॥ ১০৯
ফকীরমোহন সেনাপতির আত্মজীবন চরিত ॥ দিলীপকুমার বিশ্বাস ॥ ১২২
একটি সেকালিনীর কাহিনী (গল্প) ॥ সরোজেন্দ্রনাথ রায় ॥ ১৩১
শিক্ষা-প্রসঙ্গ ॥ নীলরতন সেন ॥
কবিতাগুচ্ছ ॥ ১৫:—১৬৬
পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতি চেতাবনী ॥ সল্‌ঝেনিট্‌সীন ॥ ১৬৭
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে শিল্প-প্রত্যয় ॥ রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার ॥ ১৮৩
সমাজচিন্তা ॥ ১৯৪

সম্পাদক—ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষাল
৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ
কলিকাতা-৩২
ফোন : ৪২-১৫৬২

মূল্য—এই সংখ্যার
৪৲ টাকা
গ্রাহক চাঁদা—বার্ষিক
৯টাকা (সডাক)

৭ম বর্ষ,
১ম-২য় সংখ্যা

আলেখ্য

আষাঢ়-শ্রাবণ
ভাদ্র-আশ্বিন
১৩৮৩

সাহিত্যিকের সঙ্কট

অন্নদাশঙ্কর রায়

লেখকের স্বাধীনতা আমার কাছে একটা বিলাসিতা নয়, একটা আরামের জিনিষ নয়, একটা প্রাণসম্পর্কিত প্রয়োজন। একটা ভাইটাল নেসেসিটি। যে লেখা স্বাধীনভাবে লিখিত নয় সে লেখায় আর সব কিছু থাকতে পারে, কিন্তু মানুষটি নেই। অমন একটা নৈর্ব্যক্তিক রচনা যন্ত্রের দ্বারাও লিখিত হতে পারে। কম্‌পিউটারকেও একদিন সেকাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু সে রকম লেখা কখনো সাহিত্য বলে গণ্য হবে না। যে দেশের লোক সাহিত্য ভালোবাসে সে দেশের লোক সাহিত্যিককে স্বাধীনতা দিতেও ভালোবাসে, নয়তো নিজেরাই বঞ্চিত হয়।

অবশ্য স্বাধীনতামাত্রেরই অপব্যবহার হয়ে থাকে। সব দেশে ও সব যুগে কতক লেখক স্বাধীনতার অপব্যবহার করে চারদিক থেকে অঙ্কুশ ডেকে আনে। কিন্তু কতক লেখকের দায়িত্বহীনতার জন্যে যদি সব লেখকের স্বাধীনতার উপর অঙ্কুশ প্রয়োগ করা হয় তবে দেশের সাহিত্য হয় নিতান্ত একটা ফরমাশী ব্যাপার। মধ্যযুগে তার চরম হয়েছিল। রেনেসাঁস এসে লেখককে শিল্পীকে মুক্তি দিল। তা না হলে কবিরা হতেন রাজার বা পোপের সভাকবি। শিল্পীরা হতেন রাজার বা পোপের সভাশিল্পী।

একালে আবার এক নতুন দাবী উঠেছে। কবিকে আবার সভাকবি হতে হবে—জনতার বা জনতার যাঁরা প্রতিনিধি তাঁদের। এ দাবী মেনে নিলে নতুন এক মধ্যযুগের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। যে যুগে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক ও টেকনোলজিকাল প্রগতি ঘটবে, সেই সঙ্গে ভূতপূর্ব সাহিত্যিক তথা সাংস্কৃতিক দুর্গতি। প্রগতি ও দুর্গতির এককালীন সহ-অবস্থান ধীরে ধীরে লোকের গা-সওয়া হয়ে যাবে। কেউ একবার জিজ্ঞাসাও করবে না কেন আর টলস্টয়, ডসটয়েভস্কি, টুর্গেনেভ, চেকভ, গর্কি জন্মান না। এখন তো দুধ আর মধুতে দেশ ভেসে যাচ্ছে। জন্মালে ক্ষীর সর ননী মাখনের

তো অভাব হতো না।

এর উত্তর, লেখকেরা যা খেয়ে বাঁচে তা আর পাঁচজন মানুষের মতো ভাত রুটি, কিন্তু শুধু তাই নয়। ওদের খোরাকের তালিকায় পড়ে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কল্পনা, স্বাধীন অনুভূতি, স্বাধীন ভাবপ্রকাশ। অপব্যবহার হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারো, কিন্তু পাছে অপব্যবহার হয় তার জন্যে ব্যবহার মাত্রই নিরোধ করতে পারো না। অপব্যবহার যারা করে তাদের ক্ষমতা সরস্বতী স্বয়ং কেড়ে নেন। তেমনি অব্যবহার করলেও ক্ষমতা চলে যায়। এটাও সরস্বতীর নিয়ম। প্রকৃতির নিয়মও তাই। পায়ের ব্যবহার না করলে পায়ের জোর থাকে না। হাতের ব্যবহার না করলে হাত ঠুঁটো হয়ে যায়। যেমন ঊর্ধ্ববাহুর। দিনরাত শুয়ে থাকলে শরীর অসাড় হয়ে যায়। দেহের মতো মনেরও চালনা চাই। নইলে মন হয়ে যায় অচল। দেশটাও হয়ে যায় অচলায়তন।

অপব্যবহার একদিকে। অব্যবহার আরেকদিকে। দুটোই লেখকের পক্ষে খারাপ। মাঝখানে লেখনীর সদ্ব্যবহার। এ না হলে সাহিত্যের সৃষ্টি বা বিকাশ হয় না। একই কথা শিল্পের বেলাও খাটে। সদ্ব্যবহারের স্বাধীনতা প্রত্যেক লেখকের মৌল অধিকার। বলা যেতে পারে জন্মস্বত্ব। এতে হস্তক্ষেপ করতে হলে একশোবার ভাবতে হয়। চোখ বুজে কোনো একটা ফরমুলা অনুসারে কাটছাঁট করলে যাঁর উপর অন্যায় করা হয় তিনি সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁর উপর অন্যায় করলে তিনি বরদা হবেন না। বৃথা হবে আনুষ্ঠানিক সরস্বতী পূজা। সরস্বতীবর্জিত দেশ হবে সাহিত্যবর্জিত। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে নয়। অজস্র পুস্তক ও পত্রিকা বেরোবে, রোজগারও মন্দ হবে না, তবু সাহিত্যের মান নেমে যাবে, নেমে যাবে সাহিত্যিকেরও মান। রাষ্ট্রের বশংবদ সাহিত্যিক আর রাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ সিপাই একসারিতে বসবে। সিপাইকে অবজ্ঞা করতে চাইনে, সে বা করে তা কি কম দরকারী? তবু সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার প্রতিভূ আজ্ঞাবহ সিপাই নয়, স্বাধীনতাসম্পন্ন মুনি ঋষি, কবি মনীষী, রূপকার সুরকার, যাঁরা না থাকলে সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলতে বিশেষ কিছু থাকে না।

মানুষমাত্রেরই চাই মনুষ্যমর্যাদা, হিউমান ডিগনিটি। কিন্তু তার জন্যে সংগ্রম করতে এগিয়ে আসেন প্রধানত দেশের সাহিত্যিক দার্শনিক

বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সারস্বতগণ। এঁরাও একটা আমি, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ নন, অপরের দ্বারা পরিচালিত নন, বৈতনিক নন। যে দেশে মনুষ্যমর্যাদার জন্যে সংগ্রাম নেই, সংগ্রামকারী নেই, সংগ্রামী ঐতিহ্য নেই সে দেশের মানুষ সুখে থাকতে পারে, স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের হিউমান ডিগনিটি থাকে না। তারা ভুলেই যায় যে মনুষ্যমর্যাদাই সর্বোত্তম মূল্য। গাড়ী, বাড়ী, নারী, সম্পত্তি ও সম্পদ নিয়েই তারা ভুলে থাকে। রোগে শোকে জরা-মৃত্যুকালে একজন গুরু মিলে গেলেই তাদের সর্বার্থসিদ্ধি। এসব যদি সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যায় তবে ধনী দরিদ্রে ভেদ থাকে না। সবাইকে নিয়ে হয় সমসমাজ। কিন্তু কোথায় সেই হিউমান ডিগনিটি, যা বহু তপস্যার ফল?

যৌবনে পড়েছিলুম Julien Benda প্রণীত ফরাসী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। 'La Trahison des clercs' বা বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসঘাতকতা সৈনিকদের বিশ্বাসঘাতকতার মতোই ভয়ঙ্কর। এঁদের বিশ্বাসঘাতকতা দেশের বা রাষ্ট্রের প্রতি নয়, মানুষের জীবনে যা শ্রেষ্ঠ মূল্য তার প্রতি। সত্যের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি, প্রেমের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি, কল্যাণের প্রতি। জাতিবৈর, শ্রেণীবৈর, বর্ণবৈর, এঁদের হিংসা প্রতিহিংসার আবর্তে টেনে নিয়ে যায়। ভারতে তো আমরা দেখলুম সম্প্রদায়বৈর কী নৃশংসতাই না ঘটাল! সেদিন বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসঘাতকতাও দেখা গেল।

এখন কথা হচ্ছে, কাদের স্বাধীনতার জন্যে আমি লড়তে যাব? যেসব বুদ্ধিজীবী স্বাধীনতা পেলেই তা দিয়ে মানবিক মূল্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন তাঁদের স্বাধীনতার জন্যে? যেসব ব্রহ্মদৈত্যকে বোতলে বন্ধ করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের বোতলের ছিপি খুলে দিলেই কি তাঁদের স্বভাব শোধরাবে? তাঁরা নিরীহজনের ঘাড় মটকাবেন না? সমস্যা তো এইখানেই যে শাসকদের মতে এঁদের আবদ্ধ রাখাই নিরাপদ। অথচ এঁদের মধ্যে আমি সৎ লেখকদেরও দেখছি। Socrates যাঁদের বলতেন gad-fly। মাছি যেমন কামড়াতে কামড়াতে গোরুকে জ্বালাতন করে তেমনি সমাজকে তিনিও প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে তিক্ত বিরক্ত করতেন। গণতন্ত্রে বিরক্তিকারী সমালোচকেরও একটা স্থান আছে। তেমন মানুষকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা কি গণতন্ত্রের পক্ষে হিতকর? তাই যদি হতো তবে গ্রীসের সেই গৌরবময় গণতন্ত্র টিকতে পারল না কেন! কাকে আবদ্ধ রাখলে গণতন্ত্র নিরাপদ হয়, কাকে আবদ্ধ রাখলে বিপন্ন হয়, এটা কি

কর্তারা ভেবে দেখবার সময় পান ? আমি তো লিখে জবাব পাইনি।

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হলো এতে প্রত্যেকটি নাগরিককেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, যতক্ষণ না সে-স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতার অন্তরায় বা দেশের স্বাধীনতার বৈনাশিক বা চিরাচরিত ধর্মের হন্তারক বা সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালার বিধ্বংসী বা সমাজশৃঙ্খলার বিস্ফোরক হয়। লেখকরাও নাগরিক, সুতরাং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তাদেরও আছে। বলা বাহুল্য তাদের সেই স্বাধীনতাও শর্তাধীন। নিঃশর্ত স্বাধীনতা কোনো লেখক কোনো কালেই পাননি, কোনো দেশেই তার নজীর নেই। গণতন্ত্রেও প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন বিধিনিষেধ আছে। সেসব যদি অযৌক্তিক বা আরবিট্রারি হয় তা হলে লেখকরা প্রতিবাদ করেন, প্রতিবাদ ব্যর্থ হলে প্রতিরোধ করেন। তা করতে গিয়ে কেউ আগুনে পুড়ে মরেছেন, কেউ কারাবাস করেছেন, কেউ বা নির্বাসিত হয়েছেন, কেউ কেউ জরিমানা দিয়েছেন, কারো কারো বই নিষিদ্ধ হয়েছে বা পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বহু দেশের ইতিহাস বাক্‌স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের ইতিহাস। যে দেশ গণতন্ত্রী বলে পরিচিত তার ইতিহাসেও এর নজীর আছে।

সেনসরশিপ আমাদের জীবনে নতুন কিছু নয়। ইংরেজ আমলেও আমরা ও জিনিস দেখেছি। যেটা দেখিনি সেটা হলো প্রাক্‌সেনসরশিপ। না, সেটাও ছিল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। যেমন পত্রিকাবিশেষের সম্পাদকীয় রচনা সরকারকে দেখিয়ে নিতে হতো, রাষ্ট্র বিপন্ন হতে পারে এই যুক্তির জোরে। আমরা তো ভাবতুম গায়ের জোরে। তা ছাড়া নাট্যাভিনয়ের পূর্বে নাটকটাকেও পুলিশের কাছে পেশ করা হতো, পুলিশ তাতে দাগ দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করিয়ে নিত। একবার এ কর্ম আমাকেও করতে হয়। পুলিশের আপত্তি মানে তো কোনো এক সাহিত্যরসিক দারোগার আপত্তি। আমি দারোগার লেভেলে নামতে পারিনে। কিন্তু কী করি ? পুলিশের আপত্তি ষোল আনা খারিজ করলে আমার নামেই রিপোর্ট যাবে যে আমি সন্ত্রাসবাদের প্রচ্ছন্ন প্ররোচনা সমর্থক করি। পুলিশ অফিসারদের ডেকে পাঠাই। তাঁদেরও সেই একই আশঙ্কা। একরাশ আপত্তিকর অংশ বন্ধনীভুক্ত না করলে সাহেব মনে করবেন তাঁরাও সন্ত্রাসবাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থক। বইখানার নাম যতদূর মনে পড়ে 'কেদার রায়'। মোগল আমলের কাহিনী। কোথায় ইংরেজ, কোথায় সন্ত্রাসবাদ, কোথায় রাজদ্রোহ, কোথায় কী!

বাদসাদ দিয়ে অভিনয়ের জন্যে মঞ্জুর করতে হয়। না-মঞ্জুর করলেও কে আমাকে দোষ দিত? সেকালে একটি ম্যাজিক ফরমুলা ছিল। "পাবলিকের স্বার্থে নয়" লিখে বইখানা ফেরৎ দিলেই সাতখুন মাফ। অভিনয় বন্ধ। পাবলিক অসন্তুষ্ট। আমারও প্রমোশন। দারোগারও।

দেশসুদ্ধ সাহিত্যিকের গল্প, উপন্যাস, কবিতাও আজকাল গুটিকয়েক আমলাকে দিয়ে দেখিয়ে নিতে হয়। তাঁরা যে কত বড়ো সাহিত্যরসিক তার প্রমাণ আমরা ভূরি ভূরি পাচ্ছি। কিন্তু প্রতিবাদের উপায় নেই। প্রতিবাদটাও প্রকাশিত হবে না। প্রতিরোধ করতে গেলে কারাবাস। নয়তো বাজেয়াপ্তি। কেন আমার গল্পের দু'লাইন বাদ গেল তার কৈফিয়ৎ আমি আজও পাইনি। গল্পটা জরুরি অবস্থার পূর্বেই লেখা ও সম্পাদকের দফতরে পাঠানো। তাতে রাজনীতির নামগন্ধ ছিল না। লিখেছিলুম, "হুঁ। হুঁ। তুমি জানো সবই, কিন্তু বলবে না। একালে ওষুধের মাত্রা কমেছে। অনুপানের মাত্রা বেড়েছে। ইংরেজ নেই, এখন সব জায়গায় স্কচ্।"

সেনসরশিপ যদি আরবিট্রারি হয় তার প্রতিকার আছে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হলেও তার আগেই হাজার হাজার বিক্রী হয়েছিল। পুলিশ ঘরে ঘরে হানা দিয়ে সমস্ত কপি উদ্ধার করতে পারেনি। তা ছাড়া ইংরেজ আমলে বাজেয়াপ্ত বইও সযত্নে রক্ষা করা হতো। সরকারের হেফাজতে। স্বাধীনতার পর আমাদের এক চীফ সেক্রেটারি অবসরকালে সেসব বই পড়ে আমোদ পেতেন। আমাকেও বলেন, "রায়, পড়বে নাকি?" আমি সময় পাইনে। ছিলুম তো মাত্র ছ'মাস সেক্রেটারিয়াটে। চোরা কক্ষটা আমার দেখা হয়নি। সরকার বদলের পর সেসব বাজেয়াপ্ত বই এখন বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। বিলেতে যখন ছিলুম ব্রিটিশ মিউজিয়ামের চোরা কক্ষে গিয়ে নিষিদ্ধ গ্রন্থ পড়ার অনুমতি পেতুম। কতক বৈপ্লবিক, কতক অশ্লীল। ওরে বাবা! কী কড়া পাহারা! আমাকে নিয়ে যেত আলীবাবার মতো চোখ বেঁধে নয়, তবে কতরকম চোরা পথে। ইংরেজরা কিছুই নষ্ট করত না। ভাবীকালের জন্যে রেখে দিত।

কিন্তু প্রাক্‌সেনসরশিপের বেলা সে কথা খাটে না। আমার গল্পের যে-অংশটা কাটা গেল তার নকল যদি আমার কাছে না থাকে বা থাকলেও পরে হারিয়ে যায় তা হলে সরকারের কোনো ক্ষতি হলো না, কিন্তু সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হলো। গল্পটার রস মাটি হলো। সরকার দীর্ঘায়ু হোন, কিন্তু

সাহিত্য কি তাঁদের চেয়েও দীর্ঘজীবী নয় ? সাহিত্যের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করলে কি ভাবীকালের কাছে জবাবদিহির দায় নেই তাঁদের ? বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সৃষ্টিকে প্রাক্‌সেনসরশিপের ঊর্ধ্বে রাখাই সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। কিন্তু সাহিত্যিকরা কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকেন না। ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'আনন্দমঠ' ও তারই ভিতরে ছিল 'বন্দে মাতরম'। সেকালে যদি প্রাক্‌সেনসরশিপ প্রচলিত থাকত তা হলে 'বন্দে মাতরম্' নির্ঘাত কাটা পড়ত। ওটা কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়নি ? বঙ্কিম হয়তো জানতেন না যে ওটা হবে সংগ্রামের মন্ত্র। তেমনি আমরা কেউ জানিনে আমাদের কোন্ রচনা কবে কার দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক যেন এ ঘরের সঙ্গে ও ঘরের। কখনো এ ঘরের হাওয়া ও ঘরে যায়। কখনো ও ঘরের হাওয়া এ ঘরে আসে। সাহিত্য ও রাজনীতি এক নয়। অথচ বিচ্ছিন্নও নয়। মিলটন, ভলতেয়ার, রুশো, শেলী, হুগো, রমাঁ রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, কি কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন ? মহাত্মা গান্ধী শেলীর 'প্রোমিথিউস আনবাউণ্ড' থেকে যা উদ্ধার করেন তা রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রেরণাদায়ক। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম শেলীর কাছেও ঋণী। যেমন বঙ্কিমের কাছে। গান্ধীজীকে 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সে'র দীক্ষা দেন থোরো, নন্‌ভায়োলেন্সের শিক্ষা দেন টলস্টয় আর সর্বোদয়ের প্রেরণা দেন রাস্‌কিন। এঁরা কেউ রাজনীতিক ছিলেন না, অথচ বিশুদ্ধ সাহিত্যিকও নন।

তা ছাড়া সমালোচনার অধিকারও নাগরিকমাত্রের স্বাধিকার। যেই-কর দেয় সে-ই সমালোচনা করে। যে-ই ভোট দেয় সে-ই সমালোচনা করে। আমরা লেখকরাও কি কর দিইনে, ভোট দিইনে ? কেন আমরা সমালোচনা করব না ? সমালোচনা করলেই বিরোধীপক্ষভুক্ত হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমি তো বিরোধীপক্ষের ধার ধারিনে। যখন যাঁকে যোগ্যতম মনে করি তখন তাঁকেই ভোট দিই। চোখ বুজে ল্যাম্পপোস্টকে ভোট দিইনে। আমি একজন নির্দলীয় নাগরিক। আমার সমালোচনা পক্ষদুষ্ট নয়। পলিসিতে ভুল থাকলে সেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। সে কাজ আমি করেছিলুম ভাওতচীন সংঘর্ষের সময়। স্বয়ং বিনোবাজী আমার লেখা পড়েন। বাংলা তিনি বোঝেন। পরে দেখি ওটি মরাঠীতে তর্জমা হয়েছে। তখন যদি প্রাক্‌সেনসরশিপ থাকত আমার 'যোগভ্রষ্ট' ছাপতে দেওয়া

হতো না, কিংবা দিলেও দেওয়া হতো সেইপর্যন্তই যে পর্যন্ত ভারতের অনুকূলে যায়। যুদ্ধবিগ্রহের rights and wrongs বা ন্যায় অন্যায় চিরকাল আমাকে চিন্তিত করেছে। না করলে কি আমি একজন ইনটেলেকচুয়াল বলে গণ্য হতুম। দেশের পক্ষে কোন্‌টা শ্রেয়, কোন্‌টা নয়, এবিষয়ে আমারও একটা নিরপেক্ষ মত থাকতে পারে। পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে তা যদি না মেলে তবে তাঁরাই ঠিক, আমি বেঠিক, এটা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ইতিহাসই বলতে পারে জাতীয় সঙ্কটের দিন রাজনীতিকরা দূরদর্শী না চিন্তাশীল লেখকরা দূরদর্শী। এক্ষেত্রে প্রাক্‌সেনসরশিপ একটা অদূরদর্শী হস্তক্ষেপ।

প্রাক্‌সেনসরশিপের বিপক্ষে মিলটন যা লিখে গেছেন তা যুগে যুগে ও দেশে দেশে প্রযোজ্য। তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করা নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনিও স্বীকার করতেন যে প্রকাশনের পরে সেনসরশিপ বাঞ্ছনীয় হতে পারে। স্বাধীনতা বলতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বোঝায় না। নিরঙ্কুশরা কী পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে আমি নিজেই তো তার ভুক্তভোগী। প্রকাশনের পূর্বে নয়, পরে যদি দেখা যায় যে, লেখক রাষ্ট্রের বা সমাজের বা ব্যক্তির ক্ষতি করেছেন তা হলে আইনের শাসন তাঁকেও মানতে হবে। আমি শুধু এইটুকুই নিবেদন করব যে, তাঁকে বিনা বিচারে আটক না করে' বিচারের জন্যে আদালতে পাঠানো উচিত। তাঁর রচনাই তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সুতরাং সাক্ষীর অভাব হবে না। যারা চোরা কারবারী বা মাল পাচারকারী বা সন্ত্রাসবাদী তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করা কঠিন। সাক্ষীর অভাবে তারা খালাস পেয়ে যেতে পারে। তাদের বেলা বিনা বিচারে আটকের নজীর আছে। কিন্তু যাদের রচনা জোগাড় করা একটুও কঠিন নয় তাদের বিনা বিচারে আটক করা কি যুক্তিসঙ্গত। আইন ভঙ্গ করে' থাকলে যাক না তারা জেলে, কিন্তু বিনা বিচারে আটকের ভয় থাকলে সব লেখকেরই লেখা ভয়ে আড়ষ্ট হবে। মনের কথা খুলে বলতে কেউ সাহসী হবেন না। লিখবেন যা, তার বাইরে একরকম অর্থ, ভিতরে আরেক রকম। এ ধরনের সাঙ্কেতিক লেখা রাজতন্ত্রের বা পুরোহিতন্ত্রের দাপটের দিনে প্রচলিত ছিল। সমাজ-তন্ত্রের দাপটের দিনেও অপরাপর দেশে লক্ষিত হচ্ছে। এদেশেও কি তার পুনরাবৃত্তি হবে?

আমরা যা লিখব তার পূর্ণ দায়িত্ব নেব। তার জন্যে দরকার হলে দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে যাব। তবু সরস্বতীর সঙ্গে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করব না।

পাঠকের সঙ্গে কপটাচরণ করব না। যাঁদের তত সাহস নেই বা সহনক্ষমতা নেই তাঁরা সাঙ্কেতিক রচনার শরণ নিতে পারেন। ইতিহাসে তার বহু নজীর আছে। যে কথা বলার জন্যে আমরা পৃথিবীতে এসেছি সে কথা যদি ছাপার অক্ষরে দিনের আলো দেখতে না পারে তো পাণ্ডুলিপি আকারে অপ্রকাশিত থাকবে। কিন্তু ভিতর থেকে লেখার তাগিদ যদি থাকে তবে লিখে যেতেই হবে। লেখার জন্যেই বাঁচা। শুধু শুধু বেঁচে থাকা অর্থহীন। আর লেখা কেবল কলম পেষা নয়, ফরমাশ খাটা নয়। লেখা হচ্ছে আত্মপ্রকাশ। যেখানে আত্মপ্রকাশ নেই সেখানে ছাপার অক্ষরে প্রকাশও মূল্যহীন। স্বাধীনতা চাই লেখার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের জন্যেই। সেটাই লেখকের ধর্ম। লেখার স্বাধীনতা যেন একপ্রকার ধর্মীয় স্বাধীনতা।

মোহিতলালের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[কবিশেখর কালিদাস রায়কে লিখিত]

সম্পাদনা : শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

(দুই)

[১৯৪৮ সন থেকে ১৯৫০ সন—এ তিন বৎসর কালবৃত্তের মধ্যে সাহিত্যিক বন্ধু কবিশেখর কালিদাস রায়কে লিখিত মোহিতলালের চারখানি পত্র প্রাসঙ্গিক তথ্য সহ নিম্নে প্রকাশিত হলো। মোহিতলালের মৃত্যু হয় ১৯৫২ সনের জুলাই মাসে। এ পত্রগুলি লেখার সময় কলকাতার উপকণ্ঠে বড়িশার গ্রাম্য পরিবেশে তিনি সপরিবারে বাস করতেন। নানা আধিব্যাধিতে তাঁর শরীর জীর্ণ। অবসরকালীন জীবনে সঞ্চিত অর্থ না থাকায় অনন্যনির্ভর সাহিত্যকর্মের সাহায্যে পরিবার প্রতিপালন করতে হতো। এ সময় অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁকে অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করতে হয়েছিল। জীবনের এই সংকটময় অবস্থায়ও সাহিত্য, দেশ ও জাতিসম্পর্কে মোহিতলালের মন ছিল সদাজাগ্রত। অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করে' এ-তিনের স্বার্থরক্ষায় স্বীয় জ্ঞান বিশ্বাস মত তিনি তাঁর ক্ষীয়মাণ সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। বাণী সাধনার ক্ষেত্রে এরূপ আত্মবিলোপের উদাহরণ এ দেশে খুব বেশী দেখা যায়

না। এ কালসীমায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো নবপর্য্যায়-'বঙ্গদর্শন' ও 'বঙ্গভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা। এ দু'টি পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে অবক্ষয়িত বাঙালী জাতির সামনে তার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে তিনি এক মহান দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গদর্শন সম্পাদনার সময় তিনি সমকালীন রাজনীতি আলোচনাতেও অংশ গ্রহণ করেন। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর সাহিত্যিক মতেরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। তিনি এ-প্রত্যয়ে উপনীত হন যে, এ যুগের সাহিত্য রাজনীতি বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। যে-মোহিতলাল সাহিত্য-জীবনের অধিকাংশ সময় ছিলেন বিশুদ্ধ রসবাদী, জীবনের শেষ লগ্নে এই ভিন্ন আদর্শমুখিতা তাঁর নব-জাগ্রত সমাজ-চৈতন্যেরই পরিচায়ক। দুর্ভাগ্যক্রমে আলোচ্য কালবৃত্তের আর মাত্র দুই বৎসর পরে মানবলীলা সংবরণ করায় এ নবোন্মেষিত প্রত্যয়কে তিনি সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনার অঙ্গীভূত করার বেশী অবকাশ পাননি।

এই অপ্রকাশিত পত্রগুলিও কবিশেখর কালিদাস রায়-এর পুত্র কবিরঞ্জন ও কবিকঙ্কন রায়ের কাছ থেকে পেয়েছি। এঁরা দুজনে এবং কবিশেখরের পুত্রবধূ শ্রীমতী অঞ্জলিকা ও মঞ্জুলিকা তাঁদের স্বল্প অবকাশের মধ্যেও পত্রগুলি কপি করে দিয়ে আমার শ্রম লাঘব করেছেন বলে আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। —সম্পাদক।]

৫নং চিঠি

বঙ্গদর্শন

Kailas Chandra Ghose Road
Barisa

সম্পাদক : শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

২৪, চৌরঙ্গী রোড
কলিকাতা-১৩
2.5.48

সুহৃদ্‌বরেষু,

গত শুক্রবারে করুণানিধানের সঙ্গে[১] দেখা করিয়া আসিয়াছি। ঐ দেখা করার পর দুই একটি জরুরী কথা আপনার সঙ্গে কহিবার আছে, সাক্ষাতে কহিব। আপনাদের স্কুলের ছুটি কবে হইবে? শুনিলাম, আপনি ম্যাট্রিকের Head Examiner নিযুক্ত হইয়াছেন। অতিশয় দুষ্প্রবৃত্ত যাহারা তাহারাও

হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে, দুই একটা ভাল কাজ দৈবক্রমে করিয়া ফেলে, অতএব কর্তৃপক্ষদের প্রশংসা করিবার কিছু নাই, হয়তো, তাহারা তাহাদের ধর্ম্ম এখানেও কোন না কোন দিক দিয়া বজায় রাখিয়াছে, অর্থাৎ আপনাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছে—আর পাঁচজনকে যেমন করিয়া থাকে,—সেই কারণে ও সেই প্রথায়। তথাপি কাজ খুব ভালই হইয়াছে—আপনার চেয়ে উপযুক্ত কে আছে? বড়দের নাম করিব না—বেচারীদের দোষ কি? আপনি বোধ হন, এক্ষণে Notes লেখা, এবং পরে ঐ পরীক্ষার কর্ম্মে অতিশয় ব্যস্ত থাকিবেন, তথাপি, আশা করি, যে কোনদিন আমার সঙ্গে কথা কহিবার সময় পাইবেন।

উপস্থিত, আপনার নিকটে দুইটি জিনিষ চাই—যত শীঘ্র সম্ভব। প্রথমত করুণাবাবুর "শতনরী"র (২) একটা 'ফাইল'; দ্বিতীয় করুণাবাবুর নূতন (অপ্রকাশিত) কয়েকটি কবিতা আছে সেগুলির কপি। প্রেসে যদি দিয়া থাকেন, তবে সেইখান হইতে আনাইয়া আমাকে দেখিতে দিবেন; আমি একবার দেখিলে ভাল হয়—এ বয়সের লেখা 'শতনরী'র standard maintain করিবে কি না তাহা দেখা আবশ্যক। আর যদি সত্যই সেই কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে তবে আমি 'বঙ্গদর্শনে' (৩) তাহা ছাপিতে পাই না কেন? আপনি একটু ভাবিয়া দেখিবেন। অতএব, ঐ নূতন কবিতাগুলি আমি এখনই দেখিতে চাই, আপনি উহা আমাকে পাঠাইয়া দিবেন (৪)। ঐ বই ছাপার সম্বন্ধে অন্যান্য কথা সাক্ষাতে বলিব।

আশাকরি, কুশলে আছেন। আমার ভালবাসা ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিবেন। ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পুঃ তারাচরণের মা মৃত্যুশয্যায়; বোধ হয় আর দেরী নাই। সে বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি ও সেজন্য একটু বিপন্ন আছি

শ্রীমো—

প্রাসঙ্গিক তথ্য

৫ নং চিঠি (২. ৫. ৪৮ তারিখে লিখিত)

১। করুণানিধানের সঙ্গে—কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) ইনি মোহিতলালের অগ্রজ কবি এবং রবীন্দ্রযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মোহিতলাল থেকে ইনি এগারো বৎসরের বড় ছিলেন। মোহিতলাল এঁর

কবিপ্রতিভার প্রতি পরম সশ্রদ্ধ ছিলেন। ১৯৫১ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে 'জগত্তারিনী স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ঝরাফুল', শান্তিজল', 'ধানদূর্বা', 'শতনরী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোহিতলাল তাঁর 'সাহিত্য বিতান' (১৩৪৯) গ্রন্থের দীর্ঘ একটি প্রবন্ধে এঁর কবিপ্রতিভার মৌলিক লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে "করুণানিধানের কবিতা 'ফুলের মত কোমল নির্মল, পরিপক্ক ফলের ন্যায় নিটোল ও রসোচ্ছল এবং মণিগণের মত দৃঢ়সংহত দীপ্তিমান।" মোহিতলাল করুণানিধানকে প্রকৃত রূপপিপাসার কবি বলে চিহ্নিত করেছেন। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক মোহিতলাল মনে করেন, কবি-জীবনের শেষ পর্যায়ে বৈষ্ণবীয় ভাবানুভূতি করুণানিধানের আনর্বাণ সৌন্দর্যমোহকে বিচলিত করেছে।

২। শতনরী—কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য সঞ্চয়ন। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৩৭। প্রকাশক হেমচন্দ্র বাগচী। 'শতনরী'তে কবির 'প্রসাদী' 'ঝরাফুল,' 'শান্তিজল' ও 'ধানদূর্বা' কাব্য থেকে ৫৯ টি শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাব ও সুরের কবিতা বিভিন্ন পর্যায়ে চয়ন করে 'শতনরী'কে যথাক্রমে 'কানে কানে,' বন্দনা' 'মৃণু', 'মধুপ্রশস্তি' ও 'পথে'—এ পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। কাব্য সঞ্চয়নটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

৩। বঙ্গদর্শনে তাহা ছাপিতে পাইনা কেন ?—'বঙ্গদর্শন' মোহিতলাল-সম্পাদিত সাহিত্য-সাময়িকী। অবশ্য এ পত্রিকায় সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজ-নীতির আলোচনাও থাকতো। বঙ্গদর্শন-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ (১৯৪৭) সনের শ্রাবণ মাসে। ১৩৫২ সনের ষষ্ঠ সংখ্যা (ফাল্গুন) পর্যন্ত সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব বহন করার পর মোহিতলাল 'বঙ্গদর্শন' এর সম্পাদনা কার্য পরিত্যাগ করেন। ১৩৫৬ সনের শ্রাবণ মাস থেকে দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায়। আদি বঙ্গদর্শন-এর প্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই পত্রিকা প্রকাশের অনন্যনির্ভর দায়িত্ব নিজস্কন্ধে বহন করতে বাধ্য হওয়ায় মোহিতলাল তাঁর প্রিয় পত্রিকার সম্পাদনাকার্য পরিত্যাগ করেন।

স্বল্পকালের জন্য বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করলেও সম্পাদক হিসেবে মোহিত-লালের কৃতিত্ব অনুল্লেখনীয় নয়। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো, ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি

সমকালীন কয়েকজন প্রতিভাবান কবি ও প্রবন্ধকার তাঁর পত্রিকার লেখক তালিকাভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ প্রবন্ধ তিনি নিজেই রচনা করতেন। প'ত্রকার কয়েকটি ফিচার ছিল, যেমন, 'শ্রুতি-স্মৃতি' (এ পর্যায়ে বিগত যুগের মনীষীদের জাতি ও সমাজ সম্পর্কীয় মননশীল প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হতো যেমন বিপিন পালের 'বর্ণাশ্রম ও আধুনিক সমাজ'; হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাঙালীর গোড়ার কথা,' হেমচন্দ্রবসুর 'বাংলা ও বাঙালী' ইত্যাদি।) 'মণি-মঞ্জুষা' পর্যায়ে কবির নাম উল্লেখ না করে সর্বকালের রসিক সমাজের আস্বাদ্য উৎকৃষ্ট কবিতা চয়ন করে মুদ্রিত হতো; 'মাধুকরী' নামক অনুবাদ পর্যায়ে 'যে রচনা (১) ক্লা'সিক বা যুগোত্তীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, (২) যাহা ভাবে ও চিন্তায় অতিশয় মৌলিক এবং মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর'—তেমন বিদেশীয় কবি ও মনীষীদের বাণী—বিশেষ করিয়া সাহিত্য বিষয়ক দিব্য চিন্তাও, স্থান পেতো;—যেমন Lafcadio Hearn-এর Out of the East-এর অনুবাদ, Emile Zola-র Naturalism অবলম্বনে 'কথাসাহিত্যে প্রকৃতিপন্থা, Schopenhauer-এর On Authorship and Style-এর অনুবাদ—'গ্রন্থ রচনা ও রীতি,' প্রভৃতি। বিদেশী সাহিত্য থেকে বিখ্যাত গল্পের অনুবাদই বেশী প্রকাশিত হতো। সতীনাথ ভাদুড়ী, জগদীশ গুপ্ত প্রভৃতি দুই একজনের মৌলিক গল্প প্রকা'শিত হয়েছিল। 'গ্রন্থ পরিক্রমা' পর্যায়ে মোহিতলাল নিজের প্রত্যয় অনুযায়ী মূল্যসমৃদ্ধ উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতির সমালোচনা লিখতেন (যেমন, তারাশঙ্করের, 'কবি' উপন্যাসের সমালোচনা, কুমুদরঞ্জন ম'ল্লকের কাব্য সমালোচনা প্রভৃতি)। 'বঙ্গদর্শন' পর্যায়ে ছিল বিস্তৃত সম্পাদকীয় মন্তব্য ও আলোচনা। দেশ বিভাগের ফলে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি নিষ্ঠুরভাবে বিড়ম্বিত হয়ে যে অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল তার জন্য স্ব-জাতিপ্রেমিক মোহিতলালের সাগ্নিক রোষ তপ্ত লাভার মত উদ্গীর্ণ হয়েছে এ সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিতে। কখনও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে, কখনও মননশীল ভাবনার সাহায্যে তিনি বাঙালীর ব্যথাদীর্ণ অবক্ষয়িত রূপ-কে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন 'বঙ্গদর্শন' এর সম্পাদকীয় বিভাগে। হিন্দীর রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভের বিরুদ্ধেও তিনি একক অভিযান চালনা করেন তাঁর স্ব-সম্পাদিত পত্রিকায়। রাজনীতি-ক্ষেত্রে সমকালীন বাঙালীর চারিত্রিক দৌর্বল্য দেখে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন প্রচণ্ড পৌরুষ-দীপ্ত নেতাজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি। সাহিত্য-সংস্কৃতির

চাইতে বঙ্গদর্শন-এ মোহিতলাল রাজনীতির প্রতি অধিকতর ঔৎসুক্য দেখাচ্ছেন—কোন কোন পাঠক মহলে এ অভিযোগ উত্থাপিত হলে দৃঢ়ভাবে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন : এ যুগে দেশ-কাল জাতি-ধর্ম বিবর্জিত বিশুদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা সম্ভব নয়—উচিতও নয়। (দ্রষ্টব্য, বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য, পৃষ্ঠা ৪১১, ৪১২)। মোহিতলালের সাহিত্য মানসের দিক্ পরিবর্তনের স্মারক হিসেবে এ প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া মোহিতলাল এ অভিযোগের উত্তরে সুস্পষ্টভাবে বলেন, বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদকীয়তে তিনি যা আলোচনা করেন তা রাজনীতি নয়, মনুষ্যধর্মনীতি—যা সকল যুগের সকল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নীতি।

রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি বিষয়ক বিগত যুগের যাঁদের প্রবন্ধ নিবন্ধ পুনর্মুদ্রন করে মোহিতলাল বঙ্গদর্শন এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন তাঁর মধ্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রধান। এ পর্যায়ে তিনি নিজেও কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।—(দ্রষ্টব্য, পৌষ ১৩৫৫ সংখ্যায় 'বাঙালীর কর্মফল', অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ সংখ্যায় 'কংগ্রেস ও জাতীয়তা')। বঙ্গদর্শন-এর প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতো বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রাবয়ব প্রতিকৃতি সহ পল্লীবাংলার একখানি খড়ো ঘর।

মোহিতলাল সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর বিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র'।

রাজনৈতিক মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে মোহিতলাল দুই জনের উদ্দেশে নিজ অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করেছিলেন একজন মহাত্মা গান্ধী (আলোক চিত্র সহ 'মহাত্মার মুক্তি' পৌষ মাঘ, ১৩৫৪), আর একজন 'নেতাজী' মাঘ, ১৩৫৫—নেতাজীর জন্মদিনে। নেতাজীর বলিষ্ঠ পৌরুষব্যঞ্জক নির্ভীক ব্যক্তিত্ব মোহিতলালের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেও মহাত্মা গান্ধীর সংযম ও ত্যাগ-পূত জীবন সাধনাও যে কবি মনীষী মোহিতলালের ভাবুক অন্তরকে কম আকর্ষণ করেনি তার প্রমাণ মহাত্মাজীর শোচনীয় মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শন-এর উক্ত সংখ্যায় 'মহাত্মার মুক্তি' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধ। যাঁরা মোহিতলালকে গান্ধীবিরোধী এবং এই কর্মযোগীর প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ বলে জানেন এ তাঁদের অবশ্য পঠনীয়।

বঙ্গদর্শন-এর প্রতি সংখ্যার প্রারম্ভে একজন স্মরণীয় বাঙালী কবি বা মনীষী সাহিত্যিকের ছবি মুদ্রিত হতো এবং পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত চিত্র

পরিচিতি থাকতো। বিভিন্ন সংখ্যায় কবি কামিনী রায়, কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম (সৈনিকের পোষাকে), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মনীষী লেখক পাঁচকড়ি-বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ছবি মুদ্রিত হয়েছিল। নজরুলের পরিচয় প্রসঙ্গে মোহিতলাল যা লিখেছিলেন তা উদ্ধারযোগ্য: 'এমন জনপ্রিয়তা আধুনিক কালের আর কোন কবির—এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও হইয়াছে কিনা সন্দেহ; কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে শ্রদ্ধা তাহাকে ঠিক জনপ্রিয়তা বলা যায় না। কাজি নজরুল একটি বিশেষ কালের এবং বিশেষ লগ্নের জনমনের উন্মাদনাকে —তাহার কলকল্লোলের ফেনোচ্ছ্বাসকে—তদনুরূপ বাক্যচ্ছলে ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ কবিশক্তি ও তজ্জন্য জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আধুনিক-পূর্ব যুগের দাশরথি রায়ের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।'

মৃত্যুর (১৯৫২) চার বৎসর পূর্বকাল পর্যন্ত মোহিতলাল নজরুল ইসলামের কাব্যপ্রতিভার প্রতি কত শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন তার স্মারক হিসেবে উক্ত প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

মোহিতলাল বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদনা কার্য পরিত্যাগ করবার পর রাখাল-চন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন পূর্বনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হলেও সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিতে আর পূর্বের ধার বা তার ছিল না।

বাংলার সাময়িক পত্রের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে মোহিতলাল সম্পাদিত বঙ্গদর্শন স্বল্পায়ু হলেও এ পত্রিকাটি এমন একটি চারিত্রিক মহিমা অর্জন করেছিল (জাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গলচিন্তা, ও অপ্রিয় সত্যভাষণ দ্বারা)—বর্তমান আদর্শ বিভ্রান্তির যুগে তা একান্ত ভাবে দুর্লভ।

৪। করুণানিধানের কবি প্রতিভার প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান এবং তাঁর ক'বতার অনুরাগী পাঠক হলেও সম্পাদক হিসেবে কবিতা নির্বাচন ব্যাপারে মোহিতলাল কত বিচারশীল ছিলেন, করুণানিধানের শেষ পর্যায়ের কবিতা-গুলি পত্রস্থ করবার ইচ্ছা সত্বেও পরীক্ষা করবার ইচ্ছা তার প্রমাণ।

৫। পুঃ তারাচরণ—অধ্যাপক তারাচরণ বসু। এঁর সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে ১৩৮৩ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'আলেখ্য'-তে প্রকাশিত মোহিত-লালের ৪নং চিঠির প্রাসঙ্গিক তথ্য (৩নং) দ্রষ্টব্য। ইনি উৎকৃষ্ট কবিতাও রচনা করতেন ও ছন্দ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মোহিতলাল তাঁর সম্পাদিত ১৩৫৪ সনের পৌষ মাঘ সংখ্যা বঙ্গদর্শন-এ 'স্মরণে' নামক এঁর

একটি কবিতা পত্রস্থ করেন। প্রিয় শিষ্যের আসন্ন মাতৃবিয়োগ সম্ভাবনায় তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখে মোহিতলাল নিজেও বিচলিত হয়ে পড়েন। মোহিতলালের বিরুদ্ধে যাঁরা আত্মকেন্দ্রিকতার অভিযোগ এনেছেন, সেটা যে কত বড় মিথ্যা এ ক্ষুদ্র ঘটনা তার প্রমাণ।

৬নং চিঠি

শ্রীমোহিতলাল
মজুমদার

বড়িশা পোঃ
ইং ৩।৪।৪৯

সুহৃদ্বরেষু

আপনার পত্র পাইয়াছি। তারাচরণের নিকটে আমি ও সকল সংবাদ পাই। তাই আপনাকে পত্র লিখি নাই। তারাচরণের বইখানির ছাপা বোধহয় শেষ হইয়া আসিল। ছাপার ভুল অনেক। শেষ পর্য্যন্ত কবিতাও অনেক বাদ দিতে হইল। ভালই হইয়াছে, যাহা লিখিয়াছে তাহাই বা কে পড়িবে? আপনি উহাকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে বড় আহ্লাদিত হইয়াছে।[১]

"বঙ্গদর্শনের' অবস্থা এখনও খুব Critical; তবু বলা যায় না, হয়তো গুরুর কৃপায় এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইতে পারে। আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি। একটা কোন নূতন ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, এইভাবে প্রায় বিনাপয়সায় এত পরিশ্রম করা আমার এই অবস্থায় সম্ভব হইবে না; শরীর ও খুব অসুস্থ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন খুব দুঃখ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের একখানি পত্র অনেকদিন পাইয়াছি, এখনও উত্তর দিতে পারি নাই; এখন আর কাহাকেও কিছু লিখিতে ইচ্ছা হয় না। "বঙ্গদর্শনের" সম্বন্ধে একটা কিছু নিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত, কিছুই ভাল লাগিতেছে না।[২]

বনফুলের 'জঙ্গম' উপন্যাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বুঝিলাম আপনি লোকনাথ ঘোষালকে চিনিতে পারিয়াছেন, শঙ্করকে চিনিতে পারেন নাই। ঐ উপন্যাস খানিতে বনফুল সজনীর আত্মকাহিনীকে অর্থাৎ সজনীর মুখে তাহার নিজ চরিত্র ও কীর্ত্তির কথা যেরূপ শুনিয়াছে তাকেই বেশ একটু Idealise করিয়া—বন্ধুকৃত্য করিয়াছে।[৩] আমি উহার যে সমালোচনা করিয়াছি এবং বনফুলের সাহিত্যিক চরিত্র ও প্রতিভার, যে পরিচয় দিয়াছি তাহা আমার 'সাহিত্য বিতানে'র দ্বিতীয় সংস্করণে পড়িয়া

দেখিবেন ; ব্যক্তিগত আক্রোশ নয়, সাহিত্যিক সত্যনিষ্ঠার বশে আমি উহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছি, উহা প্রকাশিত হইলে ঐ দাম্ভিক মহাপুরুষটির কিছু শিক্ষালাভ হইবে বলিয়া মনে হয়। আমার ঐ বইখানি যতদিন বাঁচিবে ততদিন 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাংত্বমগম'—ইহা বোধহয় অত্যুক্তি নহে ; ভীষণ চীৎকার করিবে, কিন্তু কেহই বাঁচাইতে পারিবে না।* কারণ, আমার সমালোচনা দুর্ব্বল নহে।*

আগামী শনিবারে রাত্রি ৮।-টায় আমার একটা Radiotalk আছে—বিষয় "রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতি।" বিষয়গুলো উহারাই dictate করে! ঐ অল্প সময়ের মধ্যে এমন ভারি ভারি বিষয়ের আলোচনা কিরূপ অসম্পূর্ণ এবং একপেশে হয় তাহা গতবারের Talk হইতে বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছেন। গতবারে সাধারণভাবে সাহিত্যের বিচার করিতে গিয়া বিশেষভাবে কাব্য সাহিত্যের বিচার করিতে পারি নাই। কাব্যের সংজ্ঞা এবং আদর্শ সম্বন্ধে যে আর একটা মত আছে, এবং তাহাও সত্য, সে কথা বলিবার অবকাশ পাই নাই। সাধারণ অর্থে সাহিত্য এবং বিশেষ অর্থে কাব্য এই দুইয়ের উৎকর্ষ বিচারের মাপ কাঠি এক নয় ; আমি সাধারণ সাহিত্যের দিকটাই ধরিয়াছিলাম।

এবার যদি সম্ভব হয়, ভূমীনের ওখানে যাইব, রবিবারে দেখা হইতে পারে। একটু খবর লইবেন।

আশা করি, কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার আলিঙ্গন জানিবেন।—ইতি

আপনার

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রাসঙ্গিক তথ্য

৬নং চিঠি (৩. ৪. ৪৯ সনে বড়িশা থেকে লিখিত)

১। অধ্যাপক তারাচরণ বসুর 'মোহিতলালের স্মরগরল—কবি ও কাব্য' সম্পর্কে ইঙ্গিত। এ গ্রন্থ প্রণয়নে কবিশেখর কালিদাস রায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উপদেশ দিয়ে তারাচরণ বসুকে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

২। নিতান্ত আদর্শবাদের প্রেরণায় জীবনের শেষ পর্যায়ে অসুস্থ অবস্থায় 'বঙ্গদর্শন'-কে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য মোহিতলালের আন্তরিক ব্যাকুলতা এখানে লক্ষিতব্য।

৩। 'জঙ্গম' বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)-এর উচ্চাভিলাষী উপন্যাসের অন্যতম। বইখানি বৃহদায়তন, ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। এ উপন্যাসের ঘটনাবলী বহু ধারায় প্রবাহিত, চরিত্রগুলিও বিচিত্র প্রকৃতির। কেন্দ্রীয় চরিত্র শঙ্কর মোহিতলালের একান্ত প্রত্যয়, ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক বন্ধু সজনীকান্ত দাস-এর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে বনফুল শঙ্কর চরিত্রের পরিকল্পনা করেন এবং আদর্শের রঙে রঞ্জিত করে এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেন। উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডে বনফুল লোকনাথ ঘোষালের যে-চরিত্র অংকিত করেছেন তা মোহিতলালের চরিত্রের আদলে সৃষ্ট বলেই মোহিতলালের ধারণা। এ চরিত্র সৃষ্টিতে মোহিতলালের ব্যক্তিচরিত্রকে বিকৃত করা হয়েছে। বনফুল সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে মোহিতলালের প্রতি ছিলেন পরম শ্রদ্ধান্বিত। পরবর্তীকালে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বশত মোহিতলালের প্রতি তাঁর এ শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকেনি। মোহিতলালের প্রতি তাঁর আন্তরিক বিক্ষোভ লোকনাথ-চরিত্র সৃষ্টিতে অভিব্যক্তি লাভ করেছে বলেই মোহিতলালের বিশ্বাস।

৪। মোহিতলাল লিখিত 'সাহিত্য বিতান'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ (১৯৪৯) সনে—মোহিতলালের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে। এ গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'বর্তমান সাহিত্য' বিষয়ক আলোচনা। বনফুল-এর 'জঙ্গম'-এর সমালোচনা এ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত (৩৯৮ থেকে ৪০০ পৃষ্ঠার কিয়দংশ)।

এখানে মোহিতলাল-কৃত 'জঙ্গম' সমালোচনার একটা চুম্বক দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—

প্রথমতঃ, ঔপন্যাসিকের 'মনে কোন borderland of doubt' নাই—কোন অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মোহ নাই।' এ কারণে আলোচ্য উপন্যাসে 'তাঁহার জীবন দর্শনে রহস্যের লেশমাত্র নাই'। লেখকের কল্পনা একান্তভাবে প্রত্যক্ষ জগতে আবর্তিত হয়েছে বলে 'তাঁহার কল্পিত চরিত্রগুলির বৈরূপ্য আছে—সারূপ্য নাই ; কারণ, যে individualityর মূলে আছে একটা গভীরতর সত্তা—সেই সত্তাকে তিনি স্বীকার করেন না।...এই উপন্যাসের নারী ও পুরুষ

চরিত্রগুলির সঙ্গে তারাশঙ্করের ছোটগল্পের অসংখ্য চরিত্রের তুলনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে—তাঁহার মানুষগুলা কিরূপ authentic, তাহাদের individuality কত গভীর! রাজা জমিদার হইতে বেদে, সাপুড়ে, বেশ্যা ও বিকলাঙ্গ—সকলের মধ্যে, কেবল বাইরের আকৃতি ও প্রকৃতির ভেদে নয়, সেই প্রভেদের মধ্যেই প্রত্যেকটিতে এমন একটি individuality ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা অখণ্ড মনুষ্যত্বের দ্যোতক—সে প্রভেদ যেন সেই অভেদত্বকেই আরও সুগোচর করিয়াছে। তাই সেখানে জীবন কোন একটা মতবাদ বা তত্ত্বের অধীন হইয়া আমাদের মনের 'যুক্তং দেহি' বুদ্ধিকে উদ্যত করে না—যথার্থ রসোদ্রেকের দ্বারা গভীরতর চৈতন্যকে তৃপ্ত করে। 'বনফুল' জীবনকে ততখানি খাতির করিতে প্রস্তুত নহেন; বরং তাহার যত কিছু মহত্ত্বকে Caricature করিয়া, Idealism মাত্রকেই হাস্যাস্পদ ও ঘৃণাভাজন করিয়া, তাঁহার বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির ইজ্জত রক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, উক্ত কারণে 'তাঁহার এই বিরাট উপন্যাসখানিতে প্লটের কোন বালাই নাই—'জঙ্গম' নামটি বোধ হয় তাহাই ঘোষণা করিতেছে। অর্থাৎ জীবন জিনিষটা একটা 'জঙ্গম' বা নিয়ত গতিমান, আদর্শহীন, ধর্মহীন পশুপ্রকৃতির বিকাশ'। তৃতীয়ত, 'এই উপন্যাসের কোথাও একটা সমগ্র দৃষ্টি নাই। যে চুটকি রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত, তাহার একটি স্তূপ ইহাতে রাশীকৃত করা হইয়াছে। তাঁহার মনের পিস্তল হইতে অনবরত গুলিবর্ষণের মত, কতগুলা চরিত্র—ঠিক চরিত্র নয়, কেবল কতগুলা মুখ ও মুখভঙ্গি (সঙ্গে সঙ্গে বচন ভঙ্গিও)—তিনি যেন ছুঁড়িয়া চলিয়াছেন। অথবা, উপন্যাসখানিকে zoologyর জন্তুশালাও বলা যাইতে পারে,—প্রত্যেকটি মনুষ্য জন্তু নিজ নিজ খাঁচায় আবদ্ধ থাকিয়া স্ব-স্ব প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে; তাহাদের সেই চালচলন ও মুখভঙ্গি—লেখক বিধাতা পুরুষের মতই নির্ভুল করিয়া তুলিয়াছেন। 'জঙ্গম' সম্বন্ধে ইহার অধিক বলিবার নাই।' [উদ্ধৃত উক্তিগুলি মোহিতলালের]

প্রসঙ্গক্রমে এটাও উল্লেখযোগ্য যে 'সাহিত্য বিতান' দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত (১৯৪৯) মোহিতলাল লিখিত 'জঙ্গম' সমালোচনার প্রায় সাত বৎসর পরে (১৯৫৬) 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থের ৩য় সংস্করণে মনস্বী সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'জঙ্গম' উপন্যাসের যে সমালোচনা প্রকাশ করেন তাও মোহিতলালের 'জঙ্গম' সমালোচনা থেকে খুব দূরবর্তী নয়। পাঠকের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক হবে মনে করে নিম্নে তার প্রাসঙ্গিক

উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

"এই উপন্যাসে আধুনিক জীবন যাত্রার বিরাট-সুদূর-প্রক্ষিপ্ত দিগ্‌বলয় ও কেন্দ্রভ্রষ্ট, বিশৃঙ্খল, বহুমুখী, স্বপ্নসঞ্চরণবৎ লক্ষ্যহীন প্রচেষ্টার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহা যেন একটা উদ্‌ভ্রান্ত, আদর্শের আশ্রয়হীন জীবনলীলার মহাকাব্য—এক সীমাহীন সমুদ্রবিস্তারের তটাভিমুখী তরঙ্গপরম্পরার অকারণ উঠা-পড়া। কত বিরাট রঙ্গমঞ্চে কত অভিনেতা-অভিনেত্রী নিছক জীবন প্রেরণারউচ্ছ্বাসে কত খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ নাটকের দৃশ্য অভিনয় করিতেছে। এই অভিনয় অর্দ্ধপথে থামিয়া যাইতেছে, কোন অখণ্ড তাৎপর্য ইহার মধ্যে রূপ পাইতেছে না; বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলি কোন উদ্দেশ্যগত ঐক্যসূত্রে বাঁধা পড়িতেছে না। এই অসংলগ্ন দৃশ্য-পরম্পরা এক বিরাট, উদ্বেলিত, নানা শাখাপথে ঢুকিয়া-পড়া ও শুকাইয়া-যাওয়া প্রাণোচ্ছ্বাসের পরোক্ষ পরিচয় রূপে প্রতিভাত হইতেছে।...এই অবারণ চলা, অকারণ শক্তির প্রয়োগ ও অপচয়, নানা পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার দ্বিধা, জীবনমত্ততার পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনোচ্ছ্বাস, দার্শনিক নিরীক্ষার দৃষ্টিবিভ্রমকারী ঘূর্ণীচক্র—ইহাই আধুনিক জীবন।

এই অশান্ত, পাকে পাকে বিঘূর্ণিত আলোড়নরাশি—উপন্যাসের নায়ক শঙ্করের মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহার অনুভূতি কেন্দ্রে যথাসম্ভব সংহত হইয়া একটা জীবন তাৎপর্যবোধের উদ্দীপক-হেতুরূপে দেখা দিয়াছে।"
(বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৫২২, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৬)।

মোহিতলালের মত ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সুচিন্তিত অভিমতক জঙ্গমে যে জীবননাট্যের অভিনয় দেখা যায় তা খণ্ডিত, তা অখণ্ড তাৎপর্য-মণ্ডিত ও অবয়বান্বিত হয়ে ওঠেনি, বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলি কোন উদ্দেশ্যগত ঐক্য-সূত্রে বাঁধা পড়েনি। এর দৃশ্যপরম্পরা অসংলগ্ন, এবং তা শুষ্ক প্রাণোচ্ছ্বাসের পরোক্ষ পরিচায়ক। এ উদ্দেশ্যহীনতা এবং জীবনমত্ততার তরল অভিব্যক্তি আধুনিক জীবনেরই বাহ্য রূপ। এ অস্থির অশান্ত বিঘূর্ণিত আলোড়ন নায়ক শঙ্করের অনুভূতিকেন্দ্রে যথাসম্ভব সংহত হয়ে একটা 'জীবনতাৎপর্যবোধের উদ্দীপক-হেতুরূপে' দেখা দিয়েছে বলেই ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাস।

এই মন্তব্যটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মোহিতলালের মত শ্রীকুমারের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছে, 'জঙ্গম' উপন্যাসে অখণ্ড কোন জীবন তাৎপর্য নেই। পারিপার্শ্বিকের ইতস্তত চঞ্চল বিক্ষিপ্ত ঘটনাপুঞ্জ নায়কের অনুভূতি

কেন্দ্রে যথাসম্ভব সংহত হয়ে একটা জীবন-তাৎপর্যবোধের আভাষরূপে দেখা দিয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে বনফুল-এর সঙ্গে মোহিতলালের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠলেও 'জঙ্গম' সমালোচনায় সে-ব্যক্তিগত প্রসঙ্গকে প্রাধান্য না দিয়ে ঐকান্তিক সাহিত্যবিচার-প্রণোদিত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি এ সমালোচনা লিখেছিলেন—মোহিতলালের জবানীতে এটা দেখা যায়।

৬। এ তীব্র সমালোচনায় প্রতিক্রিয়ায় 'জঙ্গম' ঔপন্যাসিকের মানসিক অবস্থা মোহিতলাল যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। বস্তুত পক্ষে 'জঙ্গম' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের (চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়) সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর বইখানি আর পুনঃ প্রকাশিত হয়নি।

নিজের সমালোচনা-প্রতিভা সম্পর্কে মোহিতলালের আত্মপ্রত্যয় কত দৃঢ় ছিল—এ উক্তি তার প্রমাণ।

(৭নং চিঠি)

বড়িশা
বৃহস্পতিবার
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭

সুহৃদ্বরেষু

ভাই কালিদাসবাবু আমার মাতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়া আপনি যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন তাহার প্রতি ছত্রে যে স্নেহ ও শুভ কামনা—সত্যকার সুহৃদ্ বাক্য—পাইলাম তাহার জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন। আপনি হবিষ্যান্নের জন্য যাহা পাঠাইয়াছেন তাহাও লৌকিকতা নয়—পরম আত্মীয়তার নিদর্শন, আমি তাহা আনন্দে গ্রহণ করিয়াছি।

আমার মাতৃবিয়োগে ততটা দুঃখ হয় নাই এবং নিশ্চিন্ত হইবারই কথা; বড় ভয় হইয়াছিল, পাছে তাঁহাকে রাখিয়া যাইতে হয়—কিন্তু যে অবস্থায় তাঁহাকে যে ভাবে বিদায় দিতে হইল তাহাতে বড়ই পরিক্লিষ্ট হইয়াছি। ঠিক যে সময়ে আমি সর্ববিধ সঙ্কটে দিশাহারা ও মুহ্যমান সেই সময়ে এতবড় একটা আঘাত ও দায় আমাকে সত্যই ভূমিসাৎ করিয়াছে। আমি বড় ভয় পাইয়াছি, মনে হইতেছে, ইহাই অন্তিমের পূর্ব্বাভাস[১]। সব দিক দিয়া আমার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে—আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি; তবু আশা ছিল,

সংসারে অনাহূত এবং সমাজ বহির্ভূত হইলেও আমার এতটা দুর্গতি হইবে না ; সম্মান ও নয়, অবজ্ঞা-অপমান ও নয়—সম্পূর্ণ অলক্ষিতে নিজের মান নিজে রক্ষা করিয়া অপসৃত হইতে পারিব ! কিন্তু তাহা আর হইল না। দারিদ্র্যকে আমি কখনও ক্ষোভের কারণ হইতে দিই নাই এবং দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যত পীড়াদায়ক হউক না কেন, আত্মমর্যাদা রক্ষা করিতে পারিব, কাহারও কৃপার পাত্র হইতে হইবে না। আজ সেই আশা ও সেই বিশ্বাস চূর্ণ হইতেছে।[২]

আপনি যে সকল সৎপরামর্শ দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি পালনীয়। কিন্তু অবস্থাচক্রে পড়িয়া তাহার সবগুলি পালন করা সম্ভব হইবে না, এবং তজ্জন্য কষ্ট ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতেও হইবে। গ্রামে বাস করার একটা সামাজিক দায় আছে—সেটা নিতান্তই মানের দায় ; তাহাতে উত্তীর্ণ হইবার সামর্থ্য আমার নাই—তথাপি ডুবিয়া পার হইতে হইবে। আমার পিতৃবংশীয় কোন জ্ঞাতি বাংলা দেশে নাই ; আত্মীয় কুটুম্ব অনেক আছেন—বান্ধব কেহ নাই ; সে দোষ আমারই। এই কুটুম্ব গণের কয়েকজনকে (যাহাদের ঠিকানা জানি) সংবাদ দিতে হইবে। সাহিত্যিক বন্ধুদের—কেহ কেহ আমাকে তাঁহাদের ক্রিয়াকর্মে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—তা ছাড়া, কেহ কেহ আমাকে আন্তরিক স্নেহ করেন,—অসাহিত্যিক শিষ্য, বন্ধু, ও নিকট জনও কিছু আছে। আমি জানি, কলিকাতা হইতে অনেকেই আসিবেন না, তবু বড়দের ভয় করি. তাঁহারা আমার অবস্থাদর্শনের কৌতূহলে কষ্ট করিয়াও আসিতে পারেন ; আমি তাঁহাদিগকে সংবাদ না দেওয়াই স্থির করিয়াছি। কিন্তু ডাঃ দে, সজনী ও তারাশঙ্করকে এবং সুনীতিকে পত্রে নিমন্ত্রণ করা বোধহয় কর্তব্য[৩] যদিও প্রথম তিনজন—বিশেষতঃ সজনীকান্ত আসিবেন না বলিয়াই মনে হয়, আসলেও আমি বড় বিব্রত হইব। সজনীকান্তের সহিত আমার বৈর-সম্বন্ধ আরও সুগোচর হইয়া উঠিয়াছে। ঐ তিন জনকেই আমি ভয় করি, অথচ, নিমন্ত্রণ না করিয়া উপায় নাই[৪]। আপনার মত কি ? এলাহবাদের সুরেন্দ্রনাথ সেনের[৫] জ্যেষ্ঠ পুত্রের (কেশবগুপ্ত মহাশয়ের জামাতা ?) নাম কি ? তাঁহার আর এক ভাই যতীন্দ্রনাথ সেনের পুত্র এলাহবাদেই ওকালতী করে তাহার বাড়ীর ঠিকানা ও জানি না। যদি আপনি সংগ্রহ করিয়া জানান বড়ই উপকৃত হইব।

আমি দশদিনেই অশৌচান্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম—কিন্তু মন

কিছুতেই সায় দিতেছে না। আপনি বোধহয় জানেন না আমি ঐ আন্দোলনের আরম্ভে উহার ঘোরতর বিরোধী ছিলাম, এখন আরও বিরোধী তথাপি 'মহাজন-পন্থা' বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতেছিলাম, কিন্তু একটা চিন্তা আমাকে বড়ই অসুস্থ ও দ্বিধাগ্রস্থ করিয়াছে—পিতৃশ্রাদ্ধ এক নিয়মে, মাতৃশ্রাদ্ধ আর এক নিয়মে হয় কেমন করিয়া? পিতা ও মাতার মধ্যে এই ভেদ স্থাপন করিলে আমাকে পাতকের ভাগী হইতে হইবে। তাই পূর্ব্বের ছাপা নিমন্ত্রণপত্রগুলি ফেলিয়া দিতে হইল।"

আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি।

আপনার ভাগ্যহীন

মোহিতলাল মজুমদার

প্রাসঙ্গিক কথা

৭ নং চিঠি

১। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে আর্থিক এবং মানসিক সংকটে মোহিতলাল যখন বিপর্যস্ত, সে সময় মাতৃবিয়োগের আঘাত তাঁর সমস্ত চেতনাকে অসাড় করে দিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে পরুষ স্বভাবের মনে হলেও তাঁর অন্তর কত কোমল ও স্নেহপ্রবণ ছিল এটা তার প্রমাণ।

২। চিরজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেও মোহিতলালের পৌরুষ-দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা কখনও শিথিল হয়নি। পরিণত বয়সে মাতার মৃত্যু তাঁর সে বজ্র কঠিন সত্তার ভিৎ পর্যন্ত যে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তাঁর এ সাময়িক অবসাদের মধ্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৩। ডঃ দে অর্থাৎ ডক্টর সুশীলকুমার দে—মোহিতলালের হিতৈষীবন্ধু; সজনী অর্থাৎ সজনীকান্ত দাস—যাঁকে মোহিতলাল পুত্রবৎ স্নেহ করতেন; তারাশঙ্কর—অর্থাৎ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁর সৃষ্টি-প্রতিভার প্রতি মোহিতলাল খুবই সশ্রদ্ধ ছিলেন এবং ইনিও প্রথমে মোহিতলালকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন (দ্রষ্টব্য, আমার সাহিত্য জীবন, মোহিতলাল প্রসঙ্গ); সুনীতি—অর্থাৎ পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সমর্থনের পূর্ব পর্যন্ত মোহিতলাল এঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ ছিলেন। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সমর্থন করায় মোহিতলাল এঁকে তীব্র ভাষায়

আক্রমণ করেন। তথাপি পরম বেদনার মুহূর্তে এই অন্তরঙ্গ সুহৃদের কথা বন্ধুপ্রিয় মোহিতলালের মনে পড়েছে। এটা নিঃসন্দেহে মোহিতলালের প্রীতিরসে পূর্ণ অকৃত্রিম হৃদয়ের পরিচায়ক।

৪। সজনীকান্ত দাস-এর সঙ্গে মোহিতলালের মধুর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। সে কারণে সজনীকান্তের নিমন্ত্রণ রক্ষা সম্ভাবনায় মোহিতলাল বিব্রত বোধ করবেন বলে আশঙ্কা করছেন। বন্ধুবর ডক্টর সুশীলকুমার দে কিংবা ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করকে 'ভয় করি' বলার কারণ স্পষ্ট নয়। বোধহয় এখানে মোহিতলাল ডক্টর দে-র পারিবারিক জীবনের আভিজাত্য এবং তারাশঙ্করের নব-অর্জিত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৫। ইনি মোহিতলালের নিকট আত্মীয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ইনি এলাহাবাদ্ হাইকোর্টের জজ ছিলেন। আইনজ্ঞ হলেও ইনি বড়দাদা দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভক্ত শিষ্য এবং নিজেও সুকবি ছিলেন। (দ্রষ্টব্য, কাব্যমঞ্জুষা, ১২২ পৃঃ)

৬। মোহিতলাল ছিলেন বৈদ্যবংশজাত। বৈদ্যবংশীয়দের পক্ষে পিতা মাতা বা জ্ঞাতির মৃত্যুতে ১৫ দিন অশৌচ পালন করবার রীতি ছিল। এ রীতির বিরুদ্ধে বিখ্যাত কবিরাজ গণনাথ সেন শাস্ত্রীর নেতৃত্বে বৈদ্যবংশীয়দের মধ্যে ব্রাহ্মণদের মত ১০ দিনের অশৌচান্তে শ্রাদ্ধের জন্য একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। মোহিতলাল বরাবরই এ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন এবং বৈদ্যদের পূর্ব বিধি অনুযায়ী ১৫ দিন অশৌচান্তে পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন। এখন নতুন বিধি অনুসারে দশ দিন অশৌচান্তে মাতৃশ্রাদ্ধ করতে তাঁর মনে প্রবল দ্বিধা উপস্থিত হয়েছে। বিশেষত পিতৃশ্রাদ্ধ এক বিধিতে এবং মাতৃশ্রাদ্ধ আর এক বিধিতে করলে সামঞ্জস্য থাকে না বলে তিনি শেষ পর্যন্ত স্বজাতির পুরাতন বিধি অনুসারেই মাতৃশ্রাদ্ধ করেন। সামাজিক বিধি পালনেও মোহিতলালের মন কতটা বিচারশীল ছিল এটা তার প্রমাণ।

(৮নং চিঠি)

বড়িশা
ইং ১৮।১।৫০

সুহৃদ্বরেষু,

ভাই কালিদাসবাবু, আপনার কার্ড এইমাত্র পাইলাম। আপনাদের শুভচিকীর্ষার জন্য ধন্যবাদ। আমার এক্ষণে রাহু ও শনির বক্রী দশা চলিতেছে তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি কিছুরই প্রত্যাশা করি না।

এত'দনে যদি ঐ গ্রহদোষ কাটিয়া যায়—বলিতে পারি না—তাহা হইলে আপনাদের ঐ বারিবিন্দু তাম্রল সৈকতে শুকাইতে নাও পারে। আপনারা যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিবেন ; আমার মতামত লইবেন না।[১]

আমি কিছুকাল যাবৎ সকল প্রকার সামাজিক ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছি—কোথাও যাই না, পত্রাদিও লিখিনা, তাহা আপনি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছেন। একটা বড় রকমের ঔদাসীন্য আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। তাই প্রয়োজন থাকিলেও আমি কিছুই করি না—কর্তব্যও করি না। শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বাবুকে আমার একটা অভিনন্দন জানানো উচিত ছিল, তাহা জানাই নাই।[২] শ্রীমান্ অনিল রায় তাঁহার জন্য আমার নিকট হইতে দুই-খানি কাব্য বিস্মরণী ও স্মরগরল লইয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি পাইয়াছেন কিনা জানি না, আপনি সংবাদ লইলে সুখী হইব।

আর একটি কথা। শুনিতেছি আমার 'কাব্য মঞ্জুষা'[৩] নাকি Matriculation. এর Additional বাংলায় পাঠ্য হইয়াছে ; সে কি বস্তু জানি না। যদি তাহা হইয়া থাকে তবে আমাকে একটু জানাইয়া তাহা করিলে ভাল হইত ; কারণ ঐ বই কলিকাতায় পাওয়া যায় না—পাকিস্তানের Publication—এখন উহা আরও দুষ্প্রাপ্য হইবে। একটি নূতন কলিকাতা সংস্করণ প্রকাশিত করিবার আবশ্যকতা অনেকদিন হইতে বোধ করিয়াছি এবং আমার Publisher-এর সঙ্গে সে বিষয়ে একটা বন্দোবস্ত ও হইয়া আছে। কিন্তু তাহা ছাত্রপাঠ্য ছোট সংস্করণ, কিম্বা সাধারণ পাঠ্য বৃহৎ সংস্করণ হইবে, এখন ও তাহা ঠিক হয় নাই। আমার ইচ্ছা বড় আকারের হয়, কারণ, ইতিপূর্ব্বে উহার একটি নূতন সংস্করণ ঢাকার জন্য ছাপা হইয়াছিল তাহাতে পূর্বের ৬০টি কবিতা বদল করা হইয়াছে। সে সংস্করণ বাজারে বাহির হয় নাই, আপনারাও দেখেন নাই। এই দুই সংস্করণ মিলাইয়া প্রায় ১৬০টি কবিতার সম্পূর্ণ একখানি সঞ্চয়ন আমি প্রকাশিত করিতে চাই সাধারণ কাব্যপিপাসু ও কাব্য শিক্ষার্থীদের জন্য[৪], কারণ স্কুলপাঠ্য হইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন আর নাই, কোনখানে সেরূপ পাঠ্য হইবার আশা নাই। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদকে উহা বৃহত্তর ছাত্রমণ্ডলীর হাতে দেওয়াইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম—আমার উপকারের জন্যই নয়, বাংলা কবিতার রীতিমত পঠন পাঠনের জন্য। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো দেশে লেখাপড়ার উন্নতির জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নয়, কাজেই নানা অজুহাতে আমার সেই অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই—খগেন

মিত্র মহাশয়ের বই হইলে একটা নিশ্চয় হইত। যাক্ এখন আমার কথা এই যে, 'কাব্যমঞ্জুষা'র ঐ সংস্করণ কলিকাতায় পাওয়া যাইবে না, নূতন সংস্করণ কিরূপ হইবে তাহা ঠিক হয় নাই। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার্থীর জন্য বড় সংস্করণ নিশ্চয়ই আবশ্যক হইবে না। কিন্তু মাত্র কয়েকখানির জন্য একটা বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া লাভ কি? প্রকাশক তাহা করিতে চাহিবে না। আপনি এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বাবুর সহিত আলাপ করিয়া আমাকে শীঘ্র জানাইলে বড়ই উপকৃত হইব।[৫] আমার 'স্বপন পসারী' লইয়াও এইরূপ বিপদে পড়িয়াছি—ঢাকা য়ুনিভার্সিটি উহাকে B. A. Optional এর পাঠ্য করিয়াছে অথচ ঐ বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ আর বেশি নাই—আর একটা edition ছাপিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ দুই-তিন শোর বেশি দরকার হইবে না।[৬]

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমার প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন ও নমস্কার জানিবেন। ইতি—

আপনার
মোহিতলাল

প্রাসঙ্গিক তথ্য

৮নং চিঠি (১৯-১.৫০ তারিখে বড়িশা থেকে লিখিত)

১। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে লেখা এ চিঠিতে অদৃষ্টের কাছে মোহিতলালের আত্ম-সমর্পণের ভাবটাই স্পষ্ট হয়েছে।

২। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে মোহিতলাল ১৯৪৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস.' পাঁচ দিনে বক্তৃতা সমাপ্ত হয়। বক্তৃতাকয়টি পরে 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় (১৯৫৫)। এ মূল্যবান গ্রন্থে বঙ্কিমের উপন্যাস সম্পর্কে মোহিতলালের পরিণত চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে। বিদগ্ধ মহলে গ্রন্থখানি উপযুক্ত সমাদর লাভ করায় শীঘ্র সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। এখনও বঙ্কিম সাহিত্য অনুরাগীদের নিকট এ গ্রন্থের চাহিদা খুব

বেশী। অথচ এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রনের কোন ব্যবস্থা করেন্‌নি।

সমালোচনার আদর্শ সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকলেও শ্রীকুমারবাবু মোহিতলালের খুব গুণগ্রাহী ছিলেন। নানা প্রসঙ্গে মোহিতলাল শ্রীকুমারবাবুকে তীব্র আক্রমণ করলেও মোহিতলালের প্রতি শ্রীকুমারবাবুর শ্রদ্ধা কখনও হ্রাস পায়্‌নি। ১৯৫৫ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত মোহিতলালের 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস'-এর তিনি যে-ভূমিকা লেখেন সেটিকে সমালোচক মোহিতলালের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার অমূল্য দলিলরূপে গণ্য করা যায়। সমসাময়িক বঙ্কিম সমালোচনার তুলনায় মোহিতলাল এ পর্যায়ের সমালোচনায় যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, গুণগ্রাহী সহৃদয় শ্রীকুমারের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল এ ভাবে :

> "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম যখন শরশয্যাশায়ী হইয়া মস্তকের উপাধান ও পিপাসানিবৃত্তির জন্য পানীয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন দুর্যোধন তাহার জন্য কোমল তুলার বালিশ ও স্বর্ণভৃঙ্গার ভরিয়া সুবাসিত জল আনিয়াছিলেন ; কিন্তু ভীষ্মের ইঙ্গিত বুঝিয়া অর্জুন করে-রচিত উপাধানের দ্বারাই তাঁহার অধোলুণ্ঠিত শিরকে দেহের সহিত সমোচ্চতায় স্থাপন করিলেন এবং শরক্ষেপ দ্বারাই পাতাল প্রদেশ হইতে সুমিষ্ট ভোগবতী-ধারা উৎসারিত করিয়া সেই রণাঙ্গনশায়ী মহাবীরের তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। মনে হয় যেন বঙ্কিম-সমালোচনা ক্ষেত্রে মোহিতলালের সহিত সাধারণ সমালোচনার পার্থক্য অর্জুন ও দুর্যোধনের পার্থক্যের অনুরূপ।' (২৩ শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪)।

মোহিতলালের মৃত্যুর পরে বিভিন্ন স্মরণ সভায় তাঁর স্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে শ্রীকুমারবাবু তাঁর চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও মতামতের দৃঢ়তা সম্পর্কে যে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন তাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। শ্রীকুমারবাবুর আনুকূল্যের জন্য মোহিতলাল তাঁর প্রতি খুবই কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যের অবসাদের জন্য সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করছেন। কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক পত্র লিখতে অসমর্থ হলেও মোহিতলাল লোক মারফতে তাঁর রচিত প্রিয় কাব্য বিস্মরণী ও স্মরগরল শ্রীকুমারবাবুকে উপহার পাঠিয়েছিলেন।

৩। 'কাব্যমঞ্জুষা' মোহিতলাল সংকলিত একখানি কবিতা সঞ্চয়ন।

ঢাকা থেকে ১০.৬.৪২ তারিখে অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লিখিত পত্রে জানা যায়, ঢাকা বোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য হিসাবে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করে ১০০টি সুনির্বাচিত কবিতা সংগ্রহ করে এ সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। ঐ চিঠিতে মোহিতলাল লিখেছেন, কবিতা চয়নকে নিখুঁত করবার উদ্দেশ্যে তিনি সমস্ত মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। সম্পাদকীয় বিবরণে মোহিতলাল লিখিত 'কবিতার কথা,' 'পদ্য ও গদ্য,' 'কবিতা ২য় প্রকার,' 'বাংলা কবিতার ছন্দ' প্রভৃতি অংশ খুবই মূল্যবান। 'কবিতা পাঠ' অংশে মোহিতলাল কৃত প্রত্যেক কবিতার প্রয়োজনীয় টীকা স্থান পেয়েছে। পরিশিষ্টে আছে একটি glossary ও কবি-পরিচয়। ছাত্রপাঠ্য হলেও তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে কবিতা পাঠ এবং উপভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করাই ছিল সংকলক মোহিতলালের লক্ষ্য। সংকলন গ্রন্থটির মূল্য বিচারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রবেশিকা পরীক্ষার অতিরিক্ত বাংলার পাঠক্রমে বইখানিকে অন্তর্ভুক্ত করেন। বর্ধমান ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় অতিরিক্ত বাংলার পাঠক্রমেও বইখানি অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪। সাধারণ কাব্যপিপাসু এবং কাব্যশিক্ষার্থীদের মনে কবিতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ সঞ্চার করবার উদ্দেশ্যে 'কাব্য মঞ্জুষা'র একটি বৃহত্তর সংস্করণ (১৫০টি কবিতায় সম্পূর্ণ) মোহিতলাল সম্পাদনা করেন এবং সংকলনটি কলিকাতার একটি প্রকাশক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

৫। উক্ত সুনির্বাচিত এবং সুসম্পাদিত সংকলনটিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করবার জন্য মোহিতলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত না হলে সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশের অন্তরায় হতে পারে এ সম্ভাবনায় মোহিতলাল প্রিয়বন্ধু কালিদাস রায়কে পরোক্ষভাবে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্য লাভের জন্য সক্রিয় হতে অনুরোধ করেছেন।

৬। 'স্বপন পশারী' মোহিতলালের দ্বিতীয় এবং উল্লেখযোগ্য প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'নাদির শাহের জাগরণ', 'নাদির শাহের শেষ' 'শেষ শয্যায় নূরজাহান', 'বেদুইন', 'উচ্চৈঃশ্রবা', 'আবির্ভাব' প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা এ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কাব্যগ্রন্থটি জনপ্রিয় হয়েছিল। কবির জীবিতাবস্থায় বঙ্গভারতী গ্রন্থালয় 'স্বপন পশারী'র একটি সুন্দর ও শোভন

সংস্করণ প্রকাশ করেন (শ্রাবণ, ১৩৫৮)। এতে মোহিতলাল খুবই আনন্দিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ কাব্যগ্রন্থখানিকে বি. এ. ঐচ্ছিক বাংলার পাঠ্য তালিকাভুক্ত করেন।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা গ্রন্থ

বারিদবরণ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন বিচিত্র-পথচারী। বহু তার সংখ্যা। বর্তমান প্রবন্ধে তার একটি বেছে নিয়েছি। সে পথে প্রলম্বিত একটি প্রসঙ্গ : 'রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা গ্রন্থ'। রবীন্দ্র-সম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থতালিকায় মোট সাতটি পুস্তকের নাম দেখা যায়। এর মধ্যে তিনটি বাংলা। বাংলা গ্রন্থগুলি আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রবন্ধের পরিসর বৃদ্ধির কথা ভেবে অন্য গ্রন্থগুলি সম্পর্কে আলোচনায় বিরত থাকলাম। শুধু ভূমিকা হিসাবে এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করি। সেগুলি হল (বর্ণানুক্রমে)—'উপনিষৎ সংগ্রহ', 'One Hundred Poems of Kabir', 'সংক্ষিপ্তম্ বাল্মীকিয় রামায়ণং' এবং 'সংস্কৃত প্রবেশ'।—বাংলা গ্রন্থগুলির নাম (কালানুক্রমে) 'পদরত্নাবলী,' 'কুরুপাণ্ডব' এবং 'বাংলা কাব্য পরিচয়।'

প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রগবেষকগণ কেউই রবীন্দ্রনাথ যে কোনো উপনিষদ্ গ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন, এমন উল্লেখ করেন নি। জাতীয় গ্রন্থাগারে পাঠকালে রবীন্দ্র-সম্পাদিত একটি ছোট উপনিষৎ-সংকলন আমি দেখেছি। উপনিষদের মন্ত্রদীক্ষিত কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এমন একটি উপনিষৎ-সংগ্রহ সম্পাদনা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

কাশী থেকে শান্তিনিকেতনে আসবার (১৯০৮ খ্রীঃ) কয়েক বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন কবীরের দোহা প্রভৃতির মূল ও বঙ্গানুবাদ এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে চারখণ্ডে প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থ অবলম্বনে অজিত কুমার চক্রবর্তী শতাধিক সর্বোৎকৃষ্ট দোহা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। কবি সেই সব অনুবাদগুলি থেকে একশোটি

বেছে নিয়ে এবং প্রয়োজন মতো অদলবদল ক'রে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আধুনিক ভারতীয় চিন্তধারা ও প্রাচীন ভারতের ধর্মকথার সেতুবন্ধন যে এই মধ্যযুগীয় সন্তগণ—রবীন্দ্রসম্পাদিত এই 'One Hundred Poems of Kabir' গ্রন্থ থেকে তা' প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

রামায়ণ সম্পর্কে কবির আগ্রহ শৈশবাবধি। আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের রামায়ণ কবির অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ ছিল। 'জ্ঞানাঙ্কুরে' মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচন'য় কিশোর কবির রামায়ণ সম্পর্কে অধিকারের কথা প্রথম জানা যায়। রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য যখন সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের একটি সংক্ষিপ্তরূপ প্রদান করেন 'সংক্ষিপ্তম্ বাল্মীকির রামায়ণ' (প্রকাশ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৯) নামে, তখন সেটি রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে সম্পাদনা করেন।

পূর্বোক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'সংস্কৃত শিক্ষা'র খণ্ডদ্বয় (১৮৯৬)। এই গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল স্বীয় পরিবারের পুত্রকন্যাদের সহজে সংস্কৃত শিক্ষা দান। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতিতে কেউ সংস্কৃত শিক্ষা নিলে 'এক বৎসরের মধ্যে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে।' এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ('বঙ্গীয় শব্দকোষ'-খ্যাত)-কে উৎসাহিত করেন। সেই মত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংস্কৃত প্রবেশ' তিন খণ্ডে (প্রকাশ, সন ১৯০৪-৬খ্রী, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৯) ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই তিন খণ্ডের সম্পাদক হিসাবে পরিচিত থাকলেও আমার বিশ্বাস, তিনি কেবলমাত্র প্রথম ভাগটিই সম্পাদনা করেন।

'সংস্কৃত শিক্ষা'র একটি উত্তর ভাগও প্রকাশিত হয় 'শিক্ষক' নামে (৬৫ পৃষ্ঠা)। বস্তুতঃপক্ষে এটি 'সংস্কৃত প্রবেশের' অনুশীলনীগুলির উত্তরমালা। এটিও কবি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করি।

৩

এবারে রবীন্দ্র সম্পাদিত বাংলা গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। এই তালিকায় প্রথম গ্রন্থের নাম **'পদরত্নাবলী'**।

১২৮৬ বঙ্গাব্দের শেষে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। প্রিয়নাথ সেন, যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, আশুতোষ চৌধুরী, লোকেন পালিত প্রভৃতি গুণ-গ্রাহীগণ ব্যতীত কবির কাছে আসতেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। বৈষ্ণব কবি বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর তিনি। পারিবারিক কারণে বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর অধিকার ছিল অকুণ্ঠিত। কবি এঁর সঙ্গে সাহিত্যালোচনায় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসন্ন রস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হতেন। প্রকৃতপক্ষে কৈশোরেই কবির সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর পরিচয় ঘটেছিল। সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রকাশিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের খণ্ডগুলি কবির লোভের সামগ্রী ছিল। ইতিপূর্বে প্রকাশিত বৈষ্ণবপদসংহিতাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পদরত্নাবলীর' একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। সাহিত্যের দৃষ্টি কোণ থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যকে দেখার প্রথম তাগিদ দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই। তিনিই বিশ্বসাহিত্যে পদাবলীর স্থান কোথায় তা নির্ণয়ে উদ্যোগী হলেন এই সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ কালে। 'জগতের নিত্য সাহিত্যে' পদাবলীর স্থান নির্দিষ্টকরণ কর্মে তাঁর প্রথম সহায়ক হন নবলব্ধ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

একালে কবির ব্যক্তি ও মানস জীবনে একটি ক্ষতির সংবাদ আমাদের জানা—তা হ'ল কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু (৮ বৈশাখ ১২৯১)। সান্ত্বনার সন্ধানে কবি অতীত সাহিত্যের গভীরে ডুব দিলেন। সেঁচে আনলেন রত্ন সেখান থেকে 'পদরত্ন'। শ্রীশচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' তখন লুপ্ত। শ্রীশচন্দ্র তাঁর বন্ধুত্বের নীলমোহর মুদ্রিত করলেন কবির সঙ্গে একযোগে 'পদরত্নাবলী' সম্পাদনায়। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে উভয়ের যৌথ সম্পাদনায় একশো দশটি বৈষ্ণব পদের সংকলন 'পদরত্নাবলী' কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 'পদরত্নাবলী'র ভূমিকা রচনা করেন শ্রীশচন্দ্র। কারণ ভূমিকায় কেবলমাত্র তাঁরই নাম মুদ্রিত আছে। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার সঙ্গত অনুমান করেছেন—'পদগুলি নির্বাচন করিবার ভার লইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ভূমিকায় বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যাখ্যা করিবার দায়িত্ব লইয়াছিলেন শ্রীশচন্দ্র।' আমাদের অবশ্যই মনে আছে, এর ঠিক অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' আত্মপ্রকাশ করেছিল (১২৯১)।

'পদরত্নাবলী' প্রকাশের কাল পর্যন্ত পরিমাণগত হিসাবে এটিই ক্ষুদ্রতম

সংহিতা গ্রন্থ। বৃহত্তম সঙ্কলন ছিল 'পদকল্পতরু'—৩১০১টি পদের বিপুলায়তন সংহিতা। লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্র-সংকলিত একশো দশটি পদের মধ্যে পঁচানব্বইটি পদ 'পদকল্পতরু'তে বর্তমান। তবে এ থেকে এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হবে যে, কবি 'পদকল্পতরু' থেকে পদ চয়ন করেছিলেন। বটতলার অপ্রামাণিক সংস্করণ কিছুতেই কবির উৎস-গ্রন্থ হতে পারে না। তিনি প্রত্যক্ষতঃ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংকলিত 'ক্ষণদাগীত চিন্তামণি'র পুঁথি এবং রামরত্ন বিদ্যারত্ন প্রকাশিত (১২৮৫ সন) ও রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত 'পদামৃত সমুদ্র'-এর মুদ্রিত গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া পূর্বোক্ত সারদা-অক্ষয় সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' তো ছিলই। 'পদকল্পলতিকা'র (১৮৪৯) মুদ্রিত গ্রন্থও তিনি ব্যবহার করেছিলেন। পুঁথি এবং মুদ্রিত গ্রন্থ ব্যতীত পদাবলী সংগ্রহের তৃতীয় উৎস ছিল কবির কাছে—গায়কের গান। প্রমাণ স্বরূপ 'পদরত্নাবলী'তে ধৃত লোচন-রচিত ৭৪ সংখ্যক পদের শেষে তিনি 'নবদ্বীপে কোন বৈষ্ণব গায়কের' মুখে শ্রুত একটি অসম্পূর্ণ পাঠান্তরও সংযুক্ত করেছেন। শুদ্ধ পাঠনির্ণয়ের জন্য এবংবিধ প্রযত্ন গ্রহণের উদ্যম সবিশেষ লক্ষণীয়।

এর একটি কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংগ্রহ প্রকাশে উদ্যোগী হননি। সম্ভাবিত এবং প্রকৃত পদ-রূপ নির্ণয়ে লক্ষ্য ছিল বলে তাঁদের সংকলিত এই গ্রন্থ 'সাধন ভজন'-উদ্দেশ্যহীন হয়ে সাহিত্যিক রস পরিবেষণে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এর অন্যতম প্রমাণ গ্রন্থসূচনায় গৌরচন্দ্রিকার সর্বৈব অনুপস্থিতি। সংকলনে গৌরবিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বাসু ঘোষের পদের অনুপস্থিতি এর আরও একটি প্রমাণ। অবশ্য গ্রন্থের একেবারে শেষের দিকে ৭৯-৮৩ সংখ্যক পদপঞ্চকে গৌরাঙ্গ বিষয়ক গীতগুলি সংকলিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে চৈতন্য সম্পর্কে কবির শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। কিন্তু চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রসপর্যায়ের আনুগত্য এক পংক্তিভুক্ত হয়ে ওঠেনি তাঁর কাছে।

প্রচলিত প্রাচীন বৈষ্ণব পদসঙ্কলন গ্রন্থগুলি থেকে 'পদরত্নাবলীর' পার্থক্য অন্য ক্ষেত্রেও। এখানে রবীন্দ্রনাথের যদুনন্দন দাসের 'দেবী ভগবতী পৌর্ণমাসী খ্যাতি'-শীর্ষক বাল্যলীলার পদটি দিয়ে সঙ্কলনের সূচনা করেছেন। তারপর বংশীদাস, নরসিংহদাস ও অজ্ঞাত কবির লেখা মোট চারটি পদ সন্নিবেশ ক'রে মাতা যশোদার বাৎসল্যভাবকে প্রকাশ করেছেন। বারোটি পদ (৬,৭,৯-১৮)

গোষ্ঠলীলা-বিষয়ক। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রানুসারে সজ্জিত অন্য পদসঙ্কলনগুলিতে মধুররসের পদ-সংখ্যারই আধিক্য। এখানে তার লক্ষণীয় ব্যতিক্রম, একশো দশটি পদের মধ্যে সতেরটি পদই বাল্যলীলা বিষয়ক। এই সংখ্যা আবশ্যিক-ভাবে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তাধারার প্রকাশক। প্রকৃতপক্ষে মানব-জীবনের শুভ্র যাথগন্ধহীন পবিত্র কালই তো এই শৈশব। বলরাম দাস, যাদবেন্দ্র এবং বিপ্রদাস ঘোষ স্বভাবতই এই পর্যায়ে কবির প্রিয় রচয়িতা হিসাবে মর্যাদা-ভূষিত। রসশাস্ত্রের আলঙ্কারিক নির্দেশ কবিকে প্রভাবিত করতে পারে নি। তিনিও সম্ভবতঃ মধুসূদনের মতই বলতে চেয়েছিলেন—শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণির নির্দেশের দ্বারা আমি নিজেকে বাঁধতে চাই না।

এরপর উনিশ থেকে ছত্রিশ সংখ্যক—এই আঠারোটি পদে বংশীবদন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, বংশীদাস, যদুনাথ, দাস, অনন্তদাস, শ্রীনিবাস দাস ও অজ্ঞাত কবির শ্রেষ্ঠ পদগুলি চয়ন করে রাধার পূর্বরাগের সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ একটি গীতিআলেখ্য সম্পাদক আমাদের উপহার দিয়েছেন। সংযমের যে সৌন্দর্য্য, বিন্দুর যে সিন্ধু-স্বাদ—তা চব্বিশ বছরের রসবোদ্ধা কবি-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই পরিবেষণ করা সম্ভব ছিল। একথা অবশ্য বলছি, বৈষ্ণবধর্মের রসিকদের দিকে চেয়ে নয়, বলছি সাহিত্যের রসিকদের দিকে লক্ষ্য রেখে। ধর্মরসিক এই সংকলনে অভিসারের পর (৫৪-সংখ্যক) রাসনৃত্যের (৯৪-৯৫-সংখ্যক) সন্নিবেশ থেকে পর্য্যায়ভঙ্গের অনুযোগ তুলতে পারেন। তথ্যানুসন্ধানীর দৃষ্টি এই দেওয়ালে এসে বাধাপ্রাপ্ত হোক ; রসানুসন্ধানীর দৃষ্টি তাকে ভেদ ক'রে গভীরে প্রবেশ করবে। বৈষ্ণবপদাবলীর এক শ্রেষ্ঠ রসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পদরত্নাবলী' হাতে পেয়ে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত একটি পত্রে (২৫ আশ্বিন ১২৯২) লিখেছিলেন—"পদরত্নাবলী" পাইয়াছি।...তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ করিবেন।...।'

"মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্র সংগ্রহ" এই 'পদরত্নাবলী'তে কবির প্রিয় কবি কারা দেখা যাক্। মোট পদ সংখ্যা, আগেই বলেছি, একশো দশ। এর মধ্যে বলরাম দাসের পদ সর্বাধিক—সতেরোটি। চণ্ডীদাসের চোদ্দটি এবং বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের এগারোটি

ক'রে। পক্ষান্তরে অন্য সংকলকদের প্রিয় কবিদের মধ্যে বসু রামানন্দ, ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতির পদ কবি সঙ্কলন করেননি। অবশ্য গ্রন্থের পরিসরের কথাও মনে রাখতে হবে। অবহেলা এর কারণ নিশ্চয়ই নয়। পাছে বিপুলায়তন সঙ্কলন করতে গিয়ে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় সেকারণে বহুক্ষেত্রে কবিকে সংযত হতে হয়েছে—পদামৃত'সমুদ্র'থেকে তিনি 'রত্নাবলী'-মাত্র চয়ন করেছেন। কবির কাছে লক্ষ্য মানুষের হৃদয়, 'অপ্রাকৃত নবীন মদন' নয়। 'পদরত্নাবলী' সঙ্কলনের সাত বছর পরে রচিত কবিতায় (বৈষ্ণব কবিতা'—সোনার তরী) সেই ভাবই মূর্ত :

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহমিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারিচক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে—একি শুধু দেবতার ?
এ সংগীত রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্তবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা ?

১০৮ নং পদে 'শিশুকাল হইতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে' যে 'নেহা' ছিল, তা ১০৯ নং পদে 'নিতুই নৌতুন পিরীতি'-তে বর্ধিত-রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু কবিবল্লভের (বা বিদ্যাপতি) মতই কবিও জানতেন এই প্রেমের প্রকৃতি হল :

জনম অবধি হৈতে ওরূপ নেহারনুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা ॥

—একশো দশ-সংখ্যক পদটি এই গীত দিয়েই সমাপ্ত হয়েছে।

(৪)

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সংজ্ঞা দেবী বলেছেন, সুরেন্দ্রনাথের 'প্রথম বই বিয়ের আগেই লেখা। মহাভারতের সাগর সেঁচে রত্ন তুলে তার মূল আখ্যানটি লিখে ছাপিয়েছেন। শুনেছি তখন তিনি রোগশয্যায়। প্রায় দু-আড়াই মাস বিছানায় শোয়া। তখন রবিকাকার অনুরোধে এই বই লেখেন।' এই বইটির নাম হল 'মহাভারত।' সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সঙ্কলিত এই 'মহাভারত' আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে দুটি পৃথক্ অধ্যায়ে প্রায় ছয়-শত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"যাঁহার স্নেহে ইহা সম্ভব হইয়াছে,/যাঁহার উপদেশে ইহা গঠিত হইয়াছে,/যাঁহার সাহায্যে ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে./তাঁহারই শ্রীচরণে,/অনুপযুক্ত হইলেও,/এই গুরুদক্ষিণা/সমর্পিত হইল।"

বস্তুতপক্ষে সুরেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বৃত্তি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃকই উদ্বোধিত হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ-প্রসঙ্গে তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছিলেন—"বাবা মনে করতেন—রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত।...রামায়ণ সংক্ষিপ্ত করার ভার দিলেন মাকে আর মহাভারত সুরেনদাদাকে। তাঁকে বললেন কালী-প্রসন্ন সিংহের তর্জমা অবলম্বন করে সংক্ষিপ্ত করতে।...

'সুরেনদাদা প্রায়ই শিলাইদহে আমাদের কাছে আসছেন।...জানতুম, তিনি মহাভারত সংকলনের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে আসবেন, যতটা লেখা হয়েছে আমাদের পড়ে শোনাবেন। লেখা শেষ হতে দেরি হল।...১৯০৩ সালের শীতকালে আমি ও আমার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার...মার্চ মাসে এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, বাবা সেই সময় লাইব্রেরির বারান্দা বসে সুরেনদাদার সংকলিত মহাভারত ছেলেদের পড়ে শোনাতে লাগলেন।'

কাজেই দেখা যাচ্ছে গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে সুরেন্দ্রনাথ কবিগুরুর হৃদয়ের একটা বড়ো অংশ অধিকার ক'রে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মহাভারতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করতেন। সেকারণে 'মহাভারতের' মূল কাঠামো বজায় রেখে এর একটি বিদ্যালয়-পাঠ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশে কবি উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কানাডা যাবার উদ্দেশ্যে কবি ফেব্রুয়ারির শেষে কলকাতা থেকে বোম্বাই রওনা হন। ট্রেনে বসে সুরেন্দ্রনাথের 'মহাভারত' খানি নিয়ে

ইতস্ততঃ কাটাকুটি করে চলেছেন সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে। এটিই পরে ২৭১ পৃষ্ঠায় সংহত হয়ে **'কুরু-পাণ্ডব'** নামে প্রকাশিত হয়। সেদিক থেকে এটিকে প্রায় একটি নব-রচিত গ্রন্থ-ও বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্র-সম্পাদিত এই 'কুরু-পাণ্ডবের' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। কবির জীবৎকালের এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় সাত বছর পরে ভাদ্র ১৩৪৫ সনে। কবি তাঁর সপ্ততিতম জন্মদিনে 'কুরুপাণ্ডবের' যে ভূমিকা রচনা করেন, এখন তার উল্লেখ করি। তা থেকে এই গ্রন্থ সম্পাদনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে।

বিজ্ঞাপন ॥ কিছুকাল হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ মহাভারতের মূল আখ্যানভাগ বাংলায় সংকলন করেন। তাহাকেই সংহত করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তিকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে একথা বলা বাহুল্য। এই কারণে যে বাংলা রচনারীতি বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাংলা ভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না হইতে সন্দেহ নাই। এই কথা মনে রাখিয়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উচ্চতরবর্গের জন্য এই গ্রন্থখানির প্রবর্তন হইল। অন্যত্র অন্য বিদ্যালয়েও যদি ইহা ছাত্রদের পাঠ্যরূপে ব্যবহারযোগ্য বলিয়া গণ্য হয় তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৩৮।

—'ওকাকুরা যেমন বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তেমনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত।'

৫

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত তৃতীয় ও শেষ বাংলা গ্রন্থ **'বাংলা কাব্য পরিচয়।'** বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যত্ন ছিল নিরলস ও নিরবচ্ছিন্ন। এ নিয়ে দীর্ঘ ইতিহাস রচনার অবকাশ আছে। সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে গুরুদেব বুঝেছিলেন, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাকে অনুপ্রবিষ্ট না করতে পারলে একে উচ্চস্থানে

প্রতিষ্ঠিত. করা যাবে না। ১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৪এ অগ্রহায়ণ তারিখে রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে কবি এই দাবী সোচ্চারে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, বাংলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মাধ্যম করে তুলতেই হবে। আমরা যে 'ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চ শিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়', এজন্য কবি ধিক্কার দিয়েছেন। কবি আরও বলেন, 'বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে।' বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে বাংলা পঠন-পাঠনে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহা-ভারতের' অন্তর্ভুক্তির কথা আমরা এ-প্রসঙ্গে পুনশ্চ স্মরণ করি।

কবির এবম্বিধ মত রাষ্ট্রনৈতিক পর্যায়েও একবার উচ্চারিত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার :শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হকের উৎসাহে উদ্‌যাপিত 'শিক্ষা সপ্তাহে' (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬) প্রদত্ত 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' ভাষণে। দুঃখের বিষয় তৎকালীন লীগ গভর্ণমেন্ট বাংলা ভাষার মাধ্যমে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের এই প্রস্তাবটির সারবত্তা অনুধাবন করতে পারেন নি।

এই সব বিবিধ চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কাব্য সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক পরিচয় শিক্ষিত সাধারণের সামনে তুলে ধরার বিষয়ে কবি নিজেই আগ্রহী হলেন। এরই ফলে 'বাংলা কাব্য পরিচয়ের' সৃষ্টি। এ কাজে স্বয়ং কবিকে সংকলন এবং সম্পাদনা—উভয় কর্মেই লিপ্ত হতে হ'ল। তাঁকে সহায়তা করলেন কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। ইনি ১৯৩৭-এর গোড়া থেকে ১৯৩৮-এর জুলাই পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন। 'কাননবিহারী যে-সব কাব্য কবির গোচর করিতেন তাহা হইতেই প্রধানত বাছাই চলিত।' কারণ বয়োভারে ক্লান্ত অনবসর কবির পক্ষে বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ধারার সঙ্গে পরিচয় করে ওঠা সম্ভব ছিল না। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত কাব্যসঞ্চয়ন হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থটি তৎকালীন পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে সমর্থ হয়নি। কবি এ বিষয়ে নিজেই অবহিত ছিলেন। গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে তিনি সে কারণে নিজেই লিখেছেন,—

'কোনো একটি মাত্র সংস্করণে এরকম কাব্য-সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হোতেই পারে না। বাংলা কাব্য-পরিচয়ের এই প্রথম সংস্করণে নিঃসন্দেহেই অনেক অভাব রয়ে গেছে। অনেক কবিতা চোখে পড়েনি। অনেক নির্বাচন যোগ্যতর

হোতে পারত। যে সংকলনে রচয়িতারা স্বয়ং তৃপ্ত হননি তাঁদের নির্দেশ পালন করলে হয়তো তা সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা থাকত।

আধুনিক কবিতার ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে, সুতরাং তার সংগ্রহ ভাবী সংস্করণে পূর্ণতা ও উৎকর্ষ লাভ করবে এই প্রত্যাশা সংকলনকর্তার মনে রইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

এবারে আমরা কাব্যসঞ্চয়নের সূচীপত্রের দিকে লক্ষ্য রাখি। আলাওল থেকে বিশা ভুঁঞিমালী পর্যন্ত পঁয়ত্রিশজন কবির তিপান্নটি কবিতা নির্বাচন করে কবি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য সাহিত্যের ধারা নির্দেশ করতে চেয়েছেন। এঁদের মধ্যে কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-বলরামদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, দাশরথি, নিধুবাবু, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি পরিচিত কবিকুলের কবিতা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি কালীমির্জা, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, গগন হরকরা, ঈশান মুন্সী, জগা কৈবর্ত, বাউল গঙ্গারাম, মদন বাউল, পদ্মলোচন, বিশা ভুঁঞিমালীর মত অখ্যাত ও অশ্রুত কবির কবিতাও পংক্তিভোজের অধিকার পেয়েছে। তৎকালাবধি কোনো কাব্য-সঞ্চয়নে বিভিন্নকালের এতোগুলি খ্যাত-অখ্যাত কবির সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়নি। মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ ও দাশরথি রায়ের কবিতার সংখ্যা সর্বাধিক—প্রত্যেকের তিনটি ক'রে। ছ'টি অনামী ছড়া-ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথাগত কবিতা ছাড়া ছড়া, কবিগান, বাউল গানেরও যে একটা স্থান বাংলা কাব্যধারায় আছে, একথা রবীন্দ্রনাথেরই প্রথম মনে হয়েছিল।

আধুনিকযুগের প্রতিনিধিত্বমূলক ১৫৪টি কবিতা এরপর সংকলিত হয়েছে। এগুলি রচয়িতার সংখ্যা ৯২। প্রাচীন যুগ অপেক্ষা আধুনিক যুগ সম্পর্কে, অন্ততঃ এই কাব্যসঞ্চয়নের ক্ষেত্রে, আমাদের কৌতূহল বেশি থাকা সঙ্গত। কারণ এই সংকলক-সম্পাদক আধুনিক যুগের কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের দুটি যুগবিভাগ সম্ভাবিত হয়েছে। এই কবিকুলের বহুজনই তখন জীবিত। অনেকে রবীন্দ্র-প্রভাবিত, কেউ বা নতুন কাব্যরীতি এবং কাব্যভাবনার স্রষ্টা। এসব কারণে পরিসরের কথা মনে রেখেও সূচীপত্র থেকে আধুনিককালের কবিদের তালিকা ও গ্রন্থে ধৃত কবিতার সংখ্যা উল্লেখ করি :—

মধুসূদন দত্ত—২, বিহারীলাল চক্রবর্তী—১, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১, নবীনচন্দ্র সেন—১, শিবনাথ শাস্ত্রী—১, দ্বিজেন্দ্র

নাথ ঠাকুর—১, গোবিন্দচন্দ্র দাশ—১, দেবেন্দ্রনাথ সেন—১, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—১, অক্ষয়কুমার বড়াল—১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৭, স্বামী বিবেকানন্দ—১, দিজেন্দ্রলাল রায়—২, কামিনী রায়—২, ইন্দিরা দেবী—১, প্রিয়ম্বদা দেবী—২, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—২, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী—১, যতীন্দ্র মোহন বাগ্‌চী—৩, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—২, প্রমথ চৌধুরী—২, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র—২, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী—১, সতীশচন্দ্র রায়—২, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—৪, কালিদাস রায়—২, নিরুপমা দেবী—১, হেমেন্দ্রকুমার রায়—১, গিরিজাকুমার বসু—১, কুমুদরঞ্জন মল্লিক—১, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—২, সুধাকান্ত রায় চৌধুরী—১, কাজী নজরুল ইস্‌লাম—৩, সুকুমার রায়চৌধুরী—৩, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়—১, রাধাচরণ চক্রবর্তী—১, মোহিতলাল মজুমদার—৩, সজনীকান্ত দাস—২, বনফুল—১, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র—১, কৃষ্ণধন দে—১, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—১, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—২, নরেন্দ্র দেব—১, প্রমথনাথ বিশী—২, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—১, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী—২, গোলাম মোস্তফা—২, রাধারাণী দেবী—২, অপরাজিতা দেবী—১, উমা দেবী—৪, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—২, প্রেমেন্দ্র মিত্র—৩, বুদ্ধদেব বসু—২, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—১, জীবনানন্দ দাস—১, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—২, অন্নদাশঙ্কর রায়—১, অজিত দত্ত—১, হুমায়ুন কবীর—১, দিলীপকুমার রায়—২, নিশিকান্ত রায়-চৌধুরী—২, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—৪, হেমচন্দ্র বাগ্‌চী—১, ক্ষিতীশ রায়—১ বন্দে আলি মিঞা—১, সুধীরচন্দ্র কর—২, এবং জসিম উদ্দীন, রামেন্দু দত্ত, কাজী কাদের নওয়াজ, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, হাসিরাশি দেবী, ছায়া দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, দিলীপকুমার গাঙ্গুলি, মনীশ ঘটক, মোতাহার হোসেন এবং, সুকোমল বসু, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আবদুল কাদির, সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত, অজয় ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, বিরাম মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, বাসব ঠাকুর, দিনেশ দাস, মহীউদ্দীন —এঁদের প্রত্যেকের একটি ক'রে কবিতা।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতাই সর্বাধিক সংখ্যায় গ্রহণ করেছেন। আমার ধারণা এ ধরনের সংকলনের সংকলক যদি রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্যব্যক্তি হতেন, তিনি এর চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা সংকলন করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কুণ্ঠা ছিল, সমালোচকের

নির্মমতার আশঙ্কা ছিল। সেজন্য কবি ভূমিকাংশে এ-বিষয়ে লিখেছেন যে 'নিজের কবিতার পরিমাণ বেশি' হয়েছে বলে তিনি স্বভাবতই সঙ্কুচিত। বিনয় সহকারে বলেছেন, এই সংখ্যাবৃদ্ধি কবিতার গুণগত কারণে নয়, পরিমাণগত আনুপাতিকে-'মাথা গুণ্‌তিতে আমার রচনা···আপনিই ভোটের অধিকার বেড়ে' গেছে।

এর পর সর্বোচ্চসংখ্যা মধুসূদন দত্তের—তাঁর ছ'টি কবিতা ('বীরাঙ্গনা কাব্যের' দুটি পত্রকাব্য, বসন্ত, কুসুম, বঙ্গভাষা এবং কপোতাক্ষ) গৃহীত হয়েছে। মধুসূদন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব নিয়ে বিবিধ বক্তব্য বিভিন্ন-কালে নিবেদিত হয়েছে। কিন্তু তথ্য হিসাবে কাউকে এই কাব্যসঞ্চয়নের কথা উল্লেখ করতে দেখিনি। জীবনের উপান্তে এসে মধুসূদন সম্পর্কে কবির মনোভাব ভূমিকাংশ থেকে পুনরায় শ্রবণ করি—

> সকলের চেয়ে দুঃসাহসিকতা দেখালেন আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রথম দ্বারমোচনকারী মাইকেল মধুসূদন। তিনি যে মিল্‌টনি বন্যায় দুরূহ শব্দতরঙ্গে বাংলা ভাষা তরঙ্গিত করে তুললেন তার মতো অপরিচিত অনভ্যস্ত আবির্ভাব বাঙালি পাঠকের কাছে আর কিছুই ছিল না। এ যদি সত্যই সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব হোত, তাহলে এ জিনিসটাকে বাঙালি সর্বান্তঃকরণে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিত। কিন্তু নতুন শিক্ষার জোরে ইংরেজি সাহিত্যরসে বাঙালির তখন মৌতাৎ জমে গেছে। তখন-কার ইংরেজি বিদ্যায় পরিপক্ক বাঙালির কাছে মিলটন শেক্‌সপিয়রের আদর আজকের দিনের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তাই বাংলা ভাষার যন্ত্রে মিল্‌টনীয় মীড় মূর্চ্ছনায় মুগ্ধ হয়ে তারা বাহবা দিয়ে উঠল। মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভায় বাংলা ভাষার কাব্যরঙ্গভূমিতে প্রথম প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন ঘটা সম্ভব হোলো।

সংকলিত কবিতার সংখ্যা ও কবিদের নিয়ে সমালোচকগণ বিবিধ তথ্য পরিবেষণে উন্মুখ হতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সংখ্যা চার, জীবনানন্দের চেয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সংখ্যা বেড়েছে, সতীশচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুধীরচন্দ্র কর প্রভৃতির কবিতাচয়নে কি কবির পক্ষপাতিত্ব কার্যকর ছিল না? কিন্তু অপক্ষপাতও তো লক্ষণীয়—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাসের কবিতাও তো গৃহীত হয়েছে!

সবচেয়ে মনোহর আমার মনে হয়েছে, তখনকার দিনের তরুণ এবং সদ্যোখ্যাত কবিদের কবিতা চয়ন। তালিকার শেষের দিকের নামগুলি দেখলেই তা ধরা পড়ে। এ থেকে সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং কাব্য প্রতিভার সহজ স্বীকৃতিদানের সামর্থ্য আমাদের কাছে নতুন ভাবে ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের সংকলন সবাইকে খুশী করতে পারে না, তবে কেউ কেউ অন্ততঃ খুশী হয়। সকলকে খুশী করতে গিয়ে কাউকে পরিতুষ্ট না করতে পারার পিছল পথে কবি পা বাড়াননি। পূর্বোক্ত 'নিবেদন' অংশ থেকেও একথা জানা গেছে।

কবি নিজেই ঘোষণা করেছেন—'এই সংকলন গ্রন্থে আধুনিক বাংলায় গদ্যকাব্য থেকে সংগ্রহ করা হয়নি। সে কাব্যের ভাণ্ডার অতি সংকীর্ণ, তার থেকে বাছাই করে নেওয়া সহজ নয়।' কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব (আর তা হবেই বা কেন, কবি নিজেই শেষ বয়সে এই রীতির চর্চা করে গেছেন) এর পশ্চাতে সক্রিয় ছিল না। 'পাক ধরেনি' এ-গুলিতে, তাই গ্রহণ করতে পারেন নি।

'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলনগ্রন্থের অনিবার্য কিছু ত্রুটি নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছিল ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র প্রথম গ্রন্থ হিসাবে। এই সংকলন থেকে বাংলা কাব্যধারার গতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনুসৃত যদি না হয়েও থাকে, সেজন্যে আধুনিক পাঠকের ক্ষোভের কারণ নেই। কিন্তু যে কারণে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের অধমর্ণতা স্বীকার করতে হবে তা হল সম্পাদক-কর্তৃক রচিত ও গ্রন্থ সূচনায় মুদ্রিত এর মহামূল্যবান ভূমিকাটি—যার কিছু অংশ আমরা যত্রতত্র উদ্ধার করেছি। এবারে অবশিষ্ট অংশের আলোচনা কবির সেই সুদুর্লভ বক্তব্য অনুসরণ করে নিবেদন করি। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এর মূল্য চিরস্বীকৃত।

কাব্য সংকলকের কঠিন দায়িত্বের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন —'যিনি সাহিত্যের বাছাই করার ভার নেন তাঁকে অগত্যা ধরে নিতে হয় যে তাঁর রুচি সাধারণ রুচির পরিচায়ক, কিন্তু আর একদিকে তাঁর রুচির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যও সম্পূর্ণ আত্মগোপন করতে পারে না। এই বিশেষত্বের পথে পরিচিত সাহিত্যকে কিছু নূতন করে দেখার অবকাশ ঘটে।' সমালোচকদের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন 'এর ত্রুটি লক্ষ্য করার অধিকার' তাঁদের নেই, কারণ তাঁরা সব কিছুকেই ইংরেজি আদর্শের

মানদণ্ডে বিচারে উন্মুখ। কবি এই সংকলন-কার্য সম্পাদন কালে বহু ইংরেজি কাব্যসঙ্কলন পড়েছেন। কিন্তু 'তুলনায় খুব বেশি সংকোচ বোধ' করেন নি। বাংলা ভাষার দৈন্য অবশ্যই আছে—'কিন্তু দেখতে পাই কাব্য ও শিল্প রচনায় বাঙালির কল্পনাবৃত্তির স্বাভাবিক আকর্ষণ ও লীলানৈপুণ্য আছে। ...একথা বলতেই হবে, রস-রূপ সৃষ্টি করতে মানুষের যে কল্পনাবৃত্তি আনন্দ পায় বাঙালির তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই সংকলনে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।' ইংরেজি Selections-এ অনেক 'মাঝারি শ্রেণীর বিস্তর মাল বোঝাই' দেখতে পাওয়া যায়, তবুও সমালোচকেরা বাংলা কাব্যসঙ্কলন দেখলেই যে 'অসহিষ্ণু' হয়ে ওঠেন, কবি তাকে 'প্রণিধানযোগ্য' মনে করেন না।

'এই সংকলন গ্রন্থকে আমি বাংলা কাব্য পরিচয় নাম দিয়েছি। মাইকেল মধুসূদন লিখেছেন 'বিরচিব মধুচক্র'। প্রত্যেক জাতির কাব্য-সাহিত্য তার মধুচক্র। এই মৌচাকের সঞ্চয়ের মধ্যে থাকে তার একটি বিশেষ পরিচয়।' কবির মতে এই মধু পদ্মফুলেও সঞ্চিত থাকতে পারে, সঞ্চিত হতে পারে 'পথ পার্শ্বে ভাঁটি ফুলে'-ও।

আদিরসের কবিতা কবি একেবারে বাদ দিয়েছেন। কাব্য তাতে অসম্পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু লাভটা হ'ল, 'এই বই অসংকোচে ও নির্বিচারে সর্বজনের হাতে দেওয়া যেতে পারবে'।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিমুখীগতিসম্পন্ন, প্রাচীনে ও আধুনিকে। 'এর দুইধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নাই।' কবির মতে, তা বলে এটা 'ন্যাশন্যাল নয়' এমন বলা চলবে না। কারণ 'আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে নিচ্ছে।' বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শও এককালে 'ইংরেজি সাহিত্যের অনুসারী' ছিল। কিন্তু দেখা গেল, 'প্রবীন নিষ্ঠাবতী গৃহিনীরাও পুত্রবধূদের' এই বই পড়ার অনুরোধ জানালেন—দেশের চিত্তের সঙ্গে এমনই এর সংযোগ ঘটে গিয়েছিল।

এর পর রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন সম্পর্কে প্রাগুক্ত মন্তব্য ক'রে পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'প্রবর্তনা' বাংলা সাহিত্যে কি দ্রুতগতি সৃষ্টি করেছিল তার আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন, এমন অহিংস বিপ্লব ভারতের অন্য কোন প্রদেশের সাহিত্যে সম্ভব হয়নি। 'এই জাগরণের যুগে বাঙালি চিত্তের সৃষ্টি-

ক্ষেত্রে যে সকল রসরূপের উদ্ভাবন হয়েছে, কবি বলেছেন 'এই সংকলন গ্রন্থে তার আকার ও প্রকারের পরিচয় পাওয়া যাবে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে, দেখা যাবে তার সৃষ্টি প্রয়াসের আবেগ।'

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ এই 'আবেগের' সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ॥

রুচিরা প্রকাশনের বই

প্রত্যেকটিই রসে স্বাদে উৎকর্ষে অসাধারণ

চিত্রভানু'র দু'খানি কাব্যনাটক—

যযাতি—৫৲

দশরথ—৫৲

সুরজিৎ দাশগুপ্তের অসামান্য ইতিহাস-সমীক্ষা—

ইসলাম ও ভারত—১০৲

অমিয়ময় বিশ্বাসের অম্লমধুর প্রবন্ধ সঙ্কলন—

পঞ্চগব্য—৫৲

সাধনকুমার ঘোষের অনবদ্য ভ্রমণ সাহিত্য—

পথে-বিপথে (প্রকাশ আসন্ন—১০৲)

বিভূতিভূষণের "নোটবুক"

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীযুক্তা রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।]

একটি এক্সারসাইজ খাতার কয়েকটি পৃষ্ঠা বিভূতিভূষণ একসময় (ইং ১৯৩২ সনে) তাঁর সাহিত্যিক "নোটবুক" হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। সেই মলিন কীটদষ্ট অতিজীর্ণ নোটবুকটি সম্প্রতি কিছু পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে। এতে আছে বিভূতিভূষণের স্বহস্তলিখিত কিছু jottings বা সংক্ষিপ্ত লিখন—যে-সব গল্পের প্লট তাঁর মাথায় মাঝে মাঝে উঁকি দিত তাদের কিছু কিছু তিনি সূত্রাকারে এখানে নিবদ্ধ করেছেন, পরে ঐ বীজ থেকে কল্পনার উত্তাপে সুপরিণত গল্প সৃষ্টি করতে পারবেন, এই প্রত্যাশায়। কাজেই এ-নোটবইকে তাঁর গল্পসৃষ্টির সূতিকাগৃহ বলা চলে। লক্ষণীয় যে, গল্প লেখায় বিভূতিভূষণ যে-ধারা অনুসরণ করতেন, রসসৃষ্টির জন্য যে বিশেষ শিল্পরীতি তিনি ব্যবহার করতেন, যে-রসদৃষ্টি তাঁর সব রচনাকে বৈশিষ্ট্যে এমন উজ্জ্বল করেছে, তারও আভাষ এখানে পাওয়া যাবে—যদিও প্রায় গূঢ় সাঙ্কেতিক দু-একটি শব্দে বা শব্দগুচ্ছে।

তবে অতিপ্রাচীনতার জন্য লেখা মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে অতিদ্রুত লিখনের জন্য দুষ্পাঠ্যও। তবু এই সামান্য ক'টি পৃষ্ঠায় বিভূতিভূষণের সৃষ্টি রহস্যের যে-আভাষটুকু পাওয়া যায়, তাঁর অনুরাগী পাঠক পাঠিকা ও অনুসন্ধানী গবেষকদের কাছে তার মূল্য ও তাৎপর্য্য অসীম। তাঁর কিছু কিছু সুপরিচিত গল্প উপন্যাসের বীজ ও সঙ্কেত এখানে দেখতে পাওয়া যাবে; কিছু কিছু চেনা চরিত্রেরও আভাষ;—যেমন,"দৃষ্টি প্রদীপ" ও "অনুবর্ত্তন" এর কিছু উপকরণ।

আমরা এখানে নোটবইটির প্রথম তিনটি পৃষ্ঠার বিবরণ দিচ্ছি। যে সব স্থলে সম্পূর্ণ বা আংশিক পাঠোদ্ধারও সম্ভব হয়নি সেগুলি আমরা চতুর্থ বন্ধনী-ভুক্ত করে' (square brackets-এর মধ্যে) দেখিয়েছি। বন্ধনী অন্তর্গত জিজ্ঞাসা চিহ্নদ্বারাও দুর্ব্বোধ্যতা বোঝানো হয়েছে। দুর্ব্বোধ্য অংশের

আমাদের অনুমাননির্ভর পাঠও কোথাও কোথাও দেওয়া হয়েছে—ঐ চতুর্থ-বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত করে'।

আর একটি কথা। নোটবই-এর সব লেখাই পাইকা টাইপে দেওয়া হলো। কিন্তু আমাদের বক্তব্য বা বর্ণনা মুদ্রিত হলো স্মল-পাইকা টাইপে। এতে বোঝবার সুবিধা হবে।

প্রত্যেক পৃষ্ঠার সুরুতে বিভূতিভূষণ তারিখ দিয়েছেন। প্রথম দুটি পৃষ্ঠায় স্থানেরও উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় পৃষ্ঠায় স্থানের উল্লেখ না থাকলেও, স্থানটি যে কলকাতা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, কারণ, পৃষ্ঠার মাথায়, তারিখেরও উপরে, ব্রাকেটের মধ্যে, বিভূতিভূষণ লিখেছেন Universityতে রবীন্দ্রনাথের Reception হইতে এই মাত্র ফিরিলাম। যদিও এ নোটবইটি বিভূতিভূষণের দিনলিপি বা ডায়েরী জাতীয় লেখা নয়, তবু রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা সভার মহার্ঘ্য স্মৃতিটি তিনি এই নোটবইয়েরই এক কোণে ধরে' রেখেছেন। এই অপূর্ব্ব আনন্দের অভিজ্ঞতাটি তিনি তৎক্ষণাৎ কোথাও লিপিবদ্ধ না করে' পারেন নি। কিন্তু যা আরও তাৎপর্য্যপূর্ণ তা এই যে, ঐ সভা থেকে ফিরে এসেই বিভূতিভূষণ তাঁর পরিকল্পিত গল্প কাহিনীগুলির মধ্যে প্রবেশ করেছেন তাঁর রূপসৃষ্টির কামারশালায়—কল্পনার হাতুড়ি নেহাই নিয়ে,—আবার তক্ষুণি অভিনিবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। তিনি যেন তাঁর সৃষ্টির কারখানা ঘরটি সর্ব্বদা সঙ্গে নিয়েই ফিরতেন মনে হয়। বিভূতিভূষণকে এদিক দিয়েও আমাদের বুঝতে হবে।

এবার 'নোটবই'টির অনুপুঙ্খ বিবরণ দিচ্ছি।—এটি একটি রুলটানা একসারসাইজবুক, মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪। বেশীর ভাগ পাতাতেই কোনো লেখা নেই। কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠা তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

খাতাটির কভারে একসারসাইজ বইটির 'টাইপ' ও প্রস্তুতকারকের নাম ঠিকানা মুদ্রিত আছে—যেমন সচরাচর থাকে। উপরের দিকে আছে :—

THE BENGAL 64

EXERCISE BOOK

এর নীচেই পাশাপাশি দু'টি ছবি মুদ্রিত—প্রথমটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের, দ্বিতীয়টি মহাত্মা গান্ধীর। দুটিই আবক্ষ ছবি, ডিম্বাকার, ও পরিধিতে

টিউলিপ-মালিকার অলঙ্করণ। গান্ধীজির ছবিটি পুরানো যুগের স্মৃতি জাগাবে। তাঁর মাথায় পাগড়ী এবং গায়ে কুর্ত্তা ও বামকাঁধে দু-ভাজ করা চাদর। বর্ত্তমানে গান্ধীজির এ ধরনের ছবি প্রায় দুর্লভ।

এই ছবি দুটির নীচে (স্কুল একসারসাইজবুকের রীতি অনুসারে) মুদ্রিত—

Name
School **Class** **Roll**
College
Subject

এবং এর নীচে প্রস্তুতকারকের নাম ও ঠিকানা—

KEDAR NATH MULLICK & SONS
97, Old China Bazar Street,
CALCUTTA.

কভারে বিভূতিভূষণ তাঁর নিজের নাম বা খাতায় লেখা বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ করেন নি। তবে একটি খুব কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার আছে। Name—এই স্থলে তিনি ইংরেজিতে লিখেছেন Notes for 'Son of a ballad-singer'। এ ছাড়া কভারের উপরে আর কোনো লেখাই নেই। ঐ Son of a ballad-singer দ্বারা কৌশলে বিভূতিভূষণ নিজেকেই ইঙ্গিত করেছেন মনে হয়। বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দ সুগায়ক ভাগবত পাঠক ছিলেন,—তাঁরই পুত্রের অর্থাৎ বিভূতিভূষণের এই নোটবই এটাই হয়তো আভাষিত। এবং 'Notes' দ্বারা তাঁর কিছু casual, বিক্ষিপ্ত ভাবনাচিন্তার সংক্ষিপ্ত লেখন বোঝাতে চেয়েছেন। এইভাবে নিজেকে ও বিষয়কে স্পষ্টীকৃত না করে'ও যেন রহস্যচ্ছলে ইঙ্গিত দিয়েছেন বিভূতিভূষণ।

এরপর প্রথম তিন পৃষ্ঠার বিবরণ দিই।—

প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে বেশ বড় বড় অক্ষরে ইংরাজীতে লিখেছেন বিভূতিভূষণ,

"Out of Chaos the Cosmos was made."

এর নীচে বাঁদিকের কলামে লেখা : 18. 5. 32, বারাকপুর, বকুলতলা, আর ডান দিকে কলামের শিরোভাগে লেখা : Note :—

এরপর একটু ফাঁক দিয়ে বাঁদিকের কলামে লিখেছেন,—

Atmosphere—Show the poverty

মা ভাই বোন্ অনেকগুলি। বাপের সঙ্গে ছেলে যায় গোয়াড়ী। কোর্ট। দোল ও ভাই বোনের আনন্দ। a boy who learns ছড়া ও কাব্য। ছোট ছোট মেয়েরা বই পড়ে।

সামান্য একটু কাল্‌চারেও আনন্দ পায়-

প্রফুল্ল বালা। গাড়ীতে টিকিট না কল্লে বসিয়ে রেখে ছায়।···

কালিপদ Queer. পাগলা জামাই···পুটীদিদি পড়ে ও লেখে···নাম খুব সুন্দরী···

হুঁকোর দোকানে লুচি খায় যাত্রাদলের সঙ্গে যাত্রা শুনতে [?] গিয়ে।

বাড়ীতে কাকা আসে। রংপুর ও ম্যালেরিয়া। Slow fever ও গরু বেচা চালানের পালে।

দিদির বিবাহে বাবা টাকা ন্যায়।

অপমান। গোবরা পাড়ায় বাবা যায় ও অপমান হয়ে আসে।

[এর পরের লাইন কাটা ও পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য।]

ভাই বৌ। কাকীমা।

[কাটাকুটি] বোনের বিবাহ। মামার বাড়ী যায় বাপের সন্ধানে। Calcutta. কুসুম ও বাবু।

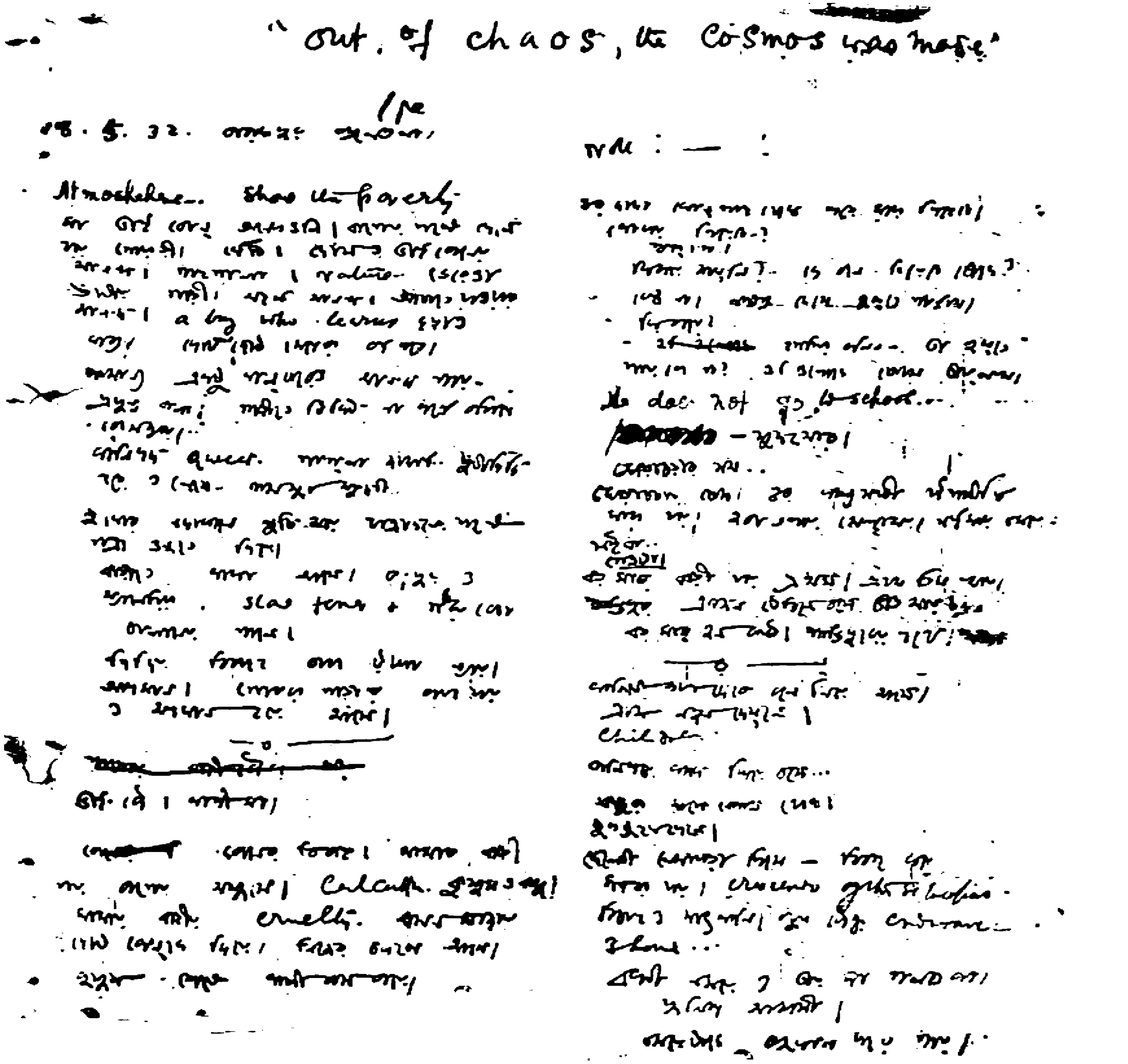

"Out of chaos, the Cosmos"

বিভূতিভূষণের নোট বইএর প্রথম পৃষ্ঠার আলোক চিত্র। যদিও ডিমাই-সাইজের পৃষ্ঠায় ধরানোর জন্য লেখাগুলি এখানে যথায়তন থেকে ক্ষুদ্রতর করে দেখানো হয়েছে তবু তা সাদা চোখেও পড়া যাবে। ম্যাগ্‌নিফাইং লেন্সের সাহায্য নিলে তো কথাই নাই।

মামার বাড়ীর cruelty, বাসন মাজায়
ছোট বোন্‌কে দিয়ে। নিজের দেশে আসে।
কুসুম—শেষে কাশীবাস করে।
এরপর ডান দিকের কলামে—
ওর দাদা কোন্ গাছ থেকে পড়ে মারা গিয়েচে।
কোথায় গিয়েচে?
স্বগ্‌গে।
কি করে জান্‌লি? ··কে বলে দিয়েচে তোকে?
—কেউ না। নক্ষত্র দেখে বুঝতে পাল্লাম।
—কি করে?
—[কাটাকুটি] হাসিয়া বলিল—তা বুঝতে
পারবো না? ওইগুলোকে চোখে ভাবলাম।
He does not go to school···
[কাটাকুটি]—সুদখোর।
ঘোড়া চড়ার সখ···
ঘোড়া চড়ার সখ। ওর বাল্যসঙ্গী ঈশানীদি
মারা যায়। জবা তলায় খেলা ঘর। সইমার মেয়ে···
সইমা···
কেওটা।
বড়মার বাড়ী যায় প্রথম। প্রথম ডিম খায়।
[শান্তিপুরে লিখে কেটে দিয়েছেন] একজন টেবিলে বসে
ভাত খায়।
বড়মার জলকষ্ট। শান্তিপুরের পথে।
কাকিমা কথা দেবে বলে নিয়ে আসে।
গ্রাম নতুন দেখ্‌লে।
Children.
বালি [?] পায়ে কাছে গিয়ে বসে···

বন্ধুরা আসে নেপাল থেকে।
বুক ঠুকে ফেলে। [? চুলবুলে ছেলে]
ছেলেটি লেখাপড়া শিখে—বিবাহ করে।
মারা যায়। Crescndo of the [ইংরাজী শব্দ পড়া দুষ্কর]
বিবাহ ও মাৎলামি। বন্ধুর বৌ এর endurance
ও Love···
একটি মেয়ে ও তার মা পলাতকা।
পুলিশ আসামী।
মেয়েটাকে বহুকাল পরে পায়।

এইবার নোট বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বিবরণ দিচ্ছি।—

প্রথমে পৃষ্ঠার মাথায় বাম ভাগে ছোট অক্ষরে লেখা :

Stories : 19.5.32, বারাকপুর

এরপর পাতার উপরে তিন সারিতে বারোটি গল্পের theme বা বিষয় সূত্রের মতো লেখা। প্রথম দুই সারিতে গল্পের সংখ্যা আট। তৃতীয় সারির শীর্ষে লেখা : Short এবং পরে চারটি গল্পের বিষয় ১, ২, ৩, ৪, ক'রে পর পর লেখা। এরপর পাঁচের সংখ্যাটি ৫। লেখা থাকলেও কোনো গল্পের বিষয় লিখিত নেই। জায়গাটা খালি। তৃতীয় সারির গল্পগুলি 'Short' এই আখ্যায় ভূষিত হওয়ায় মনে হয়, এগুলি একটু বিশেষ ছোট বহরের গল্প হিসেবে কল্পিত হয়েছিল। এবং প্রথম দুসারির ৮টি গল্প সম্ভবতঃ একটু বড় মাপের করা অভিপ্রেত ছিল।

প্রথম সারিতে গল্প ৬টি। যথাক্রমে—

১। স্ত্রীর সহিত কথোপকথন
২। দুর্জয় খোঁড়া বৃদ্ধ ও শিক্ষিতা তরুণী
৩। খুঁটী দেবতা

[৩ নম্বরের পাশে দুটো তেড়ছা লাইন। এবং খুটী দেবতা কথাটি হাল্কা কালিতে কাটা।]

৪। নিদাঘ-নিশীথের রহস্য

৫। পরীর [কাটাকুটি] ইতিহাস

৬। সদ্যপ্রসূত ও পরিত্যক্ত শিশু

দ্বিতীয় সারিতে ২টি গল্প। যথাক্রমে এই ভাবে লেখা—

৭। দেশে সময় কাটে না,
উৎসাহে এসে
[সমস্তদিন [?]···
ঘাড়ে গরু···পিসিমা
বলেন—এক এঁটেড়ে
হয়ে গিয়েচিস্···

৮। স্বামী স্ত্রী সংক্রান্ত

তৃতীয় সারির 'short' গল্প চারটির বিষয় যথাক্রমে—

১। মহাকাল—

২। ষ্টোভে পুড়ে মরে মেয়ে

৩। যে সব সময় বৃদ্ধ ছিল, ১৩ বছর বয়স থেকে···

৪। পথে দেখা হোত যাদবপুরের ধর্মশিক্ষায় বৃদ্ধ

এই তিন সারিতে লিপিবদ্ধ গল্পের 'ধাম' পাতার এক ষষ্ঠাংশ পরিমাণ জায়গা (১¾″×পাতার প্রস্থ) নিয়েছে।

এর পরেই আগের পৃষ্ঠার মতো গল্পের বা উপন্যাসের প্লটের outline—সংক্ষিপ্ত হলেও কিছুটা সাবয়ব। পুরো পৃষ্ঠায় লেখা নেই, শুধু বাঁদিকের অর্দ্ধাংশে লিখেছেন। এই ভাবে—

কাকীমা বহুকাল পরে ফিরে আসে। কাঁদে
বলে সর্বেশ্বরী হয়ে থাকো।
ওর স্কুলের মাষ্টার।
লোকজনের মূঢ়তা। রাধাবল্লভকে পাগল [?]।
নেপোলিয়ন বোনাপার্টের গল্প করে। মেয়েকে
পড়াবে।

মেয়ে চরিত্র—দিদি—।

দেশের লোকের sympathy. পরস্পর
Neighbourly feeling

The Son has no sons. Loves other's
Sons. দেবব্রত···কষ্ট।···
The School is out···
What is the crescendo ?

উক্তপরোপকারীনী [?] theme···বৃষ্টি এল বড়
[কালি চেবড়ানো] সব ছেলে মেয়ে সারা···

ডাক্তারের বাড়ীতে বাবা এলেন।
জীর্ণ, ধুলা পায় কেউ recognize
করে না।

রজনীবাবুর বাড়ীর জানালোক [?]।
গাছে চড়িয়া বনগাছের [? বনগায়ের]বর্ণনা।···
এরপর সমাপ্তিসূচক চিহ্ন—০—। তারপর—

Strolling player's boy.
Son. Childhood. প্রতিবেশী। Stepmother
sons & daughters···তিনজন নিরুদ্দেশ One dead in
the childhood···
এক ভগিনী বাহির। এক ভগিনীর বাড়ী ভাল।
সেজ ভগিনী নিরুদ্দেশ সে তার ভাইকে
সাহায্য করে। মিস্ত্রী। মামার বাড়ী।
একটি মেয়ে দিদি—বুদ্ধিমতী। সেবাপরায়ণা।
অত্যাচার। বন্ধুর স্ত্রী। মাতাল। নিজের
স্ত্রীলাভ। মার মৃত্যুসমএ [?] বাড়ী আসিয়াছে। [কিছু শব্দ

চেবড়ানো ও অস্পষ্ট] বড় ভাই ছোট ভাই এর খরচ। ছোট
[আবার কালি-চেবড়ানো পড়া যায় না] ভাত চেঁটে খায়।
ছেলেদের [আবার কালি চেবড়ানো] ছেলেরা সব বিদেশে।

এর পর কয়েক পৃষ্ঠায় কিছু লেখেন নি বিভূতিভূষণ। আট পাতা বাদ দিয়ে আবার সুরু করেছেন।

এই তৃতীয় পৃষ্ঠার মাথায় বাঁদিকে লেখা—

(Universityতে
রবীন্দ্রনাথের reception হইতে এইমাত্র ফিরিলাম।)

6. 8. 32. Evening

এর পরে একটু জায়গা বাদ দিয়ে—কুলটানা লাইনের সুরু থেকে, পর পর কতকগুলি গল্পের outline লেখা, গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে, দুই সারিতে। তবে তিনটে গল্পের প্লট লিখেও কেটে দিয়েছেন। এবং একটি কাটা গল্পের নীচে আবার লিখেছেন: VI (in tact and not crossed)—কিন্তু এটাও আবার আগাগোড়া লাইন টেনে কেটে দিয়েছেন। তবে কাটাকুটি থাকলেও কাটা লেখাগুলিও এ পাতায় মোটামুটি পড়া যায়। যেভাবে লেখাগুলি আছে বিবরণ দিচ্ছি—

Stroling players boy.—

{ Family
মা—বাবা
ছেলে—২
[তিন লিখে কাটা] বোন্—১

Begin—[কাটাকুটি]
(1) ওদের সংসার—দারিদ্র্য—কাকা
আসে—কাকার নিঃসন্তান জীবন নিয়ে যেতে চায়—
বাবার সঙ্গে যায় পরে—পথের সব কষ্ট—
Returns with malaria—গরুবেচা—
is introduced to ষষ্ঠীকাকার ধর্মজীবন ও
সংসার—Young father sees visions—

but despised and called mad—
Very poor—sisters & brothers ··

(II) Takes step-mother · and all that followed

এই (I) ও (II) অংশের সবটা লেখাই কিন্তু কোনাকুনি দুটি রেখায় কেটে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ।

এর পরে আবার নতুন করে সুরু করেছেন,—

(I) Keeping all things in (l) —the son died···but the other son lived [the elder one lived & saw vision···লিখে কেটে দিয়েছেন]
(II) and taken to step mother···
the sorrows of hers and the rest···

(III) Poverty—sister's marriage—
গোবরাপাড়া incident—গ্রামে হৈ হৈ—তারা এসে ভদ্রলোক-দের ডাকে।—বিবাহ অন্যত্র—যতীশ কাকার অপমান—সতরঞ্চি চাইতে যাওয়া।—
(IV) Eye to Beauty—নাপিতের বাড়ী—
অন্য অন্য মেয়ে পড়ে প্রফুল্লবালা—
ছোটমেয়েটি পড়ে—সবাই বলে
ছেনাল।···পড়ে বলে মা গালি পাড়ে। ছোট ভাই ভালবাসে। love with
village school master [এখানে চেবড়ানো ও অস্পষ্ট]
leaves home···[? marries] [খুব অস্পষ্ট]
letter to yonger brother [আবার চেবড়ানো]

এর পর ডানদিকের কলমে :

(V) Mother is cross with husband.
Wishes her dead. পূজার সময়···

(Vl) They.all live in Cal···
কুসুম etc···—One day the youngest···The father & mother quarrel···
mother [কাটাকুটি] elopes with the sweetmeat vendor···
(Vl) The youngest child

উপরের এই VI নম্বরের দুটি লেখাই আগাগোড়া ইংরাজী M-এর মতো রেখা টেনে কেটে দেওয়া। তবে পড়তে পারা যায়। মনে হয় প্রথম VI-এ বিভূত প্লটচিন্তা তাঁর মনোমত না হওয়ায় তার নীচেই আবার VI নম্বর দিয়ে বিভূতিভূষণ নতুন লাইনে প্লট-টির পরিণতি চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু একটু এগিয়েই তাও তাঁর অপছন্দ হয় এবং দুটি ধারাই নাকচ করে দেন। এর পর আবার VI নম্বর দিয়ে লেখেন—

মামার বাড়ী—বর্দ্ধমানের চাকর—
চাল আনতে যাওয়া—খাওয়ার [দুর্বোধ্য]
দাদামশায় বেটে কাটে [?]—

কিন্তু এটিও এঁকা বেঁকা লাইন টেনে কেটে দেন। আবার VI, নম্বর দিয়ে সুরু করেন—

(Vl) (intact and not crossed!)

তবে এটিও একাধিক সরল রেখা টেনে কেটে দেওয়া। কোন (VI) নম্বর (প্রথমটিই কি ?) এর প্লট-ভাবনা যে পুনরায় ওঁর মনে ধরে, স্পষ্ট নয়। তবে intact and not crossed লিখেও তা আবার কেটেও দেন। ওঁর মন প্লট নিয়ে কতো দীর্ঘ সময় চিন্তা করতো এই লেখা আর কাটা তার সাক্ষ্য দেয়। তবে মজা হলো এর পরই দেখি বিভূবিভূষণ VII নম্বর সুরু করেছেন। এবং সেটি কাটেনও নি। কিন্তু VII এর পরে আবার VI নম্বর দিয়ে লিখেছেন : Cal & as above। এরও পরে তিন লাইন লিখেছিলেন কিন্তু সেটা ঐ VI নম্বরেরই অনুষঙ্গে কিম্বা VIII নম্বরের তা বোঝা যায় না,—লেখাটা এইখানে খুব চেবড়ানো। VII নম্বর ও তার পরে যেমন আছে, দিচ্ছি।

(VII) মামীর বিবাহ উপলক্ষে—
মামার বাড়ী—বর্দ্ধমানের চাকর—চাল আন্‌তে
যাওয়া—খাওয়ার ছেলে—বৈষয়িক ও অর্থ ভাল
বাসে—সবাই বলে জামাই worth-less···জামাই ঝগড়া
করে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ও রোজগারে যায়···the child
thinks of the father···
Comes back sick···is
nursed···

(VI) Cal & as above
[চেবড়ানো] No মামার [আবার চেবড়ানো]
[চেবড়ানো] all come home [চেবড়ানো]
[চেবড়ানো] দুই বোন্—রেঁধে [চেবড়ানো]

[এইখানে নোট বই-এর ৩য় পৃষ্ঠা শেষ]

সুকুমার প্রসঙ্গ

(১৮৮৭-১৯২৩)

হিরণকুমার সান্যাল

সুকুমার রায়, যাঁকে তাতাদা বলেই আমরা বরাবর জেনে এসেছি, তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় কবে হল তা বলা খুবই কঠিন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর পরিবারের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েই ছিল ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের পরিচিত, তাদের মধ্যে চোখের সামনে জলজল করতেন তাতাদা।

প্রথমেই বলি উপেন্দ্রকিশোরের কথা। আমরা যখন শিশু তখনই তাঁর কথা শুনতাম। এগারোই মাঘের সকালের অনুষ্ঠানে, তিনি যতদিন সুস্থ ছিলেন, বেহালা বাজাতেন। হয়তো শাস্ত্রীমশায় বেদীতে বসেছেন, উপেন্দ্র কিশোর বেহালা বাজাচ্ছেন ; আর যেটি বিশেষ করে মনে পড়ে তাঁর একটি

গান 'জাগো পুরবাসী'—ওর আর জুড়ি হল না—সে গানটি এখনও গাওয়া হয় এগারোই মাঘের উৎসবের সূচনায়।

তাতাদা অবশ্য তখন যুবক যখন প্রথম আমার চোখে পড়লেন, উনি আর ওঁর ছোটো ভাই সুবিনয় রায়, যাঁর ডাক নাম ছিল মনি। তারপর ইস্কুলে ভাব হল ওঁদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে—ডাক নাম নান্কু ও পান্কু, একজন নিজের ও আর একটি খুড়তুতো। তাদের কাছে বাড়ির গল্প খুব শুনতাম। বাড়ির গল্প মানে বেশির ভাগই তাতাদার গল্প।

ইতিমধ্যে ১৯১৫ সাল আন্দাজ অন্য একটি সূত্রে সুকুমার রায়ের সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠতা হল। কালিদাস নাগ তখন আমার অন্যতম অভিভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আমাদের একটা সমিতি করবার কথা হচ্ছে, যদিও তুমি খুব ছেলেমানুষ তবু তোমাকে সমিতির সভ্য করা হবে। সোমবার সোমবার সভা হবে। তোমার বাড়ির কাছেই।' যদিও প্রথমে সমিতির কোনো নাম দেওয়া হয়নি কিন্তু সোমবার মিটিং হত বলে নাম দাঁড়িয়ে গেল 'মানডে ক্লাব'। আমি তখন ঝামাপুকুরের গলিতে থাকতাম। কাছেই বেচু চাটুজ্যের স্ট্রীটে সতীশ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের বাড়িতে শান্তিনিকেতন ছেড়ে এসে অজিত চক্রবর্ত্তী মশাই রয়েছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন ঐ সমিতির বোধ হয় দুই প্রবীণতম সদস্য। সতীশ চট্টোপাধ্যায় তখনকার খ্যাতনামা অধ্যাপক। বরিশালের লোক, অশ্বিনীবাবুর কাছে তাঁর দীক্ষা, আবার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম। তাঁর পুত্র হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে নাম করেছেন রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক বলে। অবশ্য তখন সে খুবই ছোটো।

ঐ বাড়িতে পত্তন হল মানডে ক্লাবের। শিশির কুমার দত্ত ওরফে খোদনবাবু হলেন সম্পাদক। চার আনা করে মাসে চাঁদা। গুটি কয়েক লোক নিয়ে আরম্ভ, পরে সদস্যসংখ্যা অনেক বেড়েছিল। সূত্রপাত ওখানে হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তাতাদার গড়পাড়ের বাড়িতে হল অধিবেশন, খোদনদার বাড়িতেও হল, তার পর ঘুরে ঘুরে হতে লাগল এক-এক জন সভ্যের বাড়িতে। এইসূত্রে তাতাদাকে আরো বেশি করে জানলাম। যেমন চেহারা, তেমনি কথাবার্তা। আগেই বলেছি তিনি আমাদের চোখের সামনে জলজল করতেন। তিনি দাঁড়াতেন যেখানে আমরা সব তাঁকে ঘিরে দাঁড়াতাম। ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা প্রবীন সদস্য ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র, নবদ্বীপ

চন্দ্র দাশ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি—এঁদের প্রত্যেকেরই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। এঁরা সমাজের কাজে কর্মে, উৎসবের সময়ে যখন দাঁড়াতেন এসে, তাঁদের ঘিরে ছোটোখাটো ভিড় জমত। তেমনই যুবকদলে ছিলেন সুকুমার রায়। তিনি যেখানেই দাঁড়াতেন যেন চুম্বকের আকর্ষণের মতো লোক টেনে আনতেন। নানা বিষয়ে নানা রকম কথাবার্তা হত। সব সময়ে যে মজার কথা বলতেন তা নয়; কোথাও কোনো অন্যায়ের রেশ দেখলেই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। অন্যায় সহ্য করা তাঁর ধাতে ছিল না।

দেখতে না দেখতে তাতাদা মানডে ক্লাবে জাঁকিয়ে বসলেন। মানডে ক্লাবে শুধু আড্ডা নয়, ক্লাবে আমাদের ঠিক হয়েছিল প্রত্যেকদিন কোনো-না-কোনো বিষয়ে একজন সভ্য হয় পড়বেন কিংবা কিছু বলবেন। সে-সবের তালিকাও ছাপা হয়েছে। তবে সেই সময়ে বা কিছু পরে অজিত চক্রবর্তী মশায়ের রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত যে-সব লেখা পরে বই হয়ে বেরিয়েছে—সে-সব লেখা একটির পর একটি সভায় পড়েছেন।

এই সময়ে 'বিচিত্রা'র অধিবেশন হত রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে। তার আগে সেখানে হত 'বৈঠক' আর মেয়েদের জন্যে ছিল 'আলাপিনী'; রবীন্দ্রনাথ এ-দুটি সমিতি করেছিলেন। পরে 'আলাপিনী' আর 'বৈঠক' মিলে 'বিচিত্রা' হল।

'বিচিত্রা'র সেই অধিবেশনটি হয়েছিল আবার সোমবারে। সেদিন খোদনবাবুর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে ছিল মানডে ক্লাবের সভা। অজিতবাবুর সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম বিচিত্রায়। প্রবন্ধটি পাঠ করেই রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম ক'রে আর কোনো প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে আমরা জোর পায়ে হেঁটে চলে এলাম মানডে ক্লাবে। এসে আমরা ঢুকতেই হৈ হৈ কাণ্ড। সকলেই, বিশেষ করে তাতাদা আর দ্বিজেনকাকা বললেন, 'কোথায় তোমরা গিয়েছিলে? আমাদেরও তো যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই মানডে ক্লাব আগে, না, বিচিত্রা আগে? দেখ তোমরা ঐ জমিদার বাড়িতে গিয়ে যা খেয়েছ—আমরা এই পাশের দোকানের গরম গরম কচুরি আর আলুর দম খেয়েছি, তার থেকে কি বিশেষ ভালো হবে?' শেষে কালিদাস নাগ বললেন 'শাস্তি দিয়ে কাজ নেই—একটা ভোট অব সেন্সর দিয়ে ওদের ছেড়ে দেওয়া হোক।'

বলেছি তাতাদা সব সময়ে জমিয়ে রাখতেন। অনেক লেখাই তিনি

মানডে ক্লাবে পড়েছেন। ওঁর মতামত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর বলবার ভঙ্গিতে একটা নিজস্বতা থাকত। এখনকার দৃষ্টিতে তাকে খুব প্রগতিশীল বলব না, তবে তখনকার পরিবেশে বোঝা যায় খুব লিবারেল আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ।

আর একটা বলবার কথা এই যে, সুকুমার রায় এখন খ্যাতিলাভ করেছেন আশ্চর্য সব ছড়ার রচয়িতা হিসেবে। কিন্তু ওঁর মনটা যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক, কেননা একটা বিজ্ঞান-শিক্ষণের মধ্যে দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন। এবং বিলেতে গিয়ে যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন সেটা আমাদের বুঝিয়েছিলেন। হাফটোন ব্লকের উন্নত কৌশল শেখবার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন, তখন একটা বিশেষ প্রণালী তার নাম বোধ হয় ফোটো ক্রেসিস—সেটা ছিল তাঁরই উদ্ভাবিত।

সেই কারণে সুকুমার রায় যে বিষয়েই লিখুন, শিল্পকলা হোক সাহিত্য হোক—তার মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক মনের দীপ্তি পাওয়া যায়। অথচ সেই-সঙ্গে সাহিত্যরস। একেবারে জাত সাহিত্য যাকে বলে। এই দুটো জিনিসের সংমিশ্রণ দেখেছি তাঁর লেখায়। মানডে ক্লাবে তাঁর যে-সব প্রবন্ধ পড়া হত সেগুলি ছিল সাধু ভাষায় লেখা। তখন পর্যন্ত তারই চল ছিল।

একদিন 'আর্ট' সংক্রান্ত একটি কথা তাতাদা বলেছিলেন, সেটা অনেক-দিন মনে দাগ কেটে রেখেছিল। বলেছিলেন যে, চিত্রকর আঁকছে নিসর্গ দৃশ্য, আমরা মনে করি সে প্রকৃতিকে অনুসরণ করছে। এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন রাস্কিনের কথা। রাস্কিন একদিন কনেস্টবলের ছবি আঁকা দেখছেন পেছনে দাঁড়িয়ে। তিনি আঁকছেন ঘরবাড়ি গাছপালা—কিন্তু এগুলো নিয়ে ওরকম মোচড় দিচ্ছেন কেন? একটা গাছ ওখানে ছিল সে একটু পিছিয়ে গেল, রাস্তাটা সরে গেল আর-একটু ডান থেকে বা বাঁ দিকে। যে লোক দেখবে সে দেখবে তার চেনা জায়গারই ছবি; কিন্তু একটু নজর করলে বুঝবে যে সেই চেনা জায়গাগুলোই ডান দিক থেকে বাঁ দিকে নড়িয়ে দিয়েছেন। সে ভাববে, বাঃ, এ আর্টিস্ট তো বেশ মজা করেছেন! ঘরের আসবাবপত্র সেরকমই থাকল কিন্তু সামান্য ডান দিকে বাঁ দিকে সরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরটাকে একটু অন্য-রকম করে সাজানো। তাই বললেন যে, এই যে মনে করা যাচ্ছে যে, আর্টিস্ট প্রকৃতির হুবহু নকল করছে, ঠিক তারা তা করে না।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যে 'বৈঠক' ছিল সেখানে তাতাদা আর্ট সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলেন। সে প্রবন্ধটা পাওয়া গেছে কিনা জানি না—কিন্তু

সেখানে ওই প্রবন্ধটার উপর কিছু আলোচনাও হয়েছিল।

মানডে ক্লাবে যে-সব প্রবন্ধ তাতাদা পড়েছিলেন তার মধ্যে যেটি আমাদের মাত করে দিয়েছিল সেটি হচ্ছে বীরবলকে ব্যঙ্গ করে লেখা : 'ক্যাবলের পত্র'। এটি পড়া হয়েছিল আমাদের সভ্য জীবনময় রায়ের বাড়িতে। জীবনময় রায় ছিলেন প্রশান্তচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাতাদার থেকে অল্প একটু ছোটো ; ছেলেবুড়ো সকলের সমান প্রিয়। এক সময়ে তাঁর মুখে যে-রবীন্দ্র-সংগীত শুনেছি এখনো তা মনে রয়েছে। তেমন গান আর কারো মুখে শুনিনি। ব্রাহ্মসমাজের পাশেই তাঁর বাড়িতে 'ক্যাবলের পত্র' পড়া হল। বীরবলের ভাষা কী ভাবে তাতাদা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন ভাবলে বিস্ময় হয়।

তা এই প্রবন্ধটিতে ঐ বীরবলের লেখার মধ্যে যে-সব চালাকি থাকত, তার সম্বন্ধে একটা উক্তি শুধু মনে পড়ে। বীরবল খুব ফরাসি সাহিত্য দর্শন পড়েছিলেন, তাঁর লেখায় সে-সবের যথেষ্ট উল্লেখ থাকত। কথায় কথায় বের্গসঁ, আরো দু-চারজনের কথাও থাকত। ঐ ক্যাবলের পত্রে ক্যাবল লিখছেন,—শুনেছি বিখ্যাত দার্শনিক বের্গসঁ বলেছেন যে, মানুষ আর যাতেই বাঁচুক, মাথা কেটে ফেললে আর বাঁচে না। এই ধরনের কথার অনেক ছড়াছড়ি ছিল। এই প্রবন্ধটি প্রবাসীতে বেরিয়েছিল, তারপর লোকে ভুলে গিয়েছিল। পরে আমার কথায় সজনীকান্ত দাস খুঁজে খুঁজে সেটি প্রবাসী থেকে উদ্ধার করে' আবার শনিবারের চিঠিতে ছাপেন। সকলে সেদিন এই প্রবন্ধটি শুনে এমন মাত হয়ে গেলেন যে, আর আলোচনার অবকাশ ছিল না।

প্রবন্ধটি সম্বন্ধে সেদিন কেউ কিছু বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন নি কেন, সে কথা বলতে গিয়ে যেটি বলতে হবে তা খুব প্রীতিকর নয়। প্রীতিকর নয় তবে জানবার মতো। আমাদের দেশে গোষ্ঠীগত যে দ্বন্দ্ব বরাবর রয়েছে তার প্রকাশ এখানেও। রবীন্দ্র গোষ্ঠীর মধ্যে দুটি দল ছিল। একটি সবুজ-পত্র বা প্রমথ চৌধুরীর গোষ্ঠী। মানডে ক্লাব যে-সময়ে শুরু হয় সে-সময়েই সবুজ পত্রেরও সূচনা। সবুজ গোষ্ঠীর সঙ্গে এই মানডে ক্লাবের যাঁরা রবীন্দ্রনিষ্ঠ ছিলেন, অনেকেই ছিলেন যেমন তাতাদা প্রশান্ত মহলানবিশ অজিত চক্রবর্তী কালিদাস নাগ অমল হোম ইত্যাদি—এঁদের কোথায় যেন একটা বিরোধ ছিল। এখানে বলা যায়, প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী ইন্দিরা দেবীর মতো

সত্যিকারের সজ্জন খুব কম দেখেছি। প্রমথ চৌধুরীর লেখায় কারো সম্বন্ধে যদি খোঁচা থাকত সেটা তাঁর অন্তরের কথা নয়; কারো সম্বন্ধে তিনি কখনোই শত্রুতার ভাব পোষণ করতেন না। তাই বিরোধটা কিসের বলতে পারব না। মনে হয় একান্ত ব্যক্তিগত; এঁরা যে পছন্দ করতেন না প্রমথ-চৌধুরীকে তার কারণ বোধ হয় বীরবলের ভঙ্গিদোষ—একটু অতিরিক্ত চোখা চোখা কথা, খুব বলবার কিছু না থাকলেও।

মানডে ক্লাবের মিটিঙের নোটিস্ বেশির ভাগই ছাপা হত তাতাদাদের অর্থাৎ ইউ রায় এণ্ড সান্‌স্-এর বিখ্যাত ছাপাখানায়। এই সুযোগে তাতাদা এই সব নোটিশে তাঁর মন্তব্য জুড়ে দিতেন; বেশির ভাগ সময়ে কবিতায়। যেমন মাঝখানে কাজেকর্মে খোদনবাবু বাইরে গিয়েছিলেন—ফিরে এসেই সভার নোটিস হাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বললেন তোমার এতদিনের চাঁদা, বাকি, আর অমুক দিন অধিবেশন। সেই নিমন্ত্রণপত্রে তাতাদা লিখলেন—

'শুনেছিনু নেই নেই
শুনেছিনু গিয়েছে সে—
দাড়ি নেড়ে চাঁদা চায়
শনিবার তেইশে।'

খোদনবাবুর দাড়ি ছিল।

প্রত্যেকবারই খাওয়াদাওয়া হত। তবে প্রশান্তচন্দ্র একদিন বেঁকে বসলেন, 'খাওয়াদাওয়া হলে আর কোনো আলোচনা হয় না। তোমরা খাওয়াদাওয়া করে এত সময় নষ্ট কর কেন? আমি তোমাদের শুধু চা দেব আর সস্তার বিস্কুট।' তাঁর বাড়িতে সেদিন সভা। তখন খুদে খুদে জেম বিস্কুট পাওয়া যেতো—সেগুলো পোষা কুকুর বেড়ালকেই খেতে দেওয়া হত। সকলে হাঁউমাউ করে উঠল। তখন তাতাদা দেখলেন হাঁউমাউ করে কিছু হবে না, প্রশান্ত শুনবে না। আমাকে ডেকে কানে কানে বললেন, 'যাও তো, ভিতরে গিয়ে প্রশান্তর বোনকে বলো যে, এরকম একদল লোককে প্রশান্ত চা খেতে নেমন্তন্ন করেছে কিন্তু কিছু খাবার জোগাড় করে নি। তুমি শুধু এইটুকু বলে এসো।' মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে অনেক রকম খাবার চলে এল। তাই দেখে প্রশান্তচন্দ্র বললেন, 'একি! এ সব কে আনল?' তাদাদা উত্তর দিলেন, 'তোমার তাকে দরকার কি? খাবার এসেছে, এখন আমরা খাব।'

মাঝে মাঝে হঠাৎ আমাদের গানের প্রবল বেগ আসত। সেদিন

আলোচনা-টনা রেখে শুধু গান হত। আর যে গানটা আমাদের প্রায় জাতীয় সংগীত হয়ে দাঁড়াল, সেটা হচ্ছে 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল'। এই গানের দলে সবচেয়ে ভালো ও জোরালো গলা ছিল ছোটকুদার অর্থাৎ ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্তের। তাই তাতাদা একদিন বললেন, 'দেখ. আমাদের আসলে এটা যাত্রার দল। ও-সব লেখাপড়ার কথা ছেড়ে দাও। এই যাত্রার দলের অধিকারী হলেন খোদন। অতএব, আমরা সকলে মিলে ওঁকে খেতাব দেব শ্রীশিশিরকুমার দত্তাধিকারী।' সেই থেকে এই নামেই পরিচিত হলেন তিনি। মাঝে মাঝে খোদনবাবু গা-ঢাকা দিতেন, আগেই বলেছি; একবার বেশ কিছু দিন পাটনায় কাটিয়ে তিনি ফেরার পর তাতাদার ছড়া তৈরী হল :

'ক্লাবটিরে মারি
হল অধিকারী
মাস তিন চারি
বিহার-বিহারী।
বিরহেতে তারি
ব্যথা পেয়ে ভারি
নিঃশ্বাস ছাড়ি
ভিজাইল দাড়ি
যত বুড়ো ধাড়ি
সভ্যের সারি।
ঘোর বাড়াবাড়ি!'

আমি ছেলেমানুষ ও ছাত্র বলে' আমার বাড়িতে একবারই অধিবেশন হয়েছিল। সেখানে ডালপুরি আর মাছের একটা নতুন তরকারি খেয়ে তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন। তাতাদা বললেন, আমি প্রস্তাব করছি—এর পরদিন ক্লাবের আলোচ্য বিষয় হবে কী করিয়া এইরকম ডালপুরি আর মাছের তরকারি তৈরি করিতে হয়। আমাকে বললেন, তুমি তোমার মার কাছ থেকে একটু লিখে আনবে।

খাওয়াদাওয়ার কথায় মনে পড়ল, মানডে ক্লাবের একটি নিমন্ত্রণপত্রে ছিল 'খাওয়া গুরুতর হইবার আশঙ্কা আছে'—সেটা ওঁদের গড়পাড়ের বাড়িতে অধিবেশনের কথা। ওঁদের বাড়ির রান্নার একটা বিশেষত্ব ছিল, বিশেষ করে

টুলুদি অর্থাৎ তাতাদার স্ত্রীর রান্না। বাঙাল দেশের লোক ছিলেন তিনি। অবশ্য বাঙাল দেশের এঁরাও ছিলেন কিন্তু সেদেশের সঙ্গে এঁদের সম্পর্কে বিশেষ ছিল না। উপেন্দ্রকিশোর যদিও নিজেদের মধ্যে বাঙাল কথা বলতেন তাঁর ভাইরাও বলতেন—কিন্তু তাতাদা বা নানকুদার মুখে আমরা কখনো বাঙাল কথা শুনিনি। তাঁরা মৈমনসিঙের পরিবেশ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিলেন। মানডে ক্লাব থেকে একবার স্টিমার পার্টিতে যাওয়া হয়েছিল রূপনারাণের ধারে, কোলাঘাটে। সেখানে একদিন থাকবারও কথা ছিল। যাওয়ার পথে খাওয়া হল টুলুদির হাতের তৈরী মাংস আর লুচি—অপূর্ব তার স্বাদ। সেখানে একটা খালে আমরা নৌবিহার করতে গেলাম। জ্যোৎস্না-রাত ছিল, আর ছিল—একটির পর একটি গান, অতুলপ্রসাদের নিজের কণ্ঠে—অবশ্য রবীন্দ্রসংগীতও বাদ যায়নি। অতুলপ্রসাদ তাঁর বিখ্যাত 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে' গানটি রচনার গল্প আমাদের সেদিন শুনিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে গিয়েছিলেন তিনি মফঃস্বলে একটি মামলায়। ডাক বাংলায় রাতে ঘুম আসছিল না। তখন এই গানটি তিনি রচনা করেন।

মানডে ক্লাবের অধিবেশনে ধরা পড়ত, সুকুমার রায় আর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মধ্যে একটা আত্মিক যোগসূত্র ; প্রশান্তচন্দ্র অনেকসময় যেন সুকুমার রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। অনেকসময় যখন কোনো কথাবার্তা উঠত, প্রশান্তচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করে বা তিরস্কারছলেই তাতাদা বলতেন 'আরে প্রশান্ত থামো থামো!' অনেক সময়ই প্রশান্তর কথাবার্তা কেউ বুঝে উঠতে পারতেন না, কিন্তু সেটা তাতাদা চট্ করে ধরতে পারতেন। একটা ব্যাপার মনে পড়ে ভারি মজার। একবার চাঁদা বাড়ানোর প্রস্তাব হল ক্লাবের ; প্রশান্তচন্দ্র হঠাৎ বললেন 'আমার এস্‌থেটিক অবজেকশন আছে।' শুনে তো সবাই প্রায় চিৎপটাং—সে আবার কি ? চাঁদা বাড়াতে এসথেটিক অবজেকশন কি হতে পারে ? এবং এই নিয়ে অনেকক্ষণ তর্ক চলল। প্রশান্তচন্দ্র অনেকবার বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সকলেই তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগলেন। তখন তাতাদা বললেন, দেখো, ও কী বলতে চাচ্ছে আমার মনে হয় আমি ধরতে পেরেছি। ওর বোধ হয় বক্তব্য এই যে, এই প্রস্তাবে ওর সেন্স অব প্রপ্রাইটি আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস-এ আঘাত লাগছে। চাঁদা বাড়ানোটা, সোজাসুজি বললেই হয়, বাঞ্ছনীয় নয়—কিন্তু ও তো ওভাবে কথা বলে না। কী প্রশান্ত—তাই না ?' প্রশান্ত বললেন, "হ্যাঁ, খানিকটা

তাই বটে।" প্রশান্তচন্দ্রেরও ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কিন্তু সুকুমার রায়ের মতো ছিল না। তাতাদার আকর্ষণী শক্তি ছিল অনেক বেশি।

মানডে ক্লাব কিছুদিন পরে উঠে গেল। সভা করে ঠিক হয় নি, আপনা থেকেই যেন উঠে গেল। এই সময়ে অন্য একটি ক্ষেত্রে সুকুমার রায়ের ব্যক্তিত্ব যেন আরো বেশি করে প্রকট হয়েছিল ও আমাদের আশ্চর্যভাবে স্পর্শ করেছিল। ওঁকে আরো বেশি করে 'আর বড়ো করে' পেলাম। সেই ক্ষেত্রটি হ'ল ব্রাহ্মসমাজ।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মনে হল ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-সাধন প্রয়োজন, তাকে আরো প্রগতিশীল করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব হল এই যে ব্রাহ্ম-সমাজের সংশ্লিষ্ট ছাত্রসমাজ নামক প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদের জন্য আবেদন পত্রে সই করতে হলে মেনে নিতে হবে কতকগুলি কড়া নিষেধ, যেমন, মদ খাব না সিগারেট না, পাবলিক থিয়েটারে যাব না ইত্যাদি। যুবকের দল এই নেতিবাচক প্রতিজ্ঞাগুলি বর্জন করতে চাইলেন। এই সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য করবার প্রস্তাবও তাঁরা আনলেন। এই নিয়ে শুরু হল তুমুল আন্দোলন। প্রতিবাদ উঠল কৃষ্ণকুমার মিত্র, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং আরও বহু প্রবীণ ব্রাহ্মের তরফ থেকে। প্রশান্তচন্দ্র এই আন্দোলনের ছিলেন ষ্ট্র্যাটেজিস্ট কিন্তু সুকুমার রায় ছিলো এর প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু এই তীব্র বিরোধের মধ্যেও প্রবীণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সমাজমন্দিরে হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে তাতাদার আলোচনার কথা। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলো তো সুকুমার, জীবনের আদর্শ কি? সুকুমার উত্তর দিয়েছিলেন, সিরিয়াস ইন্টারেস্ট ইন লাইফ। উত্তরটা শুনে হেরম্বচন্দ্র এতই খুশ হলেন যে তখুনি সন্দেশ আনিয়ে সকলকে খাওয়ালেন।

মনে রাখতে হবে এই ঘটনার সময়ে ব্রাহ্মসমাজে দুই দলের বিরোধ তীব্রতম আকার ধারণ করেছে। তাতাদাই আমাদের উদ্দীপনা জোগাতেন এবং আমাদের শক্তির কেন্দ্রও ছিলেন। আবার মাঝে মাঝে প্রবীণদের মুখে কোনো অযথা অভিযোগ শুনলে তিনি অধৈর্য হয়ে উঠতেন। একবার তো রেগেমেগে মিটিং থেকে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে গেলেন। প্রশান্তচন্দ্রের অবশ্য মিটিং ত্যাগের ইচ্ছা ছিল না। তাতাদা বেরিয়ে যেতেই তাঁকেও খাতাপত্তর গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই হল। এইসময় যুবসমাজ আলাদা উৎসব করল

সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে। তখন কৃষ্ণকুমার মিত্র এসে প্রায় রোজই বোঝাতেন। তাতাদা তাঁকেই আমন্ত্রণ জানালেন, আমি আচার্য হয়ে উপাসনা করলে আপনারা আসবেন না? কৃষ্ণকুমার বললেন, সুকুমার, তুমি যে আমাদের একজন আচার্য, তুমি বেদীতে বসলে আমরা তোমার কথা শুনবনা তা কি হতে পারে? প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা কৃষ্ণকুমারের এই উত্তর সেদিন উপস্থিত যুবকদের মর্ম স্পর্শ করেছিল। কিন্তু বিরোধ তখন মেটেনি; যুবকদের স্বতন্ত্র উৎসব সাফল্যের সঙ্গে হয়েছিল। প্রবীণতম আচার্য আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাতে উপস্থিত ছিলেন। এর পর সভার পর সভা হল। ব্রাহ্মসমাজে তৃতীয়বার ভাঙন ধরবার আশঙ্কা দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুবকদেরই জয় হল। প্রবীণ দল মেনে নিলেন যুবকদের দাবি।

১৯১৫ সালে আমার প্রথম শান্তিনিকেতন যাত্রা 'ফাল্গুনী' অভিনয় দেখতে। দলে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, অমল হোম, সুকুমার রায় প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সারাক্ষণ থাকতাম না আমরা—যখনই খুব একলা হয়ে পড়তাম তাতাদা আমাদের মাতিয়ে রাখতেন। সেবারে তিনদিন কাটিয়ে ভোরবেলার ট্রেন ধরবার জন্য তাতাদার পরামর্শে আমরা সকলে বিছানাপত্তর ঘাড়ে করে তাঁর নেতৃত্বে দস্তুরমত মার্চ করতে করতে ষ্টেশনে এসেছিলাম মনে পড়ে।

আর একদিকে তাতাদার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আসর-জমানোর। মাঘোৎসবে যেদিন বিশেষ কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকত, তিনি নানা রকম গল্প বলে আমাদের মাৎ ক'রে রাখতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ প্রচারকদের নিয়ে অনেক মজার গল্প করতেন; কিন্তু তাতে কোনো বিদ্বেষ বা নিন্দার স্পর্শ থাকত না; মজার মজার গল্পই তিনি সাধারণভাবে করতেন।

ছোটো বড়ো সকলের সঙ্গে তিনি সহজে যোগাযোগ করে ফেলতে পারতেন। সেজন্য ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা প্রবীণ, যাঁদের সঙ্গে তীব্র বিরোধ ছিল ওঁদের—যখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন তাতাদা তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে শুনেছেন। সুকুমারের প্রতি তাঁদের যে গভীর স্নেহ তা তাঁদের কথায় বার-বার প্রকাশ পেতো। সেটা শুধু উপেন্দ্রকিশোরের ছেলে বলে নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বই ছিল মন যা সকলকে আকর্ষণ করত। এই সুকুমারও যে তাঁদের বিরোধিতা করবে এই ছিল তাঁদের দুঃখ।

সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হবে এই

[শেষাংশ ১৪৫ পৃষ্ঠায়]

পথে বিপথে

সাধন কুমার ঘোষ

॥ আট ॥

কাশ্মীরে আমি আমার শ্রীনগর বাস যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে অধিকাংশতই গুলমার্গে ও পাহালগ্রামে কাটিয়েছিলাম। তখন ট্যানমার্গ থেকে গুলমার্গ যেতে হলে পদব্রজে অথবা পনিতে চড়ে যেতে হতো। ঘোড়াগুলি খুবই নিরীহ, দার্জিলিঙের ম্যালের পনি'র চেয়েও। আর ঘোড়া নিলে সময়ও কম লাগে। তবু আমি ও আমার সঙ্গীরা, এঁদের মধ্যে একজন স্বামীজিও ছিলেন, —পদব্রজেই তিন মাইল চড়াই উঠেছিলাম। গুলমার্গ পৌঁছে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তার তুলনা নেই। ঐ পথের শেষের এক মাইলের নাম 'পপলার এ্যাভনিউ'। দুইধারে সারি সারি পপলার গাছ—ভারী সুন্দর।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে গুলমার্গের গৌরব সিমলার প্রায় সমপর্যায়ের ছিল। গুলমার্গ ক্লাবের রেজিষ্টারে বহু অভিজাত ইংরাজ ও ভারতীয়ের নাম দেখলাম। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূত লুই জনসনও এসেছিলেন দেখলাম। তবে বর্তমানে ক্লাবটির অবস্থা বড়ই করুণ।

স্বাধীনতার পরবর্তীযুগে কাশ্মীর কিছুটা শ্রীহীন হয়েছে। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন গুলমার্গের গল্‌ফ্ লিঙ্কটি পরিত্যক্ত, হোটেলগুলির অবস্থাও ভালো নয়। পাহালগামের অবস্থা অমরনাথ যাত্রীদের কৃপায় তবু কিছুটা ভালো। কিন্তু কোনো হোটেলকেই কাশ্মীরের মর্য্যাদার উপযুক্ত মনে হয় নি,—এমনকি শ্রীনগর ও গুলমার্গের বহুখ্যাত নেডু (Nedou's) ও নয়।

কাশ্মীরে আমরা একটা হাউসবোটে থাকতাম। হাউসবোট নাকি ইংরাজরাই প্রবর্ত্তন করে। এর কারণ নাকি তৎকালীন কাশ্মীর সরকারের আইন যে কোনো বিদেশী কাশ্মীরে জমি কিনতে পারবে না। কাজেই হাউসবোটেই বাস করতেন ইংরেজরা।

গুলমার্গ থেকে চিরতুষারের দেশ খিলানমার্গ যেতে আমরা পনি-র সাহায্য নিয়েছিলাম। একটি সাময়িক কফি ষ্টল ছিল সেখানে। কিন্তু শীত এমন প্রচণ্ড যে ফুটন্ত কফিও মুখে তুলতে না তুলতে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। আর কী কন্‌কনে হাওয়া। রোহতাং ছাড়া এমন কন্‌কনে হওয়া আর কোথাও

পাইনি। নারকাণ্ডার শীত, সৌন্দর্য্য ও উত্তুরে বাতাস সবই সমান উপভোগ্য; খিলানমার্গে কিন্তু তা নয়। সব কিছুরই একটা মাত্রা আছে, তা ছাড়ালেই আরামের জিনিষও যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়ায়। যে-শৈত্য সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু গুলমার্গে পরম উপভোগ্য ঠেকে তা-ই এগারো হাজার ফুট উঁচু খিলান-মার্গে যন্ত্রণা। শীতে আমাদের পনিগুলিও হি হি করে কাঁপছিল। এই তুষারের দেশে তাদের যোগ্য কোনো খাদ্যই নেই—এ দেখে নিজেদেরই অপরাধী মনে হলো। গুলমার্গের পথের কুকুরদের দেবো বলে' কেনা একটা ছোট পাঁউরুটি আমার পকেটে ছিল। তাই দিলাম খেতে আমার পনিটাকে। কিন্তু তা একটা পনির পক্ষেই যথেষ্ট হলো না। অন্য তিনটি ঘোড়ার বঞ্চিত অসহায় দৃষ্টি আমি অনেকদিন ভুলতে পারিনি।

কাশ্মীরের সংখ্যাতীত হ্রদগুলি—শেষ নাগ, ভেরি নাগ, অনন্ত নাগ, খানাবল, গণ্ডেরবল এদের কয়েকটি নাম—আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। আর অক্ষয় হয়ে আছে ঝিলমে ও ডাল হ্রদে শিকারায় ভ্রমণ এবং চন্দ্রালোকে কলস্বনা লীডর। প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও আমরা রাত এগারোটার পরে সমস্ত গুলমার্গ পরিক্রমা করেছি। নিশুব্ধ পাহাড়ী শহর—এখানে ওখানে পাকিস্তানী আক্রমণের চিহ্ন বিদ্যমান। কাঠের বাড়ীগুলি—অধিকাংশ বাড়ীই কাঠের—সব অক্ষত নয়। নেডুর হোটেল, টুরিষ্ট হোটেল, খালসা হোটেল—কোথাও ইলেকট্রিক বাল্বগুলি ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। সম্পূর্ণ নিঃশব্দ পাহাড়ী শহরটিতে শীতার্ত্ত পাহাড়ী কুকুরের করুণ ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। কবি বলেছেন, the still sad music of humanity। অবোলা জীবের ক্রন্দন আরও করুণ। যাই হোক গুলমার্গের স্মৃতি নীল নির্জ্জনতার স্মৃতি। নীল পপলারগুলি, শীতার্ত্ত ঘোড়া ও কুকুরগুলি, অনির্বচনীয় নিশুব্ধতা, চন্দ্রালোকিত খিলানমার্গ ও আল-পাথার হ্রদের পথ— এসবই যুগপৎ আনন্দ ও করুণার সূত্রে গাঁথা।

আমার কাশ্মীরের আরেক জাতীয় স্মৃতিও একটি আছে। সেটি একটি ভুতুড়ে অভিজ্ঞতার। আমি যখন কাশ্মীর যাই তখন ট্রেন পাঠানকোট পর্য্যন্তই যেত। আমি একটি কন্‌ডাক্‌টেড টুরে গিয়েছিলাম, যাঁদের ব্যবস্থা ছিল মোটামুটি রকমের। পাঠানকোট থেকে বাস ছাড়তে খুব দেরী হওয়ায় জম্মুতে নৈশ আহার সারতেও খুব দেরী হলো। এবং ফলে বানিহাল বা কুদে রাত্রিযাপন আর সম্ভব হলো না। রাতটা কাটাতে হলো উধামপুরের রেষ্ট হাউসে। রেষ্ট হাউসটি প্রকাণ্ড হ'লেও তার ঘরের সংখ্যা খুব বেশী ছিলনা।

দুটি হল-ঘর বেছে নিয়ে একটিতে পুরুষদের অন্যটিতে মেয়েদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হলো।

গভীর রাত্রে—প্রায় তিনটার সময়—একটা সমবেত চীৎকারে—ঘুমটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মেয়েদের হল থেকে প্যানিক ও বিশৃঙ্খলার আওয়াজ কানে এল। সকলেই বলছে কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছিল। কেমন করে যেন স্থির হয়ে গেল যে আক্রমণকারীরা অশরীরী। বাকী রাত্রিটা আর ঘুম হলো না, হলো ভূতের গল্প। উধামপুর রেষ্ট হাউস সম্বন্ধে শুনলাম যে, বছর পঞ্চাশ ষাট আগে ওখানে চারজন ইংরেজ যাত্রী রাত্রিবাস করে। একজন বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখে তার তিন সঙ্গীকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে। ঠিক গলা টিপে নয়, গলায় ফাঁস বেঁধে—সেই ঠগীদের পদ্ধতিতে। অবশিষ্ট যাত্রীটি পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করে। এর পর থেকেই নাকি ঐ হল ঘরটিতে ভূতের উৎপাত সুরু হয়।

আমাদের এক সহযাত্রী বললেন, পাহাড়ী অঞ্চলে ভূতের প্রাদুর্ভাব বেশী। বেশী কি না জানি না, তবে ভূতে বিশ্বাস সব পাহাড়ীদের মধ্যেই যে বেশ প্রবল এটা লক্ষ্য করেছি—দার্জিলিঙে, ঘুমে, গ্যাংটকে, সর্ব্বত্র।

পরিশেষে একটি কথা জানাই। এতে একটুও অতিরঞ্জন নেই। আমার যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, এবং আমি যখন ভূতের উপদ্রবের কথা কিছুই জানি না, তখন আমি দেখলাম একজন দীর্ঘদেহ ইংরেজ (শ্বেতাঙ্গ বললেই বেশী ঠিক হবে) আমাদের হল ঘরের দরজা খুলে বাইরে গেলেন। আমাদের সঙ্গে কিন্তু কোনো ইংরেজ সহযাত্রী ছিলেন না। বুদ্ধিতে বা যুক্তিতে এর কী ব্যাখ্যা?

সুন্দর পরিবেশে সুন্দর সরাইখানায় উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের সাহচর্য্যে বই পড়া যে সৃষ্টির অন্যতম চরম বিলাস এ বিষয়ে রসিক মাত্রেই একমত। ওমর খৈয়ামের সঙ্গে উইলিয়ম হ্যাজলিটের জীবন দর্শনের মিল নেই, কিন্তু এই সম্বন্ধে ওঁরা প্রায় একমত। লাঙ্গোলেনের (Llangollen) সরাইখানায় এক প্লেট মুরগী (সম্ভবতঃ রোষ্ট) আর একপাত্র ale সহযোগে হ্যাজ্‌লিট্‌ রুশোর আত্মজীবনী দ্বিগুণ উপভোগ করতেন। ওমর খৈয়াম কেবল কাব্য পাঠের কথাই বলেছেন—কিন্তু এটা অসম্পূর্ণ সত্য। যে কোনো উপভোগ্য বই, উপযুক্ত খাদ্য পানীয় ও পরিবেশের সংযোগে অনেক অনেক উপভোগ্যতর হয়ে ওঠে। আর তা ছাড়া সব কবিতা ওভাবে উপভোগ করাও যায় না। যায় কেবল সেই সব কাব্য যার মধ্যে কিছু hedonism বা খৈয়ামী ভাব

আছে, যেমন সপ্তদশ শতাব্দীর কবি হেরিক (Herrick),Carew এবং Lord Rochester, উনিশ শতকের কিছু সুইনবার্ণ, কিছু ডাউসন (Dowson), ইয়েট্‌সের প্রথম যুগের কবিতা, আর বিশ শতকের কবিদের মধ্যে কিছু ডিলামেয়ার, রুপার্ট ব্রুক, হাউসম্যান ও হার্ডি—আর রয় ক্যাম্বেলের একটি কবিতা এবং মরিস বেয়ারিং-এর দু'টি এলিজি।

উটাকামণ্ডের রেলওয়ে রেস্তোরাঁ "Delight"-এ বসে' আমি অনেক বই উপভোগ করেছি। Michael Lloyd-এর Apuleian Summer এর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি। মাইকেল লয়েড অত্যন্ত স্পর্শ-সচেতন ভ্রমণ-রসিক। তাঁর ইটালীয় স্মৃতিচারণ অধুনাবিস্মৃত লেখক Vernon Lee-র কথা মনে আনে। হয়ত আর্ণেষ্ট রেমণ্ডের Two Gentlemen of Rome-ও (যা শেলী ও কীট্‌সের যুগ্ম স্মৃতিচারণ) মনে আসে। আমার অবশ্য মরিস বেয়ারিং এর জোনাকীজ্বলা কমলাগন্ধে মদির মোডচিদের স্মৃতিবিজড়িত ফ্লোরেন্সের কথাই মনে হয়েছিল। মাইকেল লয়েড তাঁর এই অত্যন্ত উপভোগ্য বইটিতে অনেক অবিস্মরণীয় উক্তি করেছেন ; তার মধ্যে আমি মাত্র একটি উদ্ধৃত করবো।—"Old letters I can tear up and burn ; but the way the heart remembers places where it was happy and people whom it loved, the sudden start at some turn of the street or season, unexpectedly resurrecting time and place, I cannot root out." মাইকেল লয়েড যখন Apuleian Summer লেখেন (১৯৫৩) তখন তিনি পরলোকগত লর্ড লিণ্ডসের প্রতিষ্ঠিত ষ্ট্যাফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। এমন প্রতিভাধর ও স্পর্শসচেতন লেখক যে কেন একটি মাত্র বই লিখলেন, আমি জানিনা। তবে অভিজ্ঞ পাঠক ও পথিকমাত্রেই জানেন যে পাঠের সঞ্চয় ও পথের সঞ্চয়ের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য মিল আছে। দুইটিই মূলতঃ আফশোষের সঞ্চয়।

মাইকেল লয়েডের লেখার উপরে এই শতকের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-ক্লাসিক নর্ম্যান ডগ্‌লাসের Old Calabria-র ছাপ আছে। আর হয়তো পরোক্ষ ছাপ আছে স্যর কম্পটন ম্যাকেঞ্জীর Greece in my Life-এর এবং আরেকটি ভ্রমণ ক্লাসিক্ Axel Munthe-এর The Story of San Michele-এরও।'

১৯৭৫ সালে Prince's এর লাউঞ্জে বসে আমি পড়ি রোনাল্ড সেগালের (Ronald Segal) The Struggle against History। আর পড়ি জেম্‌স্ ক্যামেরনের দুইখণ্ড আত্মজীবনী, The Point of Departure,

আর সদ্যপ্রকাশিত An Indian Summer। এই দু'জন লেখকই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক অবক্ষয়ের কথা বলেছেন ; আমাদের দুর্নীতি ও শ্লোগান-বাজি সম্বন্ধেও বলেছেন। বলেছেন বেশ চড়া সুরেই।

ক্যামেরন বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ লেখক। উঁনি প্রায় ছয়বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন এবং পৃথিবীর সব দেশেই কিছুদিন ক'রে কাটিয়েছেন। উলান বাটোর থেকে টিম্‌বাক্‌টু সর্ব্বত্রই ওঁর অবাধ গতায়তি। উনি কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাগাসাকি ও হিরোশিমায় আণবিক বোমা ফেলার আগে বিকিনিতে একটি গোপন পরীক্ষা হয়েছিল, কয়েকটি যুদ্ধজাহাজের উপর প্রথম আণবিক বোমা ফেলে। সেই পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ কেবল আমেরিকার সাংবাদিক ও লেখকদেরই দেওয়া হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন জেম্‌স্ ক্যামেরন, যিনি ইংরেজ হয়েও এই বিশেষ সুযোগ লাভ করেন।

ক্যামেরন, বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের দর্শনীয় সব স্থানই দেখেছেন। দার্জিলিঙ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য ওঁকে খুব মুগ্ধ করে। এ বিষয়ে ওঁর মুগ্ধ ভাষণ (একটু উচ্ছ্বাসপূর্ণ হলেও) আমার মনেও প্রতিধ্বনি তোলে।—

"On this day, the first Himalayan dawn, the impact of Kanchenjunga standing most undeniably monarch, and among that staggering barrier, peach-glow against the grey, the momentary rosy iridescence, so far surpassed anything I had foreseen that I stood trembling with cold at the window,staring at the fading achievement of rock and snow, as swiftly the clouds assembled and engulfed it before my eyes."

তবে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে দার্জিলিং-এর যে সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি হয়েছে, যেমন হয়েছে অন্যসব হিল-ষ্টেশনগুলির, সে বিষয়ে ক্যামেরন নিঃসন্দেহ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়া রঙ্গিত ও তিস্তা নদীর সঙ্গমও ওঁকে মুগ্ধ করে, এবং পাঠক মাত্রেই এই ভ্রমণরসিকের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের অংশীদার হবেন। তবে সকলে ওর কালিম্পং সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের সমর্থন করবেন কিনা জানিনা। আমার নিজের কালিম্পংস্মৃতি একটু এলোমেলো।

গ্রেহাম্‌স্ হোমে ডালিয়া, জিরানিয়াম, এ্যাষ্টর, ভায়োলেট আর রুবেলের অকৃপণ সমারোহ মনে আছে। পথে ঘাটে (অবশ্য পথ একটিই) অসংখ্য

তিব্বতী পশম ও মৃগনাভি বিক্রী করছে। গ্রীসের প্রিন্স পিটারের বাড়ীতে মর্নিং গ্লোরী আর হানিসাকলের বেড়া। রৌদ্রস্নাত কাঞ্চনজঙ্ঘা—দার্জিলিঙ থেকে যা ক'চিৎ চোখে পড়ে। আর অসংখ্য হলুদরঙের বড় বড় প্রজাপতির মেলা। আরও মনে পড়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে সেই তিব্বতী রেস্তোরাঁটি (নাম ছিল বোধ হয় Great Tibetan Restaurant) যেখানে আমরা তিব্বতী ও চৈনিক রন্ধন কলার তুলনামূলক আলোচনা করেছিলাম, মনে আছে! ভোজনরসিক মাত্রেই জানেন যে,যেমন ভারতীয় তেমনি চীনা রান্নাও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম ও বিভিন্ন স্বাদের। যেমন পিকিং-সাংহাই এর রান্নার সঙ্গে ক্যাণ্টনের রান্নার তেমন মিল নেই। আবার হংকং-এ একটি তৃতীয় ধারা পাওয়া যাবে। তবে কারও সঙ্গেই তিব্বতী রান্নার মিল নেই বিশেষ। অনেকে হয়তো জানেন না যে, কলকাতাতেও একটি তিব্বতী রেস্তোরাঁ আছে—নাম বোধ হয় Koongah,—টেরিটি বাজারে অবস্থিত। এখানে দালাইলামার সমর্থক ও সমালোচক উভয় দলই সমান তৃপ্তি পাবেন বলে' আমার বিশ্বাস।

জেম্‌স ক্যামেরনের An Indian Summer বইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। A Point of Departure-এর মতো ঝাঁটি আত্মজীবনী নয়। এতে আছে ভারতের যা কিছু তাঁর পছন্দ বা অপছন্দ হয়েছে তার ফিরিস্তি বা বিবরণী। প্রথম লিষ্টে সর্বাগ্রে নাম তাঁর তৃতীয় স্ত্রী মণির—ইনি কেরল বাসিনী। মণির পরে নাম করেছেন জয়পুরের প্রাক্তন রাজমাতা গায়ত্রীদেবীর, স্বর্গত পণ্ডিত নেহরুর ও প্রসিদ্ধ লেখক নীরদ চৌধুরীর। তবে নীরদ চৌধুরীর মূল্যায়নে ও সাহিত্যবিচারে ক্যামেরন তেমন অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি। নিজে সুলেখক হয়েও ক্যামেরন সমসাময়িক সাহিত্যজগৎ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন (তিনি ই. এম. ফর্ষ্টারের সংস্পর্শে কখনো আসেন নি)—এটাই বোধ হয় এর কারণ। কিন্তু সাহিত্যজগৎ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হলেও রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে তিনি খুবই ঘনিষ্ঠ। তাই এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত খুব মূল্যবান। সেগাল ও নইপালের মতোই তিনিও নয়া দিল্লীর উঁচু মহলের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও দুর্নীতির অকুণ্ঠ নিন্দা করেছেন।

ক্লাব রোডের ও Prince's-এর মধ্যের মহুয়া, সীতাহর, কৃষ্ণচূড়া, শিরিষ, শাল ও ইউক্যালিপ্‌টাস গাছগুলি আমায় যুগপৎ উন্মনা ও শান্ত করতো, যেমন করতো ক্যানারি হিলের উপর থেকে দেখা সূর্য্যাস্ত। ক্যানারি হিলে

আজকাল ট্যুরিষ্ট বা ভ্রমণবিলাসী বেশী আসেন না। ১৯৭২ সালেও দেখেছিলাম, পাহাড়ের নীচে একটি বিশ্রামাগার ও ক্যান্টিন, যেখানে চা কফি ও স্ন্যাক্স্ পাওয়া যেত। এবার সেখানে দেখলাম প্রচুর ধূলো ও মাকড়সার জাল—আর কিছু কদর্য্য দেয়াল-লিখন। তবে পাহাড়ের তলায় যে কোনো পাথরের উপর খানিকক্ষণ বসলে এখনো নিবিড় প্রশান্তিতে মন ভরে ওঠে। উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আসে কতো নাম না জানা ফুলের গন্ধ। মনটা স্নিগ্ধ হয়। এক রকম গাছ দেখলাম, ফুলগুলি ছোট ছোট রঙ্গন ফুলের মতো, আর ফলগুলি ছোট ছোট আঙ্গুরের মতো। আমাদের রিক্‌শাওয়ালা বললে ওর নাম রঙ্গীনী কাঁটা। তবে ক্যানারি হিলে বনবিভাগের রেষ্ট হাউসটি এখনো অক্ষত আছে—এইটিই ভাগ্য বলতে হবে। সেখানে এখনো সামান্য দক্ষিণায় নীলনির্জ্জন অবকাশ ভোগ করা যায়। মনে হয় পর্য্যটন বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত নয় বলেই এখনো সেটি অক্ষত আছে। তবে সেখানেও আমাদের জন্যে তিন পেয়ালা চা সংগ্রহ করতে যথেষ্ট তদবির করতে হলো। বসুন্ধরা—অন্ততঃ ভারতখণ্ডে—বীরভোগ্যা নন, তদবির-ভোগ্যা।

নির্জ্জনতার পূর্ণ উপভোগের জন্য মাঝে মাঝে যেতে হয় 'দুয়ার হতে অদূরে'। ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু রৌদ্রালোকে কেমন দেখায়, সেটা নূতন করে' দেখার জন্যে। শালবনের মধ্যে তমালও আছে কিনা সে কৌতূহল মেটাবার জন্যে এবং টেলিগ্রাফের তারে ফিঙ্গে ছাড়া আর কোনো পাখী বসে কিনা তাও দেখার জন্য।

আমার ছেলেবেলায় বিলাসপুরে থাকতে দেখেছি খুব কালো একরকম পাখী টেলিগ্রাফের তারে বসতো। স্থানীয় নাম তার "ভীমরাজ"। ফিঙে আর ভীমরাজ অভিন্ন কিনা তা আজও জানা হয় নি।

১৯৪৫ সালে হাজারিবাগের বাসষ্ট্যাণ্ডটি অন্যত্র অবস্থিত ছিল। তখন আমরা বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছেই এক চায়ের দোকানে দু'বেলা চা খেতাম। স্বত্বাধিকারী খুব আলাপী লোক ছিলেন। আমরা তাঁকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতুম, হাজারিবাগ থেকে বাসে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়। একদিন তিনি বলেছিলেন, "যেখানে ইচ্ছে। ইচ্ছে হলে হনলুলু"। উত্তরটা আজও মনে আছে। মমের "হনলুলু" গল্পটি—গল্প cum ভ্রমণ স্মৃতি—মনে পড়লো। যে-হনলুলু আজকের সঙ্কুচিত পৃথিবীতেও অনেক দূরের যাত্রা; যা সান ফ্রান্সিস্কো থেকেও অনেক দূর, যা চৈনিক, জাপানী, ফিলিপিনো ও

আমেরিকানদের মিলনক্ষেত্র,—পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনক্ষেত্র তো বটেই—ইচ্ছে হলেই কি আর সেখানে যাওয়া যায় ?

১৯৭৪ সালে টের পেলাম, হাজারিবাগ থেকে গন্তব্যস্থানের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। অবশ্য ওখান থেকে বিহারের বহু বহু শহরের উদ্দেশে বাস ছাড়ে—যেমন দ্বারভাঙ্গা, টাটানগর, গয়া ইত্যাদি—তবু খানিকক্ষণ আরামে পথের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে' মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে রাত্রি আটটার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন, একদিনের মধ্যে সারতে হলে' গন্তব্য স্থান মাত্র তিনটি। রাঁচী, গিরিডি, আর ঝুমরিতিলাইয়া। ডালটনগঞ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আমাদের ছিল, সেখানে রাত্রিবাসেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু শুনলাম সেখানে উপযুক্ত হোটেলের অভাব। চাঁইবাসাতেও তাই। রাঁচী যাওয়ারও কোনো আগ্রহ বোধ করলাম না। রাঁচী-হাজারিবাগ রোডের আকর্ষণ তো একমাত্র টুটুপালু ঘাট। রাঁচী সহর তো একেবারে বৃক্ষশূন্য জনাকীর্ণ দুঃসহ কলকাতারই পেপারব্যাক সংস্করণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া অতি পরিচয়ে বহুবার পড়া বইয়ের মতো হয়ে গেছে, কোনো ঔৎসুক্যই আর বোধ করি না।

গিরিডি অবশ্য আমার দেখা হয়নি বলে' গিরিডি সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। যদিও জানি শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু যে-গিরিডির স্মৃতিচারণ করেছেন সে গিরিডিকে খোঁজা বৃথা। তবুও কৌতূহল ছিল। কিন্তু গিরিডি যাওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করতে হলো যেহেতু শুনলাম গিরিডি থেকে ফেরার বাস নাকি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই। গিরিডির মতো ছোট শহরের পক্ষেও এইটুকু সময়—একেবারেই পর্য্যাপ্ত নয়—যদিও আজকাল যাঁরা "অমুক স্পেশাল" "তমুক স্পেশ্যাল" এর ফলাও ব্যবসা করেন তাঁরা এর চেয়ে বেশী সময় দেন না। য়ুরো-আমেরিকার কোটিপতি ট্যুরিষ্টরাও শুনি এই রকম গোগ্রাসেই Louvre, Eiffel Tower, Leaning Tower ইত্যাদি দেখেন। কিন্তু আমার তা একেবারেই মনঃপূত নয়।

আমরা তাই Pis Aller হিসাবে ঝুমরিতিলাইয়া বা কোদারমা গেলাম। হাজারিবাগ গিরিডির মতো ব্রাহ্মপ্রধান শহর। কোদারমা গিরিডির অপর বৈশিষ্ট্যের অংশীদার। কোদারমা অভ্রপ্রধান শহর। পথে ঘাটে সর্ব্বত্র অভ্রের টুকরো ছড়িয়ে আছে স্তূপীকৃত হয়ে। মাঝে মাঝে এক একটি টুকরো হীরের মতো ঝকঝক্ করে।

ধানবাদের মতো কোদারমাও শিল্পকেন্দ্রিক এবং সমৃদ্ধ। রাজস্থানী স্থাপত্যে নির্মিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব বাড়ী। প্রাসাদ বললেও চলে। হোটেল-

গুলিও প্রায় সবই রাজস্থানীদের। মাঝে মাঝে ভ্রম হয় বুঝি বিকানির বা মারওয়াড়ের দেশে এলুম। একটিমাত্র বাঙ্গালীর বাসভবন চোখে পড়লো, নাম "বলাকা"। মনে রাখবার মতো নাম।

আমরা অগত্যা একটি "রাজস্থানী" হোটেলেই নিরামিষ মধ্যাহ্নভোজন সারলাম। রাজস্থানী হলে কি হবে ডালটি কিন্তু তার ঐতিহ্য হারিয়েছে এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতির বাহক হয়েছে দেখলাম। সুসিদ্ধও নয়, তরলও বটে। তবে আলুকপির তরকারীটি ভালো লাগলো, মিষ্টান্নও নিন্দনীয় নয়।

হাজারিবাগের তুলনায় কোদারমা কিন্তু অনেক বেশী ব্যয়সাধ্য স্থান। মধ্যাহ্নভোজনের পর ঘণ্টা দুই সাইকেল-রিক্‌শা করে' শহর পরিভ্রমণের প্রস্তাব করলে কোনো রিকশা কুড়ি টাকা, কোনো রিক্‌শা পঁচিশ টাকা এরকম ভাড়া চাইলে। বুঝলাম অভ্র সাদা হলেও এখানে টাকার রঙ কালো।

হাজারিবাগ থেকে ঝুমরিতিলাইয়ার পথ খানিকটা বেশ বনাকীর্ণ। অরণ্যই বলা চলে। তবে সে বন পালামৌর কি বেতলার জঙ্গলের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু জঙ্গল মাত্রেই—মস্তান ও ট্র্যানজিষ্টার উৎপীড়িত কলকাতাবাসীর কাছে রমণীয়। শাল পলাশ মহুয়ার সমাবেশ দেখলেই মনটা নেচে ওঠে। ফেরার পথে বিকালের রাঙা আলোয় তিলাইয়া বাঁধের জলরাশি দেখে চিল্কার কথা মনে এলো। আর অপরাহ্নের আলোয় চিল্কায় নৌকা ভ্রমণের স্মৃতি।

চিল্কার রেষ্ট-হাউস পূর্ব্বভারতের অন্যতম "সবপেয়েছির দেশ"। নির্জ্জন অবকাশ উপভোগের জন্য অমন সুন্দর জায়গা খুব বেশী নেই। চিল্কা, গোপালপুর আর বিমলিপটম্। পুরীতে সমুদ্র আছে কিন্তু নির্জ্জনতা নেই। তবু পুরীর সঙ্গে চিল্কা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলে' পুরীর কথাও মনে পড়লো।

আবার কোন্ সাযুজ্যে জানি না, মনে পড়লো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দেশের Ullswater হ্রদের কথা। এ হ্রদটির জল ভারী উতলা, Rydal বা Windamere এর মতো শান্ত নয়। Windamere-এ আমি মাঝে মাঝেই ষ্টীম-লঞ্চে করে বেড়াতাম সেকথাও মনে পড়লো। Ullswater-এও একটি ষ্টীম লঞ্চ ছিল কিন্তু তাতে বেড়াতে ভরসা পাইনি। তবু তার উষেল রূপ আর নিকটবর্ত্তী জলপ্রপাতের কথা এখনো মনে পড়ে।

ভ্রমণের স্মৃতি এমনই। স্বপ্নের মতো sequence-বিহীন। খানিকটা stream of consciousness উপন্যাসের মতোও বলা চলে।

অধিকাংশ ভ্রমণরসিকের পক্ষে ভ্রমণ একপ্রকার পলায়ন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে কারণে প্রকৃতির মধ্যে আশ্রয় খুঁজতেন অধিকাংশ নগর-জীবনক্লান্ত মানুষ ভ্রমণের মধ্যে তাই খোঁজেন। ডি. এইচ. লরেন্সের কাছে কিন্তু ভ্রমণ পলায়ন ছিল না, ছিল একপ্রকার অনুসন্ধান ও প্রত্যাশা। তিনি অষ্ট্রেলিয়ায়, সিলোনে, মেক্সিকোয় গিয়েছিলেন এমন একটি সমাজের সন্ধানে যেখানে জীবনযাত্রায় আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাব খুব কম, যেখানে মানুষের আদিম প্রাণশক্তি এখনো সতেজ। তবে একমাত্র মেক্সিকোর রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ছাড়া কোথাও তিনি সেইরূপ সমাজ খুঁজে পাননি। অরওয়েলের মতো লরেন্সও মনে প্রাণে খাঁটি ইংরেজ ছিলেন, তবে তাঁর শিল্পী মানস ছিল অনেকটা কবি ব্লেকের সমগোত্রীয়। তাঁর বক্তব্য ছিল: চিন্তা করতে হয় মস্তিষ্ক দিয়ে নয়, সমগ্র সত্তা দিয়ে। তাঁর তথাকথিত অশ্লীলতা এই বিশ্বাসের আধারে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আমি যে সময় উটাকামণ্ড যেতাম তখনো সেখানে দু'একটি ইংরেজ পরিচালিত হোটেল অবশিষ্ট ছিল। এখন আর নেই। তবে আমি ওখানকার বিখ্যাত দক্ষিণী হোটেল "দাশ প্রকাশ" এই আশ্রয় নিতাম। আহার নিরামিষ হ'লেও চাউলটি ছিল উৎকৃষ্ট এবং সঙ্গে প্রচুর গব্য ঘৃত দিত। রাত্রে "মশালা কারী"র সঙ্গে লুচিও দিত।

উনিশ শতকের হাস্যরসিক বিখ্যাত কবি Edward Lear ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ লিপিতে দার্জিলিঙ, সিমলা ও উটির অত্যন্ত মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। ১৮৭০-এ তিনি উটিতে এসেছিলেন। উটি তাঁর চোখে ইংলণ্ডের একটি মফঃস্বল শহরের মতো মনে হয়েছিল। তিনি উটিকে Leatherhead এর-সঙ্গে তুলনীয় মনে করেছেন। জেমস্ ক্যামেরণ আবার উটিকে Camberley-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। দু'টি তুলনারই তাৎপর্য্য মিলবে স্থানীয় লাইব্রেরীটিতে ও স্থানীয় বাড়ী ঘরের নামকরণের মধ্যে— ইংলণ্ডের জন্য "নষ্ট্যালজিয়া" এদের গায়ে জড়িয়ে আছে। আমি ত উত্তর-স্বাধীনতা যুগেই গিয়েছি, কিন্তু তখনো দেখেছি উটি ক্লাবের অভ্যন্তরে সেনাপতি ও ব্রিগাডিয়েরদের অসংখ্য তৈলচিত্র। আর উটাকামণ্ড লাইব্রেরী ও নীলগিরি লাইব্রেরীতে দেখেছি অজস্র বাঁধানো Strand Magazine-এর সেট এবং তার চেয়েও অর্থবহ, বাঁধানো চার্লস্ ডিকেন্স-সম্পাদিত All the year Round! মনে হয় একখণ্ড All the year Round যেন ১৮৫৭ সালেরই ছিল। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের বাড়ীগুলির ভিক্টোরীয় পদ্ধতির

gables আর অধুনাদুর্লভ shrubbery গুলিও সেই হারানো যুগের স্মৃতি জাগায়। বাড়ীগুলির নামও তেমনি—Glencoe, The Nook, Heather-high, Windermere ইত্যাদি।

অবশ্য মুসৌরীর Devonshire House আর দার্জ্জিলিঙ-এর—Mall এর পরের থাকেই—Ivanhoe ও Kenilworth এর কথাও মনে পড়ে। কিন্তু এতে আর ওতে কোথায় যেন একটা তফাৎ আছে। এই তফাৎ ফুলের রাজ্যেও। ইংলণ্ডের অনেক ফুলই—Daisy, Violet, Primula, Aster, Geranium—ভারতের যে কোনো প্রথম শ্রেণীর শৈলনগরীতে দেখতে পাওয়া যাবে। আবভক্ত ভারতের পেশোয়ারে এত জিরেনিয়াম ফুটতো যে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও Bengal Lancer-এর লেখক মেজর ইয়েট্স্-ব্রাউন ইংলণ্ডে বসেই জিরেনিয়ামের গন্ধে পেশোয়ারের স্মৃতি উজ্জীবিত করতেন। তবু মনে হয় কয়েকটি ইংলণ্ডীয় ফুল, যেমন Stocks ও Canterbury Bells, ভারতবর্ষে এক উটি ভিন্ন আর কোথাও ফোটে না। বেশ বোঝা যায় সে যুগের গৃহব্যাকুল ইংরেজ উটির মধ্যে তার ফেলে-আসা সাসেক্সকে (হিলেয়ার বেলক্ ও কিপ্লিঙ-এর প্রিয় সাসেক্স) খানিকটা ফিরে পেত। এখনো উটির Wenlock Downs-এ খানিকটা সময় অন্যমনস্ক ভাবে কাটালে এ জায়গার ঐ বৈশিষ্ট্যটি অনুভব করা যায়।

শেলীর কবিতায় স্মৃতি সঙ্গীত ও সৌরভ যে তাদের রেশ রেখে যায় এই মর্ম্মে একটি উক্তি আছে। ঐতিহাসিক স্মৃতি সম্বন্ধে কিন্তু কথাটি খাটে না। অনেক নগরী নানা অজ্ঞাত কারণে তাদের সব পূর্ব্বস্মৃতি-বিবর্জ্জিত হয়ে বিরাজ করে। অতি করুণ amnesia!

আমার বন্ধু অধ্যাপক বায়লন ডেসা (Bailon Desa) অনেকদিন ইউনাইটেড নেশন্সে কাজ করেছেন। তিনি যখন লিবিয়ায় ট্রিপলি শহরে ছিলেন তখন আমি তাঁকে লিখি তিনি ওখানে ব্রাউনিং ও সুইনবার্ণের অশরীরি-অস্তিত্ব অনুভব করেন কি না। অনেকেই জানেন যে, ট্রিপলি মধ্যযুগের একটি বিখ্যাত প্রেম কাহিনীর (যার নায়ক রুডেল) পটভূমি। ব্রাউনিং ও সুইনবার্ণ দুজনেই এই কাহিনী নিয়ে দু'টি অমর কবিতা লিখেছেন। ডেসা আমায় জানালেন, ট্রিপলির রোমান্টিক সত্তা ও তার স্মৃতি বহুদিন অবলুপ্ত হয়েছে, ট্রিপলি এখন একটি মামুলি আরব অধ্যুষিত শহর। হায়, তেমনি অজ্ঞাত কোনো কারণে সমরকন্দও তার অতীত স্মৃতি হারিয়ে এখন

নগণ্য,—যে সমরকন্দের সম্বন্ধে সাদি, হাফিজ্ ও ইংরেজ কবি জেম্‌স্ এলরয় ফ্লেকার (James Elroy Flecker) সকলেই স্মরণীয় কবিতা লিখে গেছেন।

"আগর আঁ তুরক শিরাজী
কদস্ত আরফ্ দিল মারা
বখাল-ই হিন্দ্—রস্—বখ্‌শম
সমরকন্দ ও বোখারা রা।"

আমি যখন ইংলণ্ডে হার্ডির ঔপন্যাসিক ও কাব্যিক পটভূমি ওয়েসেক্স (অর্থাৎ ডরসেট) অঞ্চলে ঘোরাফেরা করি, তখন আমি পশ্চিম উপকূলের Tintagel-এ যাই। টিন্টাগেলেই নাকি কিংবদন্তীখ্যাত কিং আর্থারের দুর্গ ছিল। দুর্গের অবস্থানটি (কাল্পনিক হোক বা যা-ই হোক) এখনো দেখানো হয়। এবং এখানেই হার্ডি তাঁর A pair of Blue Eyes লেখার প্রেরণা পান। তাঁর প্রথমা স্ত্রী এম্মা নীলনয়না ছিলেন। সে যাই হোক, টিন্টাগেলে গিয়ে কিংআর্থারের স্মৃতির প্রভাব আমার মনে প্রিয় লেখক হার্ডির প্রভাবকে অতিক্রম করে' গেল। সমুদ্রের কল্লোল দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। একটি ছায়াঘন Tea- Rooms-এ বসে'—প্রচুর Cornish cream, Scone, এবং (অরওয়েলের ভাষায়) Mahogany-brown tea-র সদ্ব্যবহার করতে করতে—টেনিসনের কিং আর্থার সম্বন্ধে—কবিতা দুটি মনে মনে আবৃত্তি করলাম। আর আবৃত্তি করলাম Mary Webb-এর একটি উক্তি, "Though to-day there is no Hylas to be charmed into silence, no Excalibur to be thrown across the meres, the shadows are still beautiful." সাহিত্য-আশ্রিত স্মৃতি আমায় বেশী আকর্ষণ করে।

ভারতবর্ষেও অনেক স্থান, অনেক নগরী তাদের পূর্ব্বস্মৃতি এবং রোমান্টিক সত্তা হারিয়েছে। পাটনায় অবশ্য প্রাচীন পাটলিপুত্রের অনেক স্মারক এখনো বর্ত্তমান। কিন্তু উজ্জয়িনীতে গেলে কি আর বিক্রমাদিত্য ও কালিদাসের কথা মনে পড়ে রেবা নদীর অবস্থানই? আজ কল্পনার বিষয়। আর যে-কোনো নদীর তীরে কি অনিমেষদৃষ্টি মালবিকাকে কল্পনা করা যায়?

দু'টি সাহিত্য-অনাশ্রিত ঐতিহ্যবিম্বিত নগরীর নামও মনে পড়ছে। একটি হলো উত্তর প্রদেশের বায়ানা, অপরটি এই বাংলার মুর্শিদাবাদ। সে যুগের সব মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতেই বায়ানা ঐশ্বর্য্যে ও জনসংখ্যায় আগ্রার

সমকক্ষ ছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। আর আজ? আমি পঞ্চাশের দশকে একবার মথুরা থেকে মোটর যোগে বায়ানা যাই। আমার অবস্থা আমার বন্ধুর ট্রিপলি দর্শনের মতোই হলো। স্মৃতিমাত্রেই করুণ, লুপ্ত স্মৃতি করুণতম। কবি Roy Campbell তাঁর Tristan Da Cunha কবিতায় এই অনুভূতিটি সুন্দর প্রকাশ করেছেন।

এমনি আরেকটি শহর, মুর্শিদাবাদ। হাজার দুয়ারী, জাহানকোষা ও নবাবদের চিত্রশালা দেখেও কি মুর্শিদাবাদের অতীতকে পুনরুদ্ধার করা যায়? সাহিত্যিক বিমল মিত্র অবশ্য মুর্শিদাবাদের, বিশেষতঃ চাহাল সেতুনের genius loci পুনরুদ্ধারের প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ ও তার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে লর্ড ক্লাইভের উচ্ছ্বাস কি আজ আর বোধগম্য হয়? সমসাময়িক সাক্ষ্য বলে, আঠারো শতকের মুর্শিদাবাদ নাকি লণ্ডনের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। যদুপতিদের মথুরা আর রঘুপতিদের উত্তরকোশল যে পথে গেছে অনেক নগরীই সেই পথের পথিক। তবু মুর্শিদাবাদ, বিগতযুগের কঙ্কাল হলেও, আছে। বিজয়নগর আর Byzantium অবলুপ্ত।

এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণসাহিত্যিক জেম্‌স্ মরিস্। যে-শতাব্দীতে এই পর্য্যায়ে টি. ই. লরেন্স (লরেন্স অফ আরেবিয়া), লরেন্স ডারেল, ফ্রেয়া ষ্টার্ক, ট্রেসি ও প্রিচেট-কে গণনা করতে হয় সেকালে এটি কম গৌরবের নয়। আরো উল্লেখ্য যে, এ-যুগে অন্য ক্ষেত্রে যশস্বী সাহিত্যিকেরাও তাঁদের শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর ভ্রমণ সাহিত্যেই রেখেছেন। সমারসেট মমের A Gentleman in the Parlour আর জে.বি. প্রিষ্টলির English Journey, দুটি গ্রন্থই আমার মতে অবিস্মরণীয়। তেমনি অবিস্মরণীয় ই. এম. ফর্ষ্টারের Pharos and Pharillon এবং Abinger Harvest আর Two Cheers for Democracy'র অন্তর্গত কয়েকটি স্মৃতিচারণ।

ফর্ষ্টার একবার সিন্‌ক্লেয়ার লুইস সম্পর্কে বলেছিলেন যে,তিনি স্ন্যাপ্‌শটের শিল্পী। জেম্‌স্ মরিসও তাই। স্বল্পপরিসরে একটি মহানগরী কিম্বা বন্দর বা স্বাস্থ্য-নিকেতনের আকর্ষণের মর্ম্মকথা ও মায়াবী রূপটি পাঠকের কাছে পরিবেশন করায় তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর The Market of Seleukia গ্রন্থে কেবল মধ্যপ্রাচ্যের প্রাণ স্পন্দনই শোনা যায় না, শোনা যায় বার্টন, ডাউটি আর টি. ই. লরেন্সের অনুরণনও।

ই. এম. ফর্ষ্টার আলেকজান্ড্রিয়াকে কি চোখে দেখেছিলেন জানি না,

কিন্তু বারে বারেই মনে হয় তিনি সারাজীবন আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার স্মৃতিতে পীড়িত হয়েছেন। ষ্টার্ণ, ড্রামরিয়ের ও হেমিংওয়েও এই ভাবেই প্যারিসের স্মৃতিতে ক্লিষ্ট হয়েছেন। চিত্রশিল্পী গর্গ্যা (Gaguin) আর সমারসেট মম (এবং ষ্টিভেনসন ও রূপার্ট ব্রুক ত বটেই) অনুরূপ ভাবে টাহিটির মায়া আর কাটাতে পারেন নি তাঁদের মন থেকে। একটি মাত্র জায়গার স্মৃতি যে কতো আনন্দ-বেদনায় ভরা হতে পারে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত রূপার্ট ব্রুকের Tiare Tahiti কবিতাটি। (Tiare টাহিটির জাতীয় পুষ্প, গোলাপ যেমন ইংলণ্ডের)। এ্যাণ্ড্রুল্যাং অকসফোর্ডে এসেও এডিনবরার সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুজের মায়া যে কাটাতে পারেন নি তার প্রমাণ তাঁর Alma Mater কবিতাটি। অনেকে আবার সারাজীবন দ্বৈত আকর্ষণে পীড়িত হন। ষ্টিভেনসন সারা জীবন দক্ষিণ সমুদ্র আর এডিনবরার বিরোধী আকর্ষণে পীড়িত হয়েছেন যে-পীড়া—প্রশান্তিতে স্মরণ করা যায় না,—'Cannot be recollected in tranquillity'।

ই. এম. ফর্ষ্টারের আলেকজাণ্ড্রিয়া-প্রীতি ঠিক এই পর্য্যায়ের নয়। যে-আকর্ষণ Axel Munthe কাপ্রি (Capri) সম্বন্ধে বোধ করতেন, যা বিস্মৃত কবি Burgon বিস্মৃত নগরী পিয়েত্রা সম্বন্ধে বোধ করতেন (Rose-red city, half as old as time), তা বোধ করি ফর্ষ্টারের প্রকৃতিতে ছিল না—তবে জোর করে' বলাও কঠিন, যেহেতু মানুষটি আত্ম পরিচয় দানে সকুণ্ঠ ছিলেন, চার্ল্‌স্ ল্যামের (Lamb) ঠিক বিপরীত ধর্ম্মী। তবে আলেকজাণ্ড্রিয়া যে তাঁকে অভিভূত করেছিল তার স্বাক্ষর Pharos and Pharillon-এ আছে। জেমস্ মরিস মারফৎ আমরা জানতে পারি, ফর্ষ্টারের ধারণা ছিল যে, আলেকজাণ্ড্রিয়ার প্রাণস্পন্দন অনুভব করতে হলে তার পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়। হয়তো তাই। তবে একথা কি সব মহানগরী সম্বন্ধেই সত্য নয়? Doctor Johnson আর Elia-র কথা ছেড়েই দিলাম; হেনরি জেম্‌স্, লোগান পিয়ারসল স্মিথ, আর ভার্জ্জিনিয়া উলফ্ কি লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন না?

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়—ই. এম. ফর্ষ্টার টি. এস. এলিয়টের কবিতা আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারটি আলেক্‌জাণ্ড্রিয়াতে হলেই সঙ্গত হতো, হয়েছিল কায়রো-তে। আলেকজাণ্ড্রিয়ার ঐতিহ্য না থাকলেও কায়রোও বহু স্মৃতি বিজড়িত শহর। ১৯১৭ সালে ফর্ষ্টার কায়রোয় একটি রক্ত করবী বেষ্টিত গৃহে সপ্তাহ তিনেক অতিবাহিত করেছিলেন। জীবনযাত্রা ছিল

মন্দাক্রান্তা ছন্দে, কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন ছিল প্রায়-বিস্মৃত, জীবন ছিল যাকে বলে একটু 'ডেকাডেন্ট' ধরণের। এই 'ডেকাডেন্ট' জীবন সম্বন্ধে ফষ্টার বেশ সচেতন ও একটু যেন গর্ব্বিতও। তাঁর পাঠ্য ছিল সেইসব লেখক যাঁরা কর্ম্ম-বিমুখতা ও কর্ত্তব্যবিমুখতার মধ্যেও মাধুর্য্য আবিষ্কার করেছেন—যেমন জীদ্ (Gide) কিংবা Huysmans। এই সময় তাঁর হাতে আসে Prufrock আর The Portrait of a Lady। Huysmans এর 'মুড'-এর সঙ্গে এলিয়টের এই প্রথম কবিতাগুলির বিশেষ যে মিল আছে তা নয়। তাঁর উত্তরকালের কবিতা Ash Wednesday ও Four Quartets এর তো নেই-ই। তবুও ফষ্টার আকৃষ্ট হলেন দুটি কারণে। একটি হচ্ছে এলিয়টের ব্যক্তিগত অনুভূতির স্বকীয়তা, দ্বিতীয়তঃ তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর মৌলিকতা। প্রথম যুগের এলিয়ট প্রধানতঃ উপেক্ষিত, অনাকর্ষণীয় মানুষের কবি। গভীর ভাবে দেখলে হয়তো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে কিছু মিল পাওয়া যাবে, কিন্তু যেহেতু এলিয়ট নাগরিক সভ্যতার অবক্ষয়ের কবি সে-মিল ঠিক দৃষ্টিগোচর হয় না। আর একটি কারণে ফষ্টার এলিয়টের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এলিয়ট তারস্বরের বা উচ্চকণ্ঠের কবি ন'ন—তিনি প্রায় কানে কানে কথা বলেন। তাঁর Intimations of Immortality কাগজে কলমে whispers of Immortality হয়ে দাঁড়ায়। যে সময় ফষ্টার এই রচনাটি লিখেছিলেন তখনও এলিয়টের Ash Wedwsday ও Four Quartets ভবিষ্যতের গর্ভে। The Wasteland সম্বন্ধে ফষ্টার মনে করেন যে, ট্র্যাডিশনের অবলুপ্তি বা শৃঙ্খলার অভাব এ কবিতার বিষয়বস্তু নয়। আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে অনীহাই এর মূলসূত্র। কবিতাটি যে ব্যক্তিগত বিলাপ, সভ্যতা সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক রিপোর্ট নয় তা বোঝানোর জন্য ফষ্টার শেলীর Prometheus Unbound এর উল্লেখ করেছেন। এই দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন কবিতার স্বাদের মধ্যে ঐ একটি মিল আছে।

জেম্‌স্ মরিসের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক্। মরিস্ আমায় শুধু ভ্রমণে প্রেরণাই দেন নি, তাঁর অনেক রচনা আমার ভ্রমণকে নিরন্তর আনন্দময় করেছে। উটাকামণ্ডের রেলওয়ে ষ্টেশনের দোতলায় একটি স্ন্যাক-বার cum রিফ্রেশমেণ্ট রুম আছে। অন্ততঃ এ শতকের পাঁচের দশকে ছিল। এখানে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় সামান্য দক্ষিণায় পাওয়া যেত। এখানে যতো বারই এসেছি দু'টি বইয়ের মধ্যে প্রত্যেক বারই অবধারিত ভাবে ডুব দিয়েছি। একটি হলো Michael Lloyd এর Apuleian Summer,

অপরটি জেম্‌স্ মরিসের The Market of Seleukia। মরিসের Cities বা Places তখনো প্রকাশিত হয়নি। সর্ব্বসমেত শতাধিক নগরীর প্রাণ-স্পন্দন (তার মধ্যে কলকাতা ও দিল্লীও আছে) এ দুটি পুস্তকের মধ্যে অনুভব করা যায়। অনেক অদেখা নগরী সম্বন্ধে সেই পিপাসা জাগে জর্জ্জিয়ান কবি টাবার বাল্যকালে ভূগোল পাঠের সময় শিম্বোরাজো (Chimborazo) ও কোটাপাক্সি (Cotopaxy) নাম দুটি দেখে যে পিপাসা অনুভব করেছিলেন। কাপ্রি সম্বন্ধে আমার পিপাসা উদ্রিক্ত করেছিলেন Axel Munthe কিন্তু পিয়েত্রা সম্বন্ধে আমার পিপাসা জাগে বার্গনের কবিতা ও মরিসের মারফৎ। উলান বাটোর (Ulan Bator যেখানে সভ্যতার শেষ-প্রান্ত মনে হয়,আর স্বভাবতঃই মার্কো পোলের কথা মনে আসে) সম্বন্ধেও তাই। জেরুসালেমে ফটকগুলি বৈচিত্র্যে যে দিল্লীকেও হার মানায় মরিসের সঙ্গে আমিও তা অনুভব করি। মরিস Mount of Olives-এ সন্ধ্যাবেলায় উঠেছিলেন। তখন তাঁর কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের কথা মনে পড়েছিল কিনা লেখেননি, তবে লেখা উচিত ছিল। মরিসের মতে জেরুসালেমই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং তিনি এও মনে করেন যে অন্য কোনো নগরী মনের উপর এমন দাগ কাটে না।

প্রতি বৎসর Passover উৎসবের সময় য়িহুদীমাত্রেই এই প্রার্থনা করেন —**Next year in Jerusalem.**

মনে মনে আমিও করি। (ক্রমশঃ)

আঁধারের ওপারে

মৈনাক

॥ ১৮ ॥

কোন ভাল খবর নেই যেন কোন দিকে। তিনজন ব্যবসায়ী ও একজন নকশালপন্থী খুন। পুলিশ ছুরিকাহত। পুলিশের গুলিতে পাঁচজন সহ একদিনে মোট নয় জন নিহত। চুঁচুড়ায় পুলিশ খুন। কলকাতায় স্কুলে হাঙ্গামা।

হঠাৎ অসময়ে কী প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া আর তার সঙ্গে প্রবল বর্ষণ। কলকাতার জনজীবন পর্যুদস্ত। বাধ্য হয়ে অফিস কামাই করতে হল। বাস চলাচল অনিয়মিত।

পরের দিন খবরের কাগজ খুলেই চমকে উঠল সীমা। এই বাংলায় আর কি হয়েছে—পূর্ব পাকিস্তানে নটরাজ তাঁর প্রলয় নৃত্য করেছেন। ষোল ফিট উঁচু ঢেউ সমুদ্রের উপকূলবর্তী জায়গাগুলিতে আছড়ে পড়েছে। সঙ্গে ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে ঝড় আর প্রচণ্ড বর্ষণ একটানা ভাবে। তিনটি দ্বীপের অধিবাসীরা নিশ্চিহ্ন। অন্ততঃ তিন লক্ষ নর-নারী মৃত আর দশ লক্ষ মানুষ গৃহহীন। কম পক্ষে তেইশ লক্ষ মানুষ বিপন্ন।

পরবর্তী কয়েক দিনে একটু একটু করে ঐ সামগ্রিক ধ্বংসলীলার খবর আসতে লাগল। কাগজে, রেডিওতে, দেশী-বিদেশী সংবাদ সূত্রে, ছবির মাধ্যমে প্রকৃতির সেই রুদ্র তাণ্ডবের খবর দফায় দফায় আসছে। আর শুধু সীমা নয়। এপার বাংলার প্রতিটি নর-নারী যেন ওপারের তাদের ভাই বোনেদের এই দারুন দুর্দিন দেখে হতবাক্ হয়ে গেছে। সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে কিছু সাহায্যও গেল ওদেশে। সমুদ্রে শিশির বিন্দু হয়ত। তবু যতটুকু পারা যায়।

কয়েক দিন স্তম্ভিত থাকার পর পশ্চিম বঙ্গ আবার যেন স্বরূপ ধারণ করে। আবার খুন, জখম, বোমা, পাইপগান, ছুরি। পুলিশের গুলিতে পাঁচজন মৃত। দুই জন খুন। লবণ হ্রদ এলাকায় নকশাল ও পুলিশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ।

দিন কয়েক পরই আবার কাগজ খুলে চমকে ওঠে সীমা। বারাসতের আমডাঙ্গা অঞ্চলে বড় রাস্তার পাশে একটি বা দুটি নয় এক সঙ্গে এগারটি যুবকের মৃতদেহ। প্রত্যেকের হাত পিছনমোড়া করে বাঁধা, মুখে আলকাতরা লেপা যাতে চেনা না যায়। কারও কারও হাতে ঘড়ি—জামা কাপড় দেখে সবাইকে ভদ্র ঘরের ছেলে বলে মনে হয়। পুলিশী সূত্রের খবরের আভাস নকশাল বা সি. পি. এম-এর কাণ্ড। ফরোয়ার্ড ব্লক আর প্রমোদ দাশগুপ্তের মতে পুলিশের কাজ। বেলেঘাটায় চারজন ছেলেকে বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারার পর আর এক অপকীর্তি।

কাগজ পড়তে পড়তে সীমা নিজের অজ্ঞাতেই আর্তনাদ করে উঠেছিল, উঃ মাগো! কী ভীষণ কাণ্ড!

যতীশ আর রমা সামনে বসে পড়ছিল। বই খাতা ছেড়ে সীমার দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, কী-কী হল বড়দি?

সীমা কিছু না বলে কাগজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। ওর মুখ মণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

খবরটা পড়তে পড়তে রমা দাদা গো বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। যতীশেরও চোখ ছলছল করছে।

পিসে মশাইকে কোন মতে দুটি খাইয়ে রওনা করিয়ে দিয়ে বড় পিসি তখন রান্নাঘরে সীমাদের তিন ভাই বোনের অফিস আর স্কুলের ভাত নামাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। রমার কান্নার শব্দে তিনিও উদ্বিগ্ন মুখে দৌড়ে এলেন।

সীমার মুখে খবর শুনে রমার সঙ্গে বড় পিসিও বুক চাপড়ে কাঁদতে শুরু করলেন নীতুরে—ও নীতু! কোথায় গেলি আমাদের ছেড়ে!

সীমা ব্যস্ত ভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, চুপ কর পিসি। ওদের সনাক্ত করা যায়নি এখনও। এমন ভাবে কাঁদলে ওর অমঙ্গল হবে। ভাল করে না জেনে কেঁদো না। লোক জমে যাবে এক্ষুনি। গলা শুকিয়ে যাবার জন্য সীমা আর কিছু বলতে পারে না।

অমঙ্গল আশঙ্কায় হোক, অথবা অন্য কারণে বড় পিসি চেঁচিয়ে কাঁদা বন্ধ করেন। কিন্তু ফোঁপাতে ফোঁপাতে সীমার দুই হাত ধরে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলেন, কোন মতে একটা খবর এনে দে মা যে এর মধ্যে সে হতভাগা নেই। তা না হলে তো পারছি না মা। সে হতভাগা আমার থেকেও নেই যখন তখন তুই-ই বড় ছেলের কাজ কর। আমাকে বাঁচা।

এই আজকের পশ্চিম বঙ্গ ও বাঙালীর অবস্থা—সীমার মনে হয়। মেয়েদের এখন পুরুষদের সব কাজই করতে হয়। উপায় নেই অন্য। যতীশকে নিয়ে সম্ভব অসম্ভব অনেক জায়গায় ধর্ণা দিয়ে, অনেক দৌড় ঝাঁপ করে অবশেষে বিকেলের দিকে মর্গে হাজির হল ওরা। সারাদিন স্নানাহার হয় নি। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও পরিশ্রমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তবু এরই মধ্যে একে অপরকে সান্ত্বনা—ভরসা দিতে দিতে এক রকম পাথরে বুক বেঁধে মর্গের মৃতদেহগুলি দেখল।

জয় ভগবান! না, এদের মধ্যে কেউ নীতু নয়।

আশেপাশের ক্রন্দনরত মৃতদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও যেন বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেল ওদের। তবু—তবু একজনের কান্না যেন মর্মমূলে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। বিধবা প্রৌঢ়া মাথা খুড়ে কাঁদছেন, আমার একমাত্র ছেলে! ও-হো-হো-ভগবান, একি শাস্তি দিলে আমাকে? ট্যাক্সি মর্গ থেকে দ্রুত নেতাজী নগরের দিকে এগোলেও একমাত্র সন্তানহারা সেই বিধবার কান্না যেন সীমাকে পিছনে ধাওয়া করতে থাকে।

আবার নিত্যকার জীবনের আবর্তন।

তবে পশ্চিম বঙ্গের জীবন মানেই খুন আর হত্যাপ্রচেষ্টার কাহিনী। কাশীপুরে মার্কসবাদীদের সঙ্গে নকশালদের লড়াই। এক দিনে আটজন নিহত। বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর আর চাকদায় পুলিশের উপর হামলা, খুন। দুই জায়গায় কারফু। গোপীবল্লভপুরে পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত। সোদপুরে বোমা বিস্ফোরণে তিনজন মৃত। শুধু হত্যা আর রক্তপাত, শুধু মৃত্যুর ভয়ঙ্কর বীভৎস রূপ। যারা জীবিত তারাও ভীত সন্ত্রস্ত। চতুর্দিকের এত পুলিশ, সি. আর. পি এবং তাদের পিস্তল ও রাইফেলের আওতার মধ্যেও আতঙ্কের কাল কাল ছায়া।

রোজকার মত সেদিনও খবরের কাগজটা খুলতেই এক চমক। কিন্তু শুধুই কি চমক—কেবলই কি অসম্পৃক্ত বিস্ময়? তাহলে খবরটা পড়ার পর সীমার অজ্ঞাতে ওর চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দেবে কেন?

খাতা থেকে চোখ তুলতে যতীশেরই প্রথম নজরে পড়ল। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলনা ও। তাই বিমূঢ়ের মত বলল, একি—বড়দি কাঁদছ নাকি তুমি?

রমাও ধড়মড় করে বই থেকে মাথা তুলে তাকাল। তারপর আন্তরিকতা

CENTRAL LIBRARY

সহকারে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বড়দি—কোন খারাপ খবর নাকি ?

অপ্রতিভ ভাবে ম্লান হেসে সীমা শাড়ীর খুঁট দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখের কোণ মুছে নিল। তারপর ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল, ও কিছু নয়। নাও পড়ায় মন দাও সব। বাৎসরিক পরীক্ষার আর দেরী নেই।

যতীশ বলল, হ্যাঁ—যদি হয়।

রমা বলল, আমাদের স্কুলে হবেই। গার্জেনরা সব পাহারা দেবেন ঠিক হয়েছে, যাতে কেউ এসে হাঙ্গামা না করতে পারে। কিন্তু—কিন্তু কি হয়েছিল তোমার বড়দি ?

ম্লান হেসে সীমা এবার খবরের কাগজের সেই অংশটি ওদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখে নাও। তার বেশী পড়ার ক্ষতি করলে চলবে না।

দুজনেই ওরা খবরের কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পড়া শেষ হয়।

কাগজ থেকে মাথা তুলে যতীশ বলে, ও-একজন মারা গেছে। ওর কণ্ঠে এক রকম নৈর্ব্যক্তিক নিস্পৃহতা।

সীমা মনে মনেই হাসে। তবে দুঃখের হাসি। স্নায়ুর উপর একটানা ক্রমাগত আঘাতের ফলে মৃত্যু—এরকম মৃত্যুও মানুষের মনে আর আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারছে না। নচেৎ নিজের প্রাণ দিয়ে অপরের প্রাণরক্ষাকারী এই অমূল্য বাচার নাম পশ্চিম বঙ্গের এ কালের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার কথা। নিজের সন্তান অথবা আত্মীয় বন্ধুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা তবুও সম্ভব। কারণ পূর্ব পরিচয়ের জন্য তাদের জন্য মনে একটা দরদ থাকে, থাকে আবেগ। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাত এক পুলিশের অফিসার—যাকে জীবনে দ্বিতীয় বার দেখার সম্ভাবনাই ছিল না অমূল্য বাচার—নকশালপন্থী আততায়ীর হাত থেকে তাঁকে বাঁচানর জন্য ছুরিতে প্রাণ দেওয়া যে কত মহৎ আত্মদান একথা কত জন বুঝবেন ?

সত্যিই খুব বেশী লোক বুঝবে না—শুধু যতীশের মত ছেলেমানুষ কেন ? সীমার মুখে সেদিন অন্ন-জল বিস্বাদ হয়ে গেল। কাগজের খবরটি ওর মনকে যেন সম্পূর্ণ ভাবে অভিভূত করে রাখল। এন্টালির এক বস্তির বাসিন্দা দরিদ্র ছুতার মিস্ত্রি অমূল্য বাচা। স্ত্রী আর চারটি নাবালক ছেলে মেয়ের বাবা। কিন্তু কারও কথাই মনে ছিল না তাঁর একজনের প্রাণসংশয় চোখের সামনে দেখে।

সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মানুষটি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সশস্ত্র আততায়ীদের উপর একটি প্রাণ বাঁচাবার জন্য। সুতরাং তার যা অবধারিত পরিণাম তা-ই হল। হোক। কিন্তু এই অমূল্য বাচা আর সেদিন খড়দার যে নারায়ণ দাসের কথা শুনেছে, তিনি এবং এই রকম আরও দুই দশ জন মানুষ এখানে ওখানে জন্মান, মরে অমর হন বলেই না পৃথিবী এখনও বাঁচার মত জায়গা। এখনও ভরসা রাখা যায় বাঙালী আর তার ভবিষ্যতের উপর। এই অন্ধকারের ওপারে যে আলোর দেশ আছে, তার আভাস মেলে!

বাসের সমস্ত পথটা মনে মনে ছটফট করল সীমা। এন্টালির ঐ বস্তির ঠিকানাটা ওর মুখস্ত হয়ে গেছে। একবার যেতে হবে ঐ মহাতীর্থে, দেখতে হবে ঐ মহাপ্রাণের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের, পুণ্যাত্মার লীলা সঙ্গী হিসাবে যারা নিজেরাও পুণ্যবতী পুণ্যবান। কিন্তু একা একা তীর্থ সন্দর্শনে যাবে? না। তবে কে হবে ওর সঙ্গী—কার সঙ্গে মনোজগতে ওর সাযুজ্য আছে?

একটি-মাত্র একটিই মুখ ভেসে উঠল ওর মানসপটে। বলা বাহুল্য সে মুখ তমালের। তমাল হিংসাত্মক সমাজ পরিবর্তনে, সশস্ত্র বিপ্লবের নীতিতে বিশ্বাসী। তা হোক। ওর হৃদয় আছে—আছে দরিদ্র নিপীড়িতদের জন্য দরদ। বড় কথা, আরও হাজার হাজার ওর বয়সী যুবক যুবতীর মত নিজের পোষাক, ভোগ বিলাস অথবা কেরিয়ারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে' ও মহৎ এবং কল্যাণকর এক আগামী কালের স্বপ্ন দেখে, নিজের বিশ্বাস মত তার জন্য কাজ করে। আত্মদানের পথের পথিক তমাল নিশ্চয় আর এক চরম আত্মোৎসর্গকারী অমূল্য বাচার মর্যাদা বুঝবে। কিন্তু—কিন্তু এ হয়ত সীমার মনের অলীক আশা, মূঢ়তা। হয় হোক। এই অলীক আশার জাল বুনতেই ভাল লাগছে সীমার।

অফিসে পৌঁছাবার পরও স্বস্তি বোধ করল না সীমা। কি করে তমালকে অনুরোধ করবে ছুটির পর এন্টালীতে যাবার জন্য? ওর কাছে গিয়ে ওকে অনুরোধ জানান? না-না তা পারবেনা সীমা এমনি জোড়া জোড়া কৌতূহলী চোখের সামনে। বিশেষ করে মায়ার শানিত জিহ্বার প্ররোচনায় সে চোখ-গুলির কৌতূহল খানিকটা অসুস্থও বটে। তবে কি বন্দনার দূতীয়ালির সহায়তা নেবে? ব্যাপারটা এমন লঘু ভাবে নেবে বন্দনা এবং এত রঙ্গ ব্যঙ্গে মেতে উঠবে যে অমূল্য বাচার মৃত্যুর মত মহৎ শোকের সঙ্গে তা আদৌ খাপ খাবে না। তবে—তবে?

অনেক ভেবে একটা উপায় ঠাওরাল সীমা। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না এতে। মালহোত্রাজীর খাস পিওনকে অনুরোধ করা মাত্র কাজ হল। সে গিয়ে খবর দিল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ব্যস্ত পায়ে তমাল এসে হাজির। সীমার সামনে বসে বলল, কোন্ ব্যাপারটা আলোচনা করতে চান মিস্টার মালহোত্রা—আমাদের সেই সাত দফা দাবিটা, না বেহালার কারখানার সমস্যাগুলো? এরকম হঠাৎ ডেকে পাঠালেন—কিন্তু কমিটির অন্য সব মেম্বাররা না হলে একা কি করে আমি আলোচনা করি? ওঁকে খবর দাও···

সীমা কোন মতে উচ্চারণ করল, না—উনি আলোচনা করার কথা বলেন নি।

তবে? তমালের বিস্মিত প্রশ্ন।

সীমা লজ্জা ও সংকোচে যেন মরমে মরে যায়। উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে এ বদ খেয়াল না হলেই ভাল হত।

তমাল অধীর ভাবে বলে, তাহলে আমাকে ডেকে পাঠালে কেন?

বলতে বলতে সীমার চোখ মুখের দিকে নজর পড়ে তমালের। লজ্জা ও কুণ্ঠায় ওর ঘাড় ঈষৎ আনত। মুখমণ্ডল আরক্তিম। ঈষৎ স্ফুরিত ওষ্ঠাধর যেন কি বলি বলি করেও বলতে পারছে না।

কয়েক লহমা এক দৃষ্টিতে সীমার মুখের দিকে চেয়ে থাকার পর কোমল কণ্ঠে তমাল প্রশ্ন করল, আমার সঙ্গে কোন কথা আছে?

তমালের সহৃদয় কণ্ঠে পাষাণ প্রতিমা বুঝি প্রাণ পেল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

এবার আরও অন্তরঙ্গ ভাবে তমাল জিজ্ঞাসা করল, বল—কি দরকার।

ঠিক কি ভাবে কথাটা বলবে সীমা ভাবতে থাকে। ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।

সীমার নীরবতার ভিন্ন অর্থ করে তমাল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, কি—রেসিডেন্ট ডিরেক্টার কিছু বলেছে তোমাকে? মালহোত্রার মজা দেখিয়ে দেব তাহলে···

না-না, সীমা মৃদু আর্তনাদ করে ওঠে। কর্মচারী আর মালিকের সংঘর্ষ ছাড়া এ মানুষটা আর কিছু যেন জানে না জগতে। সাহনয়ে সীমা বলে, না—মিস্টার মালহোত্রা কিছু বলতে যাবেন কেন? আমি ডেকেছিলাম

একটা দরকারে—খুব জরুরী দরকারে। ছুটির পর আজকে একটু সময় হবে? এণ্টালীতে যাব। কথাগুলো উচ্চারণ করে সীমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছে আড় চোখে তমালের দিকে তাকায়।

ও এই ব্যাপার! বড় কিছু করার সুযোগ না পেয়ে, মালিক পক্ষকে শিক্ষা দেবার মত অবকাশ না পেয়ে তমাল যেন একটু হতাশ হয়। তারপর বলে, আগামী ইলেকশানের ব্যাপারে আলোচনা ছিল একটা···তা না হয় যাব না। একটু থেমে আবার ও যোগ করে, ঠিক আছে ছুটির পর নীচে থাকব আমি।

সীমা তাড়াতাড়ি যোগ করে, না-না, ঠিক ছুটির পর নয়—আরও পনের মিনিট পরে।

এক রকম চোরের মত পালিয়ে এসেছিল সীমা। মাসের প্রথম বলে হাতে টাকা ছিল। তমালের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে তিন খানা দশ টাকার নোট পাকিয়ে ছোট করে বছর চারেকের ছেলেটির ছোট্ট মুঠির মধ্যে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর কম্পিত মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, মাকে দিয়ে দাও গিয়ে। কি যেন কি ভেবে রুক্ষ চুল, গলায় কাছা দেওয়া শিশুটি দুটি বড় বড় চোখ তুলে শুধু সীমার দিয়ে চেয়েছিল। কাল যে আঘাত এসে নেমেছে ওর ছোট্ট জীবনে, তাতে ও যেন একেবারে হতবাক্ হয়ে গেছে।

ছেলেটিকে এক দিকে পাবার পরই কোন মতে নোট কয়খানি গছিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে পালিয়ে এসেছিল সীমা। যেন ও-ই কোন অপরাধ করেছে। কোরা থান পরা অবনতমুখী ঐ বিষাদ প্রতিমার হাতে এই সামান্য টাকা তুলে দেবার দুঃসাহস হয়নি সীমার। এণ্টালীর বস্তির ঐ ছোট্ট ঘরটিতে কালকের ভীড় আর নেই। দুই চার জন নিতান্তই আত্মীয় ও আপন জন যাঁরা, তাঁরাই আজ এসেছেন হয়ত। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি সীমা ঐ মূর্ত্তিমতী শোকের সামনে, শোকের জীবন্ত নিদর্শন ঐ ছোট্ট পরিবারটির ছোট্ট ঘরখানির আশেপাশে।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ওরা পথ চলছিল। কারও মুখে কথা নেই।

সীমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই অনেকক্ষণ পরে তমাল উচ্চারণ করল, আর এক জন শহীদ! তমাল একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করল। ওর কণ্ঠে অকৃত্রিম সহানুভূতি।

অমূল্য বাচার আত্মোৎসর্গকে তমাল যে ভুল বোঝে নি, এর জন্য সীমা মনে মনে খুশী হল। তবে উনি শুধু আর এক জন শহীদ নয়। কারণ শহীদ বলতে তমালেরা কি বোঝে তা সীমা জানে। সীমা তাই বলল, অপরকে মারতে গিয়ে মরার মত শহীদ কিন্তু ইনি নন, রাজনৈতিক আন্দোলনের কল্যাণে আজকাল প্রায়ই যা আমরা দেখি। মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদ উনি। একটু থেমে সীমা আবার যোগ করল, প্রাণ নেবার প্রয়াসের চেয়ে প্রাণ বাঁচাবার প্রচেষ্টা যে অনেক মহৎ তা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। সীমার কণ্ঠ আবেগে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

পথ চলতে চলতেই তমাল পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সীমার দিকে চাইল। আন্তরিক দরদ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ ওর মুখমণ্ডলে। সামনে একটি দরদী ও শ্রদ্ধালু মন এবং একটু পূর্বেকার পরিবেশের প্রভাব—সব মিলিয়ে এমন একটা অবস্থা যে তমালের আর তর্কে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা হল না।

আরও বেশ কিছুক্ষণ ওরা নীরবে পথ পরিক্রমা করল। তারপর এক সময়ে স্বগতোক্তির মতই সীমা বলল, মহৎ মানুষ, মহান চরিত্র না হলে আদর্শ সমাজ হবে না। এঁরা সেই মহৎ মানুষ।

সায় দিয়ে তমাল বলল, মহৎ চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা আমরাও স্বীকার করি। সমাজবাদী পুনর্গঠনের জন্য এটা দরকার। তবে পরিবেশ না বদলালে —সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শোষণ প্রক্রিয়া বন্ধ না করলে এটা হবে না।

মৃদু প্রতিবাদের সুরে সীমা বলল, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা না পাল্টালে চরিত্রের উন্নতি হবে না—এ কেমন কথা? তাহলে অমূল্য বাচারা আসেন কি ভাবে? আর তাঁদের ভূমিকাই বা কি? এর উল্টোটাও দেখুন। চরিত্রের অভাবে আপনাদের দলে আসার পরও রামনগিনাজী'র ভূমিকা, আর তা ছাড়া—তা ছাড়া···। একটু ভেবে নিয়ে সীমা আবার বলতে লাগল, মহৎ ও আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি আগে না হলে সমাজের পরিবর্তন আনবেন কারা? আর কোন মতে যদি পরিবর্তন আসেই তবে সেই পরিবর্তনকে ধরে রাখবেন কারা এবং কি ভাবে?

তাহলে তুমি বলতে চাও···

উদাহরণটা ঠিক হবে কিনা জানি না, তবে কংসের কারাগারেই কৃষ্ণকে জন্ম নিতে হবে আর বড় হতে হবে। কংসের রাজত্ব যাবার জন্য যদি কৃষ্ণের জন্মকে অপেক্ষা করতে হয় তাহলে তো সে কাজ হয় না।

তমাল জবাবে কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওরা আচার্য জগদীশচন্দ্র রোডে পৌঁছে গেছে। অমন ধীরে চলার কথা নয়, তবু একখানা বালিগঞ্জগামী ট্রাম আসছে যেন হোঁচট খেতে খেতে। পুরো রাস্তাটাই প্রায় খোঁড়া—ট্রাম লাইনের কতকাংশও। সারি সারি সাড়ি সামনে আরও অনেক বাস ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে।

দ্রুত পায়ে ট্রামটির দিকে এগোতে এগোতে সীমা বলল, চলুন উঠে পড়া যাক।

তমাল বলল, চল—আমরা তো এরকম বাস ট্রামে হর-হমেশাই উঠছি। এখন তুমি পারলে হয়।

সীমার ঠিক পিছন পিছন ট্রামের ফুটবোর্ডে পা রেখে তমাল সকৌতুকে বলল, পেরেছ দেখছি। আমার ভয় ছিল নেতাজী নগর বাসস্ট্যাণ্ডে সেই প্রথম দিনের মত···

সলজ্জ হেসে সীমা বলল, এখনও মনে রেখেছেন সে কথা? কলকাতায় তখন নতুন এসেছিলাম···

এখন বুঝি খুব পুরান, একেবারে কলকাত্তাইয়া হয়ে গেছ?

কিন্তু পরের সে রসিকতা সীমার বোধহয় কানে গেল না। এক মধুর অতীত স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় একটা অব্যক্ত আনন্দ ওর মন ভরে উঠল। সমস্ত দিনের চাপা বিষণ্ণ ভাবটা কেটে অনাবিল পুলকে ভরে উঠল ওর অন্তর।

ছোট পিসি লিখেছেন,···ওরা ভেবেছিল খালিশপুরের মত আওয়ামী লীগের কর্মীদের খুন ও সমর্থকদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে বিজয়ী হবে। কিন্তু দেখলি তো পূর্ববঙ্গের জাগ্রত জনমত তা হতে দেয়নি। শুধু প্রাদেশিক পরিষদেও নয়, পাকিস্তানের গণ পরিষদেও ও-দেশের জনমতের প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোটি কোটি কণ্ঠে একটি নাম—মুজিবর রহমান। শেখ সাহেবের দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে নূতন সংবিধান রচনা করতে হবে—পূর্ববাংলা আর পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হয়ে থাকবে না। এর নাম বিপ্লব, যার ফলে মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন হয় এবং এর হাতিয়ার ছুরি-বোমা-লাঠি নয়, জনমত। কিন্তু হায়, এই বাংলায় আমরা কি করছি?···"

চিঠির উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সীমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই বাংলায় আমরা যা করছি তার খবর তো গত কয়েক দিনের সংবাদপত্র জুড়েই রয়েছে। ঐ একই সময়ের ঘটনা।

কলকাতা ও জলপাইগুড়িতে পুলিশ অফিসার খুন, প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরী তছনছ। প্রেসিডেন্সী জেলে নকশাল বন্দীদের আক্রমণে শতজন কারারক্ষী আহত। কলকাতা ও হাওড়ায় হাঙ্গামায় পাঁচ জন নিহত। নবকংগ্রেসের পথসভা আক্রান্ত, কংগ্রেসের গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ। জোড়াবাগানে সি. পি. এম ও ফরোয়ার্ডব্লকের সংঘর্ষ ও বোমাবাজী। মেদিনীপুর জেলে নকশাল ও কারারক্ষীদের মধ্যে সংঘর্ষে সাতটি তাজা প্রাণ গেল। সরকারী বক্তব্য বন্দীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু সরকারের সতর্ক প্রহারা এড়িয়ে বার বার তারা জেলে অস্ত্র নিয়ে যায় কি করে? এ প্রশ্নের জবাব কেউ দেবেন না। পূর্ণ সিনেমার সামনে সন্ধ্যা বেলায় একজন ট্রাফিক পুলিশ আক্রান্ত ও নিহত। শত শত দর্শক ঘটনার নিষ্ক্রিয় সাক্ষী। বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটারীতে অধ্যাপক ছুরিকাহত। বারাসতে এগারটি মৃতদেহ প্রাপ্তির ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের বৃদ্ধ বিচারক সকালে বেড়াবার সময় মারাত্মক ভাবে ছুরিকাহত। রায়গঞ্জে পুলিশের হেফাজত থেকে তের জন কয়েদী ছিনতাই। বৈঁচিতে চালের চোরাচালানকারীরা পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে বন্দুক ব্যবহার করেছে।

আর কোনও খবর? আছে। সি. পি. এম সহ আট পার্টি অবিলম্বে পশ্চিম বঙ্গে নির্বাচন চায়। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি লোকসভা বাতিল করে দিলেন। অন্তবর্তী নির্বাচন হবে।

আর কোনও খবর নেই? এই মারামারি কাটাকাটির খবর অথবা গদিতে বসার সংবাদ ছাড়া অন্য কোন সমাচার যাতে মনে হয় এই অন্ধকার এবার শেষ হবে—আশা জাগে মানুষের উপর, তার ভবিষ্যত সম্বন্ধে? আছে-আছে, তাও আছে। খবরটা মনে পড়ে যেতেই সীমার বক্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে। আর একটি নাম বার বার মনে পড়ে—দীনেশ মুখোপাধ্যায়···দীনেশ মুখোপাধ্যায়, আর তাঁর শান্তিসেনাদের পদযাত্রা।

হুগলী থেকে বেরিয়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরের সব কয়টি শহর হয়ে কলকাতায় প্রবেশ। আর এই সব কয়টি শহরেই এখন খুনোখুনী চলছে—নিত্য ছুড়ি; বোমা অথবা পাইপ গানে নিহত অথবা আহত হবার খবর। এর মধ্যে

"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস" ? শান্তিসৈনিকেরা কিন্তু আদৌ তা মনে করে না। তাদের বক্তব্য—এই অশান্তি মানুষের সমাজের স্থায়ী অবস্থা হতে পারে না। মানুষ চায় শান্তি এবং আজকের অবস্থায় ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে অন্ধকার কোণ খুঁজলে তা পাওয়া যাবে না। নির্ভয়তা দ্বারা তা অর্জন করতে হবে। মাভৈঃ ! তাই অনন্ত পথিকদের মতই, "তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে বলে গেল ভালবাসো—। অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।"

অভিভূত, মন্ত্রমুগ্ধের মত রোজকার কাগজে সীমা শান্তি সৈনিকদের পদ-যাত্রার কাহিনী পড়েছে। অধিকাংশ জায়গাতেই ওদের জীবন-কাঠির স্পর্শে মানুষ ভয়ের রাক্ষসীর মায়াজাল মুক্ত হয়েছে। খবর পড়ে সীমা উল্লসিত হয়েছে। কোথাও কোথাও না বুঝে শান্তি সৈনিকদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করা হয়েছে। দুঃখ বেদনায় সীমার বুক যেন ভেঙ্গে গেছে। বাঁধাঘাটে তাঁদের আঘাত দেবার জন্যই যেন তাঁদের পৌঁছাবার আগের দিন গান্ধীজীর মূর্তি ভাঙ্গল কারা।

বড়দিনের দুই দিন আগে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বসে বসেই নজরে পড়ল সীমার। গান্ধী মূর্তির কাছে ছোটখাট একটি ভীড়। শুভ্র পোষাকধারী একদল তরুণ তরুণীর গলায় গাঢ় হলুদ গাঁদা ফুলের মালা। নির্মল আকাশের নীচে সোনালী রৌদ্রে মনুষ্যমূর্তিগুলি যেন ঝলমল্ করছে। সীমার বুক উত্তাল হয়ে উঠল—হুগলীর শান্তি সৈনিক এরা। কাগজে দেখেছে আজ এখানে ওদের যাত্রার বিরতি হবার কথা।

কে একজন বললেন, ঐ ঐতো অন্নদাশঙ্কর—পদযাত্রীদের অভ্যর্থনা করছেন।

আর ঐ শাড়ী পরা বিদেশিনী ?

লীলা রায়—অন্নদাশঙ্করের সহধর্মিনী। আর এক জন জবাব দিল। ঐ তো শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, বিচারপতি।

ঐ যে চারু ভাণ্ডারী···শক্তিবাবু···মৈত্রেয়ী দেবী···গৌরী আইয়ুব···

অনেকে এসেছেন শান্তি সৈনিকদের অভ্যর্থনা জানাতে।

সীমার ইচ্ছা হল এক লাফে বাস থেমে নেমে পড়ে সমবেত মানুষদের সঙ্গে অভীঃ মন্ত্রের উপাসক—এই ভয়ের রাজত্বে নির্ভয়তার প্রত্যক্ষ প্রচার-কারীদের অভিনন্দন জানায়। কিন্তু অফিসযাত্রীদের প্রচণ্ড ভীড়ের জন্য বাস

থেকে তখন নামা সহজ নয়। আর সিগন্যাল পেয়ে বাসও চলা শুরু করল। যতক্ষণ পারে সীমা তাই ঘাড় বেঁকিয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল। রৌদ্রস্নাত নীল আকাশের নীচে পদযাত্রী গান্ধী মূর্তির পাশে সত্তর সালের মহাপদাতিকদের সংবর্ধনা। শুভ্র খদ্দরের পোষাকের উপর গাঢ় হলুদ গাঁদা ফুলের মালা। গলায় হলদে রুমাল আর হাতে হলদে খদ্দরের পটি—শান্তি সৈনিকদের অভিজ্ঞান। সব কিছুর উপর সোনালী রোদ পড়ে ঝল্‌মল্ করছে।

শুভ সংবাদ। যীশুর জন্মদিন থেকে হুগলীর শান্তি সৈনিকদের মশাল কলকাতার শান্তি সৈনিকেরা তুলে নিলেন। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় তাঁদের পদযাত্রা চলবে। অশান্তির বিরুদ্ধে অভিযান চলবে শান্তির বাণী নিয়ে। প্রেম আর ভালবাসার বাণী দিয়ে হিংসা আর হানাহানিকে জয় করার সাধনা চলবে।

কলকাতা এখনও অশান্ত, এখনও রক্তপিপাসু।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার মধ্যে বাড়ীর কাছে খুন হলেন।

-সত্তর সাল শেষ হয়ে গেল। (ক্রমশঃ)

———

পুরাতন সংখ্যা আলেখ্য

এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে।

মূল্য ঃ সাধারণ সংখ্যা প্রতিকপি—দেড় টাকা

বিশেষ সংখ্যা ,, —তিন টাকা

বাঁধানো আলেখ্য-র সেট

১ম থেকে ৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রতি খণ্ড চোদ্দ টাকা

যোগাযোগ করুন—

প্রকাশক, আলেখ্য

৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিকাতা-৩২

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথাসাহিত্যের সুর ও কাব্যসম্পদ

ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

॥ ১ ॥

১৩২৩ (১৯১৬) সালের কথা। এক আষাঢ়ী বাদল রাত্রে মৈমনসিংহ জেলার মশাখালী হাটখোলায় শুনিয়াছিলাম 'সুনাই সুন্দরী' পালা গান। গায়ক সুরথ মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত বাব্‌রার হাওড়ের নিকটবর্তী কংসাই নদীর তীরে দীঘলহাটি গ্রামের ঘটনা অবলম্বনে তৎকালেই কোন পল্লী কবি পালাটি রচনা করিয়াছিলেন। পরের দিন গফরগাঁও বাজারে শুনিলাম 'বাইস্থানী মউয়া (মহুয়া)' পালা,—নেশা বেশ জমিয়া উঠিল। পরবর্তী পাঁচ বৎসর যখনই ঐ দেশে যাইতাম, খোঁজ করিয়া গায়েনের মুখে ঐ শ্রেণীর পালা শোনা আমার একটা লোভের বিষয় ছিল।

১৯২৩, বক্সা ডিটেন্‌শন্ ক্যাম্পে আমি বন্দী। একদিন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেখিলাম, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নাম দিয়া তেরটি প্রাচীন পালাগান প্রকাশ করিয়াছেন। অতিশয় আগ্রহ সহকারে বইখানা আনাইয়া পড়িয়া হতাশ হইলাম। তেরটি পালার আটটি পালা আমার শোনা ছিল। কোনো কোনো পালা দুই তিন বার শুনিয়াছি। সেই শোনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলাম, পালা-গুলির অনেক কিছু বাদ গিয়াছে, বর্ণনায় ঘটনা পারম্পর্য ও সামঞ্জস্য অনেক জায়গায় নাই, একজনের কথা আর একজনের মুখে চলিয়া গিয়াছে, এইপ্রকার অনেক কিছু অসুবিধা।

ক্যাম্প হইতে পরপর দুইখানা পত্র সেন মহাশয়কে লিখিয়া কোন উত্তর না পাইয়া মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, আমি যদি কোনোকালে স্বাধীন ভাবে নির্বিবাদে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ পাই, তবে নিজে পালাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে আমি সংকল্প পূরণের সুযোগ পাই নাই। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের হাঙ্গামা স্তিমিত হইলে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জীবিকা হিসাবে

শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ গ্রহণ করিয়া পালার সন্ধানে প্রথমেই গেলাম মৈমনসিংহ জেলায় সেরপুর। ইহার মধ্যে মাননীয় ডঃ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় আরও তিনখণ্ড 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' প্রকাশিত হইয়াছিল, সে তিনখণ্ড গীতিকায় প্রকাশিত পালাগুলিরও 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রকাশিত পালার মত অবস্থা, অধিকন্তু কতকগুলি পালা অসম্পূর্ণ।

১৯৩৪ হইতে ১৯৬৬ এই বত্রিশ বৎসরের প্রথম দিকে বাইশ বৎসর আমার পালা অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল মৈমনসিংহ, ঢাকা,ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার পল্লী অঞ্চলে, পরে পূর্ববঙ্গ হইতে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে। এই অনুসন্ধানকালে আমাকে বহু 'গায়েন' ও 'বয়াতী'র সঙ্গে দেখা করিতে হইয়াছে। কারণ, পালা ও গানগুলি পাওয়া যায় গায়েন ও বয়াতীদের লিখিত খাতায়।

রামায়ণ ও পদকীর্তন গায়কদের মত যাঁহারা দল ও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সমগ্র পালা আসর বসাইয়া গান করেন তাঁহাদিগকে গায়েন বলা হয়। বয়াতীর কোনো দল থাকেনা; একখানা বেহালা, সারিন্দা বা দোতারা হাতে করিয়া বাজাইয়া গানে তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ।

মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর এবং বরিশাল, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার উত্তরাংশের পল্লী সঙ্গীতের সুর সাধারণত 'ভাটিয়ালী' নামে বিখ্যাত। ইহা ছাড়া ত্রিপুরা জেলার পল্লী অঞ্চলে 'মুড়াই', নোয়াখালী জেলার 'সাওরী' ও চট্টগ্রামের সমুদ্র-উপকূলবর্ত পল্লী অঞ্চলের 'হালদাফাটা' সুরও প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন। এই সমস্ত সুর সম্পর্কে অভিজ্ঞ গায়েন ও বয়াতীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শুনিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গের পদকীর্তন সুরে যেমন 'গরাণহাটী,' 'রেণেটী', 'মন্দারিণী', 'ঝারখণ্ডী' ও 'মনোহরসাহী' নামে পাঁচটি বিখ্যাত 'ঢং' আছে, ভাটিয়ালীতেও সেই প্রকার 'সুষঙ্গী', 'তাওয়াইল্যা', 'বিক্রমপুইর‍্যা', 'বাখরগঞ্জ্যা' ও 'গোপালগইঞ্জ্যা' নামে পাঁচটি 'ধাঁচ্' আছে। কীর্তনে যেমন এক অঞ্চলের ঢং আর এক অঞ্চলের অধিবাসী গায়কের কণ্ঠে ভালো উৎরায় না, ভাটিয়ালীর ধাঁচও ঠিক ঐ প্রকার, সুষঙ্গী ধাঁচ বিক্রমপুরের গায়কের কণ্ঠে উৎরায় না।

ভাটিয়ালী সুরের প্রতিটি ধাঁচেই—'ঝাঁপ', 'সারী', 'বিচ্ছেদ' ও 'ফেরুসাই' নামে চারটি 'লহর' আছে। ধাঁচ নির্ভর করে গায়কের উচ্চারণ ভঙ্গীর উপরে। এই কারণে একই রচনা বিভিন্ন অঞ্চলের গায়েনের খাতায় ক্রিয়া

বিভক্তির রূপান্তর দেখা যায় এবং এই বিভক্তির রূপান্তরের জন্য ভাষারও রূপান্তর ঘটে। লহর নির্ভর করে গানের বিষয়বস্তুর রসের উপরে। সাধারণত ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক গানে ঝাঁপ ও সারী লহর ব্যবহার হয়। এই লহরে গানের ছন্দেরও বৈশিষ্ট আছে। অভিজ্ঞ গায়ক অনেক সময় মূল রচনায় 'না, ঐনা, এই না, রে, আরে,' প্রভৃতি নিরর্থক শব্দ সংযোজনা করিয়াও লহর বাঁধেন। বিচ্ছেদ লহর এক মাত্র করুণ রসাত্মক গানে ব্যবহার হয়। বিচ্ছেদ লহর গাহিবার সময় গায়েন বা বয়াতী সারিন্দা অথবা বেহালা ভিন্ন অপর কোনো বাদ্য যন্ত্র বাজাইতে দেন না। ফেরুসাই লহর সব রকম রসেই চলে, তবে করুণ রসে 'মধ্যাবস্থা' প্রাপ্ত হয় বলিয়া মনে করি।

পশ্চিমবঙ্গের পদকীর্তনের বিখ্যাত ঢংগুলি বর্তমান যুগে বিলুপ্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। এখন যাহা শোনা যায়, উহা মাদ্রাজী 'ঢপ্' গানের সুরের সঙ্গে মনোহরসাহী ঢংএর সংমিশ্রণ। পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী সুরেরও এই অবস্থা হইতে চলিয়াছে লক্ষ্য করিয়া গত বৎসর স্বাধীন বাংলাদেশের এক প্রখ্যাত কবিকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আট মাস পরে কবি পত্র দিয়া জানাইয়াছেন, ভাটিয়ালী গানে বিচ্ছেদ লহর ছাড়া আর কোনো লহর বা ধাঁচের কথা তিনি কোথাও শোনেন নাই। দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' তিনি পড়িয়াছেন এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'ও পড়িয়াছেন। তাহাতে প্রকাশিত পালাগুলি সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য,—'পালার গল্পগুলি মনোরম, কিন্তু উহার মধ্যে কোনো কাব্যসম্পদ আমি পাই নাই।' তাঁহার প্রথম মন্তব্যে বুঝিলাম, সহরবাসী ধনী বৃদ্ধ কবি গ্রাম্য গায়েন ও বয়াতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নহেন। তাঁহার দ্বিতীয় মন্তব্যে বিস্মিত হইয়া যে উত্তর দিয়াছি, তাহাই এখানে পাঠক সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

কাব্যের প্রাণ তাহার ছন্দলালিত্য, উপমা ও বর্ণনায় ব্যঞ্জনা। এই তিনটি ব্যাপার সংস্কৃত কাব্যালঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যবিচারে প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমার দৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীকবি রচিত গাঁথা কাব্যগুলি এই তিনটি ব্যাপারে সুসমৃদ্ধ।

আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'* প্রথম খণ্ডে 'শ্যাম রায়' পালায় যে তিনটি বিশেষ সুরছন্দ দেখা যায়, তাহার নাম প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে নাই। পূর্ববঙ্গে বয়াতীদের মুখে শুনিয়াছি ঐগুলি ঝাঁপ ও সারীর মিশ্র লহর। এখানে উহার নিদর্শন দিতেছি।—

* দ্রঃ লেখকের 'প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা'—পাঁচখণ্ড; প্রকাশক: ফার্মা কে, এল মুখোপাধ্যায়।

১। ভরা ভাদরে আইলা দুতী লো,
আ-লো দূতী, মাইঝ গাঙ্গে মোর চরা।
কোন ছলে যাইবাম্ জলে কলসী আমার ভরা লো—
আমি দূতী পরের অধীন রে ॥ ৩৪৩ পৃঃ, ১মঃ খঃ

২। পন্থ ছাড় রে শ্যাম রায়।
পন্থ ছাইড়্যা সইরা যাওরে, আমার জল আননের সময় যায়।—ধুয়া
আমি ত ডোমের নারী রে বন্ধু, তুমি হাত দিও না গায়।
ছোটোর সঙ্গে বড়োর পিরিত, বড়োর জাতি যায়—রে বন্ধু,
হাত দিও না গায়। পন্থ ছাড় ॥ ৩৪৭ পৃঃ।

৩। পাছ দোয়ারে আনাগুনা খেজালতে মরি।
রাজার ছাওয়াল হয়্যা রে বন্ধু, ক্যানে পরের ঘরে চুরি—
রে বন্ধু, আমি খেজালতে মরি ॥ ৩৪৮ পৃঃ। ১মঃ খঃ

আর একটি অপূর্ব ঝাঁপ লহর আছে তৃতীয় খণ্ডে 'সুনাই সুন্দরী' পালায়। হবিগঞ্জের দীনু গায়েন বলিয়াছিলেন, এটি দোলান-ঝাঁপ' নামে বিখ্যাত।—

৪। 'জল ভর জল ভর কইন্যা, তুমি জলে দিছ মন।
ঘাটের পাড়ে রইছি আমি না দেখ এক ক্ষণ।
একবার মুখ তুইল্যা রে,
একবার নয়ান চাইয়া রে,
একবার আমায় দেইখ্যা রে,
হাসি মুখে কও না কথা আমি যাই ফিরে ॥' ৩০৭ পৃঃ, ৩য়ঃ খঃ।

পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলেও বহু প্রকার সুর শোনা যায়। 'মুড়াই', 'সাওরী' ও 'হালুদা ফাটা'—এই তিনটি নাম ছাড়া আর কোনো সুরের নাম আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মুড়াই সুরের গান পার্বত্য ত্রিপুরা জেলার পল্লী অঞ্চলে শোনা যায়। 'মুড়া' শব্দটির অর্থও ঐ অঞ্চলে—পাহাড়। এখানে মুড়াই সুরে গানের একটি নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি, ইহার ছন্দ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।—

৯। 'ভোজের বাজি দুনিয়া রে কেবল বেড়া জাল।
কাড়াকাড়ি মারামারি আর কত জঞ্জাল।
মিছা রাইজ্য মিছা ধন মিছা ট্যাকা কড়ি রে
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥'
৫মঃ খণ্ড, পরীবানু পালা।

'সাইগরী' বা 'সাওরী' পূর্বদক্ষিণ বঙ্গে সমুদ্রোপকূলোবর্তী জেলে ও নৌকায় মাঝি-মাল্লাদের গানের সুর। এই সুরে বহুপ্রকার ছন্দবৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এখানে আমরা দুইটি ছন্দ দিতেছি। —(বন্যার বর্ণনা)

১০। 'ওরে—হাইলা চাষার মারে জালা, পানির ঠ্যালা, ধানের ঝরে ফুল।

ঢলর পানিত্ মরে মানুষ, হাঁতুরি ন পায় কূল ॥
ভাসিগেল্‌গৈ যত ক্ষেতি, ফেইন্যা বেতি, বাঙ্গমালী বালাম্।
চিন্নাল, গিরিম্; বিন্নি, পিড়ম্; কত কইব আর নাম ॥'

১১। 'ওরে, পুষ মাইস্যা শীতরকাল, হাঁতুরি বাইলাম টোঁইয়া জাল,
করণখালীর দহিন্ দি, বোসাই আইলাম বিয়ান দি,
জালত্ বাইজ্‌ল ইচা, বাইলা, কোড়াল বোয়াল।
পুষ মাইস্যা শীতর কাল ॥'

'হাল্‌দাফাটা' ছন্দের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নাই। 'হালদা ফাটা শব্দটির প্রকৃত অর্থ,—চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্রোপকূলবর্তী জোয়ার-ভাঁটার স্রোতে ভাঙ্গা অসমতল জমি। এই জমির সঙ্গে ছন্দটির সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বোধহয় ইহার হালদাফাটা নাম হইয়াছে। 'রাজা তিলক বসন্ত' পালা হইতে এই ছন্দের একটা নমুনা দিতেছি।—

১২। 'রাজার এক কন্যা সাত পুত্র আন্ধাইর ঘরর বাত্তি।
হাসিতে রতন ঝলে কান্দিতে মাণিক জলে
এইমন সোন্দর কন্যা তিরভুবনে নাই ॥
মাথার কেশ ভূমিত্ পড়ে সাজন-পাড়ন তেল-সিন্দুরে
আবিয়াত কন্যা।
কত আইয়ে কত যায়, রাজা না পছন্ত তায়,
কত রাজপুত্র ফিয়্যা ফিয়্যা যায় ॥' ৮মঃ খণ্ড।

শুনিয়াছি এই ছন্দে যিনি গান রচনা করেন, তিনি নিজেই গানের সুর বাঁধিয়া দেন।

'ঝাঁপ' ও 'সারী' লহরের ভাটিয়ালী গান মিশ্র ধাঁচে প্রায়ই রেডিওতে শোনা যায়। পশ্চিম বঙ্গের 'তোটক' ছন্দের সঙ্গে সারী ও ঝাঁপের কিছু সাদৃশ্য আছে।

ফেরুসাই লহরে ছন্দের ছত্রে অক্ষর সংখ্যার কোনো নির্দ্দিষ্টতা নাই, কিন্তু ছত্রের শেষে মিল থাকে। দৃষ্টান্ত—

'নয়া বাড়ী লয়্যা রে খাইন্তা বানাইল জুইতের ঘর।
লীলুয়া বয়ারে কন্যার গায় উইঠ্‌ল জ্বর॥' ১মঃ খঃ, ১৬ পৃঃ।

এখন হয় কিনা জানি না, প্রাক্‌ষাধীন যুগে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে গ্রামাঞ্চলের কৃষকেরা উপযুক্ত গায়েন আনিয়া 'মহুয়া, মলুয়া, কাঞ্চনমালা,' প্রভৃতির মত করুণরসাত্মক পালা, যে পর্যন্ত বৃষ্টি না নামে সে পর্যন্ত, প্রতিদিন সন্ধ্যারাত্রে গান করাইতেন। এই উদ্দেশ্যের গানে একটি বিশেষ ধুয়া গানের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইত। ধুয়াটি—

'ও কাণা মেঘারে, তুই না আমার ভাই।
এক লোছা পানি দে, একমুইট ধানের ভাত খাই॥' (দক্ষিণ অঞ্চল)

অঞ্চল বিশেষে ইহার পাঠান্তর আছে,—

'ও কাণা মেঘা রে, একবার ফিইর‍্যা চা,
এক মুইট ধানের ভাত খাই॥' (ঢাকা ও ময়মনসিং জেলা)

এই প্রকার গানে বৃষ্টি নামে কিনা, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ আমার হয় নাই, তবে শ্রোতা সাধারণের অশ্রুধারা যে নামে, এবং গান শেষ হইলে আসর ছাড়িয়া যাইবার জন্য হৈ হৈ হড়াহুড়ি না করিয়া দুই-তিন মিনিট সকলেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন, ইহা প্রতিটি আসরেই লক্ষ্য করিয়াছি।

পূর্ববঙ্গে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত লম্বা তিন-চার হাত প্রস্থ, দ্রুতগামী হাটুরে নৌকার চল্লিশ-পঞ্চাশখানা হাত বৈঠার তাল রাখিবার জন্য, এবং দালান-বাড়ীর ছাদ পিটাইতে পিটুনীর তাল রাখিবার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া বয়াতী রাখা হইত। বড়ো বড়ো জোতদার কৃষক তাঁহাদের ক্ষেত নিড়ানো ও পাট ধুইবার সময় শ্রমিকদের শ্রম লাঘবের জন্যও বয়াতী নিযুক্ত করিতেন। এইসব ব্যাপারে বয়াতী নিজের পছন্দ মত 'ছুটা' সারী, ঝাঁপ ও ফেরুসাই লহরের গান করেন। একমাত্র 'শ্যামরায়' ও 'আন্ধা বন্ধু' পালা ছাড়া অপর কোনো পালা গান এই সব ব্যাপারে শোনা যায় না।

ভাটিয়ালী ও দক্ষিণ অঞ্চলের হালদাক্ষাটা প্রভৃতি সুর নারীকণ্ঠে প্রায়ই উৎরায় না কারণ, কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামের না হইলে এইসব সুর খোলে না। সে জন্য পূর্ববঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে পল্লীমহিলাদের মধ্যে 'হাঁওলা' ও 'ভাওয়াইয়া' নামে দুইটি সুর প্রচলিত ছিল। এই 'ভাওয়াইয়া' কিন্তু উত্তর বঙ্গে 'রাজবংশী'

জাতির মধ্যে প্রচলিত 'ভাহইয়া' সুর নহে। উত্তর বঙ্গে 'ভাহইয়া' ও 'গোয়ালপাড়িয়া' নামে দুইটি বিখ্যাত প্রাচীন পল্লী সুর আছে। এই দুইটি সুরের চর্চায় আসাম গৌরীপুরের রাজবংশ বিখ্যাত।

ভাটিয়ালী সুরের যে পাঁচটি আঞ্চলিক ধাঁচের কথা লিখিলাম উহার পার্থক্য একই গান বিভিন্ন অঞ্চলের গায়কের কণ্ঠে না শুনিলে বুঝা যাইবে না। পশ্চিম বঙ্গে পদকীর্তনের ঢংগুলিও এই প্রকার।

॥ ২ ॥

কাব্যবিচার-শাস্ত্রানুযায়ী 'উপমা-অলঙ্কার', নায়ক-নায়িকার বক্তব্যে 'রসব্যঞ্জনা' ও ব্যঞ্জনার 'ধ্বনি ধ্বন্যন্তর' প্রভৃতিতেও পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লী গাথা সাহিত্য সমৃদ্ধ। স্তবক এখানে 'কুমার বীর নারায়ণ' পালা হইতে ছয়টি স্তবক উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রথম ও ষষ্ঠ ছন্দের 'রূপক' অলঙ্কার ও ব্যঞ্জনায় ধ্বনি-ধ্বন্যান্তরাদি দেখিতে চেষ্টা করিব।

নায়িকার রূপ বর্ণনায় নায়ক বলিতেছেন,—

'তোমার না চান্দমুখ লো কইন্যা, যেমুন পরভাতে পউদ্ম ফুল।
আশমানের কালা মেঘ লো কইন্যা, দেখি তোমার মাথার চুল ॥ ১
কাউয়া কালা কৌইলা কালা চৌখের কাজল কালা বেশ।
তার থিক্যা অধিক কালা কইন্যা, তোমার চাচর কেশ ॥ ২
পরভাইত্যা আশমানের তারা কইন্যা, তোমার দুইডা আঁখি।
আষাঢ় মাইস্যা পউদ্মের নাল কইন্যা, তোমার হস্ত দেখি ॥ ৩
কুইঙ্গ রাঙা সিন্দুর লো রাঙা রাঙা তেলা কুইচ্যার ফল।
তার থিক্যা অধিক রাঙা কইন্যা, তোমার ঠোঙ যোগল ॥ ৪
হস্তের আঙ্গুলি লো তোমার যেমুন আশ্বিন্যা চম্পার কলি।
কণ্ঠে ত শুনি লো তোমার চৈত্তি কোয়েলার কাওয়ালি ॥ ৫
মাঘ মাইস্যা শোনের ফুল লো, সোনার বরণ চুরি করে।
তোমার অঙ্গে কাঞ্চা সোনা কইন্যা লুকায় চোরের ডরে ॥ ৬

৬ষ্ঠঃ খঃ, ৩২-৩৩ পৃঃ।

প্রথম ছন্দে নায়িকার মুখ-সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে উপমায় নায়ক 'চান্দমুখ' ও 'পরভাতে পউদ্ম ফুল' এবং কেশের বর্ণনায় 'আশমানের কালা মেঘ' উপমা ব্যবহার করিয়াছেন।

এখানে 'চান্দমুখ' শব্দে উপমান চন্দ্রের সঙ্গে উপমেয় মুখের যে উপমা, ইহার উপমিতি দুইটি কারণে 'সামান্যত রূপক-অলঙ্কার' শ্রেণীতে পড়িয়াছে। প্রথম কারণ, প্রিয়জনের মুখসৌন্দর্য বর্ণনায় ইহার প্রয়োগের আধিক্য। দ্বিতীয় কারণ, বক্তা চাঁদের উপমায় তৃপ্ত না হইয়া প্রভাতী পদ্মের উপমা দিয়া মুখসৌন্দর্য বর্ণনা শেষ করায় চন্দ্রের উপমা 'গৌণী' হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম উপমায় উপমানের এই 'সামান্যত্ব' ও 'গৌণাত্ব' কাব্যালঙ্কার বিচারে দোষাবহ। এখন যদি এই দুইটি উপমার তাৎপর্যে বিশেষ পার্থক্য দেখাইয়া পরবর্তী উপমার পূর্ববর্তী উপমার উপরে নির্ভরশীলত্ব দেখানো সম্ভব হয় তবে প্রথম উপমার গৌণাত্ব খণ্ডন হইবে, এবং যদি প্রথম উপমার ব্যঞ্জনায় 'ধ্বনি', 'ধ্বন্যন্তর' ও 'অনুধ্বনি'র মধ্যে উপমা চন্দ্রের বিশেষ সার্থকতা দেখানো যায়, তবে সামান্যত্ব দোষ দূর হইয়া 'মুখ্যত্ব' বা বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা চন্দ্র উপমার বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রথমে করিব।

স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় দিনের তাপ ও রাত্রের অন্ধকার দূর করেন বলিয়া চন্দ্র সাধারণ মানুষের প্রিয়, এই গুণের সঙ্গে তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি-পূর্ণতার অভিনবত্বে তিনি কবিজন-মানস-প্রিয়। এখানে উপমেয় নায়িকার মুখশ্রী সজ্জন দ্রষ্টার আনন্দদায়ক, ইহাতে চন্দ্রের উপমা সামান্যত সার্থক হইল। বিশেষের দিক হইতে,—চন্দ্র যেমন ভাবপ্রবণ কবিজনপ্রিয়, সেইপ্রকার অবিবাহিত যুবক নায়কও একটি বিশেষ ভাবপ্রবণ মনোবৃত্তি লইয়া নায়িকার মুখমণ্ডল দেখিতেছেন, অতএব এই ব্যাখ্যায় উপমার বিশেষত্ব স্থাপন করা যায়, কিন্তু পরবর্তী উপমা 'প্রভাতে পউদ্ম ফুল' বাধা উপস্থিত করিয়াছে। এই বাধা অপসারণের জন্য দেখিতে হইবে এই দ্বিতীয় উপমা প্রথম উপমার অনুগত কিনা।

অন্য ফুলের মত পদ্ম প্রভাতে প্রস্ফুটিত হয় না, মুখ অল্প খোলে মাত্র। এই প্রকার অল্প স্ফুটিত পদ্ম ভাবপ্রবণ কবির মন প্রস্ফুটিত পদ্ম অপেক্ষা মোহিত করে। এই উপমার উপমেয় নায়িকার দেহে প্রথম যৌবন সমাগমে অন্তরের যৌবনোচিত ভাব মুখে অল্প প্রকাশ পাইয়া যুবক নায়কের মন মুগ্ধ করিয়াছে। ইহাই এই উপমার প্রধান ব্যঞ্জনা। এখানে নায়কের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে নায়িকার মুখশ্রী প্রথম এবং মুখের ভাব দ্বিতীয় ও প্রথমের অনুগত হওয়ায় প্রথম উপমার উপমানের গৌণীত্ব খণ্ডন হইয়াছে।

প্রভাতে পদ্মকোড়কের মুখ অল্প বিকশিত হইলে মধুলোভী ভ্রমর কোড়কে

প্রবেশ করিয়া অপর কোনো বিজাতীয় কীট প্রবেশে বাধা দিয়া পদ্মটির নিরাপদে প্রস্ফুটিত হইবার সহায় হয়। এই উপমার উপমেয় প্রভাতী পদ্ম-কোড়ক সদৃশ নায়িকাকে বিজাতীয় কীট সদৃশ দস্যুর কবল হইতে ভ্রমর সদৃশ নায়ক রক্ষা করিয়া এখন তাহার জীবনের পূর্ণতা দিতে ইচ্ছুক। ইহাই এই উপমার ব্যঞ্জনায় 'ধ্বনি'।

পদ্মের রক্ষক ভ্রমরের যেমন একটা স্বাভাবিক অধিকার পদ্মের উপরে আছে, তেমনি এক্ষেত্রে নায়িকার রক্ষক নায়কেরও নায়িকার উপরে অধিকারের দাবি স্বীকার্য। এইটি উপমার ব্যঞ্জনায় 'অনুধ্বনি'।

প্রভাতী পদ্মকোড়কের গায়ে রাত্রের শিশিরবিন্দুর মত নায়িকার কৃতজ্ঞতার অশ্রুবিন্দু নায়কের মনে নায়িকার উপরে দাবি প্রতিষ্ঠার সাহস দিতেছে। ইহা এই উপমায় ব্যঞ্জনার 'প্রতিধ্বনি'।

নায়ক ও নায়িকা উভয়ে একই গ্রামের অধিবাসী এবং ঘটনার পূর্ব হইতেই পরিচিত। কিন্তু সেই ঘটনার রাত্রে নায়িকার মুখ দর্শন কোনো এক বিশেষ রাত্রে কবির চন্দ্র দর্শনের মত নানা ভাবোদ্দোতক হইয়াছে। কবি যেমন ভাবনেত্রে চন্দ্র দর্শন করিয়া তাঁহার সুধাকর, হিমকর, মৃগাঙ্ক, প্রভৃতি নামের সার্থকতা অনুভব করিয়া কাব্যে প্রকাশ করেন, সেই প্রকার তাৎপর্যেই নায়িকার 'চান্দমুখ' দর্শন করিয়া মুগ্ধ নায়ক পরবর্তী উপমা 'পরভাতে পউদ্মের ফুল' উপমায় মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে প্রথম উপমার সঙ্গে দ্বিতীয় উপমার 'জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ' ঘটায় প্রথম উপমার মুখ্যত্ব ও বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধিকন্তু চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মত নায়িকার 'চান্দমুখ' দেখিয়া নায়কের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, সেই ভাবালোকে নায়ক তাঁহার নায়িকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনা করায় পরবর্তী উপমাগুলির উপরে প্রথম উপমার 'ব্যাপ্তি' ঘটিয়া প্রথম উপমার উৎকর্ষ হইয়াছে।

প্রথম ছন্দের দ্বিতীয় ছত্রে নায়ক 'আশমানের কালা মেঘ'-এর সঙ্গে নায়িকার 'মাথার চুল'-এর উপমা দিয়াছেন। এই উপমার ব্যঞ্জনায়—কালো মেঘ যেমন তাহার অন্তরালে অবস্থিত অপর সমস্ত ঢাকিয়া রাখে, সেই প্রকার নায়িকার আলুলায়িত কেশের সৌন্দর্য নায়কের মনে পূর্ববর্তী দুর্ঘটনার স্মৃতি আবরিত করিয়াছে। এই ব্যঞ্জনার ধ্বনি—গ্রীষ্মের অপরাহ্নে দিগন্তে কালো মেঘ দেখিলে তৃষিত চাতক যেমন আনন্দিত হয়, অবিবাহিত যুবক নায়কও

সেই প্রকার নায়িকার কেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। কালো মেঘে ঝড়, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত, প্রভৃতির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও চাতক যেমন আকাশে উড়িয়া কালো মেঘকে অভ্যর্থনা করে, সেই প্রকার নায়ক নায়িকার এই মিলনের ভবিষ্যতে যে পারিবারিক, লৌকিক ও সামাজিক বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহা তুচ্ছ করিয়া নায়ক নায়িকাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ইহাই এই ব্যঞ্জনায় ধ্বনির 'অনুধ্বনি'।

এখন আমরা ষষ্ঠ ছন্দের অলঙ্কার আলোচনা করিতেছি। ষষ্ঠ ছন্দের দুইটি ছত্র ব্যাপিয়া আছে একটি মাত্র 'রূপক-অলঙ্কার'। এই অলঙ্কারের নাম 'হেয়-উপাদেয়পরিভব রূপক অলঙ্কার'। এই অলঙ্কার কাব্যে অতি দুর্লভ। নায়িকার গাত্রবর্ণ বর্ণনা করিতে ভাবপ্রবণ নায়ক কোনো উপমা না দিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহার ব্যঞ্জনা—মাঘ মাসে ক্ষেতে শোনের ফুল অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হয়। কাঁচা সোনা, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সোনা ছাড়া আর কোনো দ্রব্যে এইপ্রকার বর্ণ দেখা যায় না। ঘোর শ্যামবর্ণ উদ্ভিদ শোন-ফুলের এই বর্ণাঢ্যতা অস্বাভাবিক, অতএব শোনফুল নিশ্চয়ই কাঁচা সোনার বর্ণ চুরি করে। এই চৌর্য হইতে কাঁচা সোনা তাহার বর্ণসম্পদ রক্ষার জন্য তাহা অপেক্ষাও গৌরবর্ণাঢ্য নায়িকার অঙ্গকান্তির মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে। এই অলঙ্কারে শোনফুল কাঁচা সোনার বর্ণ চুরি করিয়া বর্ণাঢ্য হয়, সেজন্য শোন ফুলের বর্ণ 'হেয়,' এবং কাঁচাসোনার বর্ণ 'উপাদেয়'। কাঁচা সোনার বর্ণ নায়িকার অঙ্গকান্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইতে পারে, সেজন্য নায়িকার বর্ণের নিকটে বর্ণাঢ্যতায় কাঁচাসোনার পরিভব, অর্থাৎ পরাজয় ঘটিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লী গাথাগুলির মধ্যে এই প্রকার অলঙ্কার ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ রচনা বহু আছে। তাহার মধ্যে একটি গান পাঠক ও কাব্যসমালোচক সমাজে উপস্থিত করিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। গানটি পাওয়া যাইবে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' দ্বিতীয় খণ্ডে 'আমিনা বিবি-নছর মালুম' পালায়। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে পূর্বদক্ষিণ বঙ্গে দরিদ্র কৃষক পরিবারের ঘটনা অবলম্বনে পল্লীকবি পালাটি রচনা করিয়াছিলেন। রচনার ভাষা—প্রাচীন পল্লীকথ্য কটুলীবাংলা।

নছর তাহার কিশোরী স্ত্রী আমিনাকে পিতৃগৃহে রাখিয়া অর্থোপার্জনের জন্য বিদেশে গিয়াছে। ছয়বৎসর হইয়া গেল নছরের কোনো সন্ধান নাই। এই অবস্থায় এক বর্ষার রাত্রে আমিনার মনোভাব প্রকাশ করিয়া মরমী কবি

গাহিতেছেন,—

ঝুরা পড়েরে রে লোছা লোছা উজাই উড়েরে রে কৈ।[১]
এমনি বার্ষার রাইতে মুই থাইকাম্ কারে লই রে, মুই থাইক্যম কারে লই ॥
কুহুম[২] কুহুম শীত পড়ের রে গায়ত্ দিলাম কেঁথা।
কন্ দাবাইয়ে যাইব আমার বুগর[৩] হাড্ডির বেথা রে, মোর বুগর
হাড্ডির্ বেথা ॥
দেবায় ডাকে হাড়ুম্ ধুড়ুম্ আশমান ভাঙ্গি পড়ে।
এম্নি কালে একলা মুই থাইকাম কেম্নে ঘরে, রে—॥
টোবার পানি বাড়ি উড়েরে রে, বাড়ি উড়ে তার ফেনা।
মুই দুঃখের কথা কারে কইয়ম্ কেউ ত বুঝে না, রে—॥
বীজ্নায়[৪] বাড়ে ধানের রোয়া, রোয়ার আগা করে লক্ লক্।
মোর চোগর পানিত্ ভাসি গেল্গৈ বসর কাইলা[৫] সখ, রে—
মোর মনর যত সখ ॥
আউল হইয়ে যতরে মাছ তারা মেঘের পানি খাই।
খাইলা ঘরত্ থাকি কেম্তে মনরে বুঝাই, রে—আইজ বন্ধু ঘরত্ নাই ॥
বাড়ীর পাশত্ ঝিঙ্গা ক্ষেতি, ক্ষেতিত্ টুনিপক্ষির বাসা।
দিনত্ খায় রে চড়িবড়ি রাইতত্ তারার আশা, রে—
তারা ফিরি আইসে বাসা ॥
ছয় না মাসর লাগি রে বন্ধু, গেলা ছয় বচ্ছর হই যায়।
বনর বাঘে ন খাইল মোরে মনর বাঘে খায়, রে—' ॥
কন্ সাইগরের পারে রে বন্ধু, রইলা কন্ বা নারী লইয়া।
মোকে ভুলি কেম্নে রইলা তুমি অদেখা হইয়া রে—' ॥
নারীর যইবন রে বন্ধু, যেমুন জোয়ারের পানি।
কূলে কূলে ভরি উড়েরে রে, আবার ভাডাত্ টানাটানি, রে—' ॥
দাও কিনি ন ধারাইলে দাও ত্ জামার[৬] ধরি যায়।
খাইলা ভূইত্ দুনিয়ার যত আগাছা গাছায়[৭] রে—' ॥

অর্থ—১। বৃষ্টি ঝরিতেছে ঝুপ ঝুপ করিয়া উজাইয়া উঠিতেছে কৈ-মাছ
২। কুহুম=কুসুম, তাৎপর্যে অল্প। ৩। বুগর=বুকের।
৪। বীজ্নায়=বীজতলায়। ৫। বসর কাইলা=বয়স কালের, যৌবনের। ৬। জামার=মরিচা। ৭। গাছায়=জন্মায়।

পাইত্‌লার ভাত ঠাণ্ডা হইলে খাইতে মজা নাই
হেলি পইড়লে সোনার যইবন কি করবা আই[৮] রে—’ ॥
হাতর বেঁকী হলস হইয়ে অখন পড়ি পড়ি যায়।
ভাবনা চিন্তনায় মোকে অখন চুষি চুষি খায় রে—’ ॥
ছাট্টিনর চুলি আছিল মোর বুগত্‌ আঁটা আঁটি।
সোনার যইবন মইলান হইয়ে জোয়ারে ধইরাছে ভাটি রে—’ ॥
কন সাইগরের পারে রে বন্ধু, কন সায়রের[৯] কুলে।
কত কত ভমরা আসি বস্‌তে চায় রে ফুলে রে—’ ॥
কার বা লাগি কর রে তুমি এই না কামাই রুজি।
সিঁধাল্‌-চোরে হাতাই লই যায় ঘরর আসল পুঁজি রে—
তোমার ঘরর আসল পুঁজি।
কার লাগি বৈদেশী হইলা বৈদেশী কার বা লাগি।
আমি যদি মরি রে বন্ধু, তুমি হইবা বধর ভাগী রে—’ ॥
পাড়াইল্যা লোক নানান্‌ কথা দিতাছে লাগাই।
মাও বাপ্‌ ত তোমার-থুন্‌ নিতে চায় ছাড়াই রে বন্ধু—’।
হাঙ্গার[১০] বউ ন হইয়ম রে আমি, আমি ন পুইষ্যম্‌ রে হাঙ্গা
হদ্‌ বাজাই চাইয়ম্‌[১১] রে আমি, আমার কপাল কন্নত্‌[১২] ভাঙ্গা রে—
আমার কপাল কন্নত্‌ ভাঙা ॥*

৮। আই=আসিয়া। ৯। সায়র=বড়ো নদী।
১০। হাঙ্গা=সাঙ্গা, নিকা। ১১। হদ্‌ বাজাই চাইয়ম=হদ্দ হইয়া দেখিব, চেষ্টার চরম করিয়া দেখিব। ১২। কন্নত্‌—কোথায়।

* এই গানটির অর্থ-ব্যঞ্জনা বুঝিতে শেষের দুইটি ছন্দে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।—লেখক।

একারম্যান ও গ্যেটের আলাপচারি*

(একারম্যানের ডায়েরী থেকে)

[হ্বাইমার] শুক্রবার, ২রা জানুয়ারী, ১৮২৪

গ্যেটের ওখানে মধ্যাহ্নভোজন এবং তৎসহ তাঁর প্রফুল্লিতচিত্ত আলাপন উপভোগ করলাম। হ্বাইমার সমাজের জনৈকা সুন্দরী তরুণীর কথা-প্রসঙ্গে উপস্থিত একজন বললেন যে, তিনি তার সঙ্গে প্রেমেই পড়তে যাচ্ছিলেন, যদিও মেয়েটির ধীশক্তি খুব যে প্রোজ্জ্বল তা নয়।

হাসতে হাসতে গ্যেটে বললেন, "আরে, রামঃ! প্রেমের সঙ্গে ধীশক্তির সম্পর্ক কোথায়? কোনো তরুণীকে যে জন্যে আমরা ভালোবাসি তার মধ্যে ধীশক্তিটক্তি নেই। আমরা তাকে ভালবাসি তার রূপ, যৌবনোৎফুল্লতা, হাবভাব, লীলাবিলাস, নির্ভরশীলতা, তার স্বভাব, দোষত্রুটি, খেয়ালিপনা এমনি সব ঈশ্বর জানেন আরো কতো কী-র জন্যে। কিন্তু না, তার ধীশক্তিকে আমরা কখনোই ভালোবাসি না। অবশ্য ধীশক্তির উজ্জ্বলতা দেখলে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করি এবং ঐগুণের দ্বারা তার মূল্য আমাদের চোখে হয়তো অনেক বেড়েও যায়; এবং যেখানে ভালবাসা জন্মেছে সেখানে ধীশক্তি দর্শনে তা দৃঢ়ীকৃতও হতে পারে। কিন্তু, যা আমাদের হৃদয়ে অগ্নিগর্ভ প্রেমের জন্ম দেয়, প্রবল সংরাগের সৃষ্টি করে, তা ধীশক্তি নয়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে এবং অন্য সব অতিথিরা চলে যাওয়ার পরেও আমি গ্যেটের সঙ্গে ছিলুম।

ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে কথা উঠলো। শেক্সপীয়রের প্রতিভার মহত্ব এবং যাঁরা ঐ বিরাট প্রতিভার পরে এসেছেন সে-সব নাট্যকারদের অসুবিধার কথাও হলো।

গ্যেটে বললেন, "সামান্য প্রতিভাধর নাট্যকারেরও শেক্স্পীয়রের নাট্য-কৃতি সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে উপায় নেই—তাঁর নাটকগুলি না পড়ে ও উপায় নেই। কিন্তু পড়ার পরেই তার এও মনে হবেই যে, মানব প্রকৃতি তার সব

---

* Eckermann-এর "Conversations with Goethe" (Everyman's Library) থেকে।—বাংলা অনুবাদঃ তীর্থরেণু দাস।

প্রবণতা, সব মহত্ত্ব ও ভীষণতা নিয়ে এখানে উপস্থিত এবং শেক্সপীয়র নিঃশেষে সে প্রকৃতির সব কিছুই চিত্রিত করেছেন। উত্তরসূরীর পক্ষে আর তাই কিছুই করণীয় নেই। শ্রেষ্ঠত্বের যথার্থ অনুরাগী কারো পক্ষে এই অপরূপ বিস্ময়কর ও দুর্লভ উৎকর্ষের সঙ্গে পরিচিতির পরে স্বয়ং কিছু লিখতে বসার মতো মনের জোর থাকতে পারে কি ?

"আমার প্রিয় জার্মানভূমিতে, পঞ্চাশ বছর আগে, কিন্তু এ-অসুবিধায় পড়তে হয়নি আমাকে। তখন সাহিত্য যা ছিল তা' অল্পেই পড়ে শেষ করা যেত, এবং তা পড়ে আমার মনে বিন্দুমাত্রও ভয়ের সঞ্চার হয় নি। সেগুলি আমাকে বেশীদিন ব্যাপৃতও রাখতে পারেনি। আমি জার্মান সাহিত্য দ্রুত পিছনে ফেলে জীবনের দিকে এগিয়ে গেলুম—জীবনের দিকে এবং সৃজনশীলতার দিকে। এবং এইভাবেই আমার স্বকীয় স্বভাবনির্দ্দিষ্ট বিকাশের পথে আমি অগ্রসর হয়েছিলাম, এবং প্রত্যেক পদক্ষেপেই আমার শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শটা আমার তৎকালীন সৃষ্টিতে লক্ষিত উৎকর্ষের চেয়ে খুবেশী উঁচুতে ছিল না। কিন্তু, ভাবো যদি আমি একজন ইংরেজ হয়ে জন্মাতুম এবং শেক্সপীয়রের ঐ সব মহৎ সৃষ্টিরাজির ঐশ্বর্য্য তাদের প্রবল শক্তিতে আমার নবোদ্ভিন্ন তরুণ দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হতো, আমি নিশ্চয়ই অভিভূত হয়ে পড়তুম, কী করবো বুঝতেই পারতুম না। যে-সহজ খুশির পাল তুলে আমি স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গেছি তা কি আর পারতুম ? আমাকে বিস্তর ভাবনা চিন্তা করতে হতো, এবং বেরোবার একটা রাস্তার জন্যে চারদিক হাতড়ে বেড়াতে হতো'।"

আমি শেক্সপীয়রের কথায় ফিরে এলুম। বললুম, "যদি তাঁকে (শেক্সপীয়রকে) সমগ্র ইংরাজী সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে' একজন জার্মান নাট্যকাররূপে কল্পনা করি, তাঁর প্রতিভার মহত্ত্ব তখন অলৌকিক মনে হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের পটভূমিতে, ঐ শতাব্দীর পটভূমিতে, তাঁর সমকালীন নাট্যকার ও অতি নিকট অনুগামীদের—যেমন বেন জনসন, ম্যাসিঞ্জার, মার্লো, বোমণ্ট ও ফ্লেচার প্রভৃতির—পাশাপাশি রেখে যদি তাঁর প্রতিভার বিচার করি, তা হলে কিন্তু দেখা যাবে শেক্সপীয়র সেখানে সর্ব্বোচ্চ হলেও একেবারে দুরধিগম্য ন'ন। তাঁর যুগের দুর্দ্দম সৃজনশীলতার দানও কম নয়।"

গ্যেটে সায় দিয়ে বললেন ! "তুমি ঠিকই বলেছ। সুইজারল্যাণ্ডের পর্ব্বত

শৃঙ্গগুলো দেখ। মঁব্লাঁ-কে আমাদের লুনেবার্গ হীথের সমভূমিতে যদি স্থাপন করা যেত, তা হলে তার অকল্পনীয় উচ্চতা আমাদের স্তম্ভিত নির্ব্বাক করে' দিত। কিন্তু মঁব্লা-কে তার আপন আবাসভূমিতে, পর্ব্বত দানবদের আবাস-ভূমিতে দেখ,—য়ুংফ্রাউ, ফিন্‌ষ্টেরারহর্ণ, আইগার, তেটারহর্ণ, সেণ্ট গট্‌হার্ড ও মঁ রোজা প্রভৃতির দিকেও তাকাও; দেখবে মঁব্লাঁ-র অতিকায়ত্ব তখনো থাকলেও তেমন বিস্ময় আর আমাদের মনে জাগাতে পারছে না।"

গোটে আরও বললেন, "তা ছাড়া, শেক্সপীয়রের মহত্বের অনেকখানিই তাঁর সেই প্রাণপ্রবল মহৎ যুগের অবদান একথা যদি কেউ বিশ্বাস না করতে চায়, তাকে একবার জিজ্ঞেস কো'রো, এই বর্ত্তমান যুগে, এই ১৮২৪ সালে, ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার কি সম্ভব হতো?—আজকের এই চুলচেরা, অতি দোষানুদর্শী পত্র পত্রিকার আমলে?

"সেই সরল অব্যাহত সৃষ্টিচলনসদৃশ সৃষ্টি, যা মহৎ সৃষ্টির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, এখন আর সম্ভবই নয়। এখন প্রতিভার যেন কোনো আড়ালই নেই, সাধারণের চোখের সামনে সে বড় বেশী অনাবৃত। প্রত্যহ পঞ্চাশ জায়গায় পঞ্চাশ রকমের সমালোচনা, আর তার থেকে ছড়ানো নানা গুজবের ঢেউ, আজকের দিনে স্থায়ী কিছু করতে দিচ্ছে না। যে-সাহিত্যিক এসবের থেকে নিজেকে জোর করে দূরে না সরিয়ে রাখতে পারবেন তাঁর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই সব পত্রপত্রিকার ক্ষতিকর না-ধর্ম্মী নান্দনিক সমালোচনার ঢঙের প্রভাবে এক ধরণের আধা সংস্কৃতি জনগণের মধ্যে প্রসার লাভ করছে। সৃজনী প্রতিভার পক্ষে এ হলো মারাত্মক কুয়াশা বিশেষ, বিষ বাষ্পই বলতে পারো—যা প্রাণবান বর্ধিষ্ণু পাদপের পক্ষে বিনাশধর্ম্মী,—তার মঞ্জু হরিৎ পত্র-শোভা থেকে তার মজ্জা তন্তু এমন কি মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত সব কিছুরই বিনাশক।

তারপর দেখ, গত দুই নোংরা শতাব্দীতে মানুষের জীবন কত দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে গেছে। এখানে মৌলিক স্বভাবের মানুষ কোথায়? কোথায় সেই মানুষ যিনি খাঁটি হবার এবং নিজেকে, যেমনটি তেমন প্রকাশের সাহস রাখেন? এটা কবিদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি, কারণ বাইরের সংসার যদি বঞ্চনার হাট হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে তাকে নিজের অন্তর থেকেই সব আদর্শ সৃষ্টি করতে হয়।"

হ্বের্টর (Werther) সম্বন্ধে এবার কথা উঠলো। গোটে বললেন, ও

বইটি এমন একটি সৃষ্টিকর্ম যা আমি পেলিকান পাখির মতো নিজের বুকের রক্ত দিয়ে লালন করেছিলাম। ওখানে আমার অন্তরের অতিনিভৃত প্রদেশ থেকে আহরিত এত বিপুল পরিমাণ বস্তুসম্ভার আছে যে, তা দিয়ে ও-রকম আরো দশখানি বই হয়। তা ছাড়া, জানো, বইখানা বেরোনোর পর এপর্যন্ত আমি একবার মাত্র ও-টি পড়েছি—ইচ্ছে করেই আর পড়িনি। ওটা আগা-গোড়া 'কনগ্রিভ রকেটের'' স্তূপ। বইখানা চোখে পড়লেই আমার অস্থির লাগে। ওটা লেখবার সময় যে বিশেষ মানসিক অবস্থায় ছিলাম, পাছে আবার সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়, সেই ভয় জাগে।"

আমি তাঁর সঙ্গে নেপোলিয়নের যে আলাপ হয়েছিল সেকথা তুললাম। আগেও অনেকবার বলেছি—একটু বিশদভাবে শুনবো বলে'। বললাম, "হ্বের্টরের একটি স্থান উল্লেখ করে' নেপোলিয়ন আপনাকে নাকি বলেছিলেন, ওটা তেমন যুক্তিগ্রাহ্য হয় নি, এবং আপনি তা স্বীকারও করেছিলেন? কোন জায়গাটা সেইটে জানতে ভারী ইচ্ছে করে।"

"অনুমান করো তো," মৃদু রহস্যময় স্মিতহাস্যে বললেন গ্যেটে।

"আমার তো মনে হয় সেই জায়গাটা" বললাম আমি "যেখানে শার্লোট হ্বের্টরকে পিস্তল দুটি পাঠিয়ে দিলে কিন্তু এ্যালবার্টকে কিছুই বললে না সে-বিষয়ে,—কিম্বা এ-নিয়ে তার নিজের মনে যে কোনো সন্দেহ, কি ভয় হয়েছিল তারও কোনো আভাষ দিল না তাকে। তার এই নীরবতার একটি যুক্তি আপনি অবশ্য দিয়েছেন বইটিতে, মনে হয় অনেক চিন্তাভাবনা করেই; কিন্তু যেখানে তার বন্ধুর জীবনহানির সমূহ আশঙ্কা সেরকম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ও-যুক্তি তেমন মনে ধরে না।"

"তোমার এ-উক্তি যে খুব ভুল তা নয়," বললেন গোটে, "তবে, নেপোলিয়ন এই জায়গাটাই বা অন্য আরেকটির উল্লেখ করেছিলেন, তা বলা ঠিক হবে না। সে যাই হোক, তোমার অভিমতটি তাঁর মতোই যথার্থ।"

প্রশ্ন করলাম, হ্বের্টরের যে-বিপুল প্রভাব তখনকার দিনে হয়েছিল সে কি ওই সময়েরই জন্যে?

বললাম, "আমার তো এ মতটায় মন সায় দেয় না, যদিও এটা অনেকেরই মত। হ্বের্টর তার প্রকাশ দ্বারাই নতুন এক যুগের সৃষ্টি করেছিল এটাই সত্য—বিশেষ এক যুগে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই নয়। প্রত্যেক যুগেই কত যে নির্বাক দুঃখ, কত যে গোপন অতৃপ্তি আর জীবন-বিতৃষ্ণা ছড়িয়ে থাকে;

এবং প্রত্যেক নরনারীর অন্তরেই সংসারের সঙ্গে এত বিরোধ, স্বভাবের সঙ্গে লোকাচারের এত দ্বন্দ্ব ঘটে যে, আজও যদি হ্বেটরের প্রথম প্রকাশ ঘটতো তা নতুন যুগের সৃষ্টি করতো।"

গোটে বললেন, "তোমার কথা খুবই যথার্থ। এই জন্যেই বইখানা আগের মতোই এখনো তরুণ বয়সের ছেলেমেয়ের মন এত গভীরভাবে স্পর্শ করে। আমার মনে আমার যুগের প্রভাবের মধ্যে আমার তরুণ মনের বিষাদের উৎস খোঁজার কী দরকার? বরং এটাই সত্য যে, আমার কিছু ব্যক্তিগত তাৎক্ষণিক তীব্র বেদনাময় অভিজ্ঞতা যা আমার জীবনে একটা বিপর্যয়ের মতো সৃষ্টি করেছিল, তা-ই আমার মনকে হ্বেটর সৃষ্টির অনুকূল অবস্থায় নিয়ে যায়।

"এবং একটু তলিয়ে বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে যে, ঐ বহুল প্রচারিত তথাকথিত হ্বেটর-যুগ সার্বভৌম, মানবসংস্কৃতির প্রবাহের কোনো পরিচ্ছেদ নয়; বরং তা প্রতি মানুষেরই জীবনেতিহাসের একটি অধ্যায় বিশেষ। কারণ, প্রতি নরনারীকেই তার স্বভাবলব্ধ স্বাধীন প্রবৃত্তিকে এই পুরাতন পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে খাপ খাইয়ে, মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। অদৃষ্টের বাধা, স্বাধীন ইচ্ছার পথরোধ, অপূর্ণ বাসনা-কামনা এগুলি কোনো যুগবিশেষের দুঃখ নয়, প্রতি ব্যক্তি মানুষেরই দুঃখ। এবং তাই যদি প্রত্যেক মানুষ জীবনের এক সন্ধিলগ্নে পৌঁছে এ-উপলব্ধি না করে যে, হ্বেটর তারই জন্যে লেখা হয়েছিল, সেটা তারপক্ষে নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।"

গল্প

আনন্দ

চুনীলাল রায়

বর্তমান কালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাকার নির্মলকান্ত মৈত্রকে চেনেনা এমন কাউকে যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কেউই বিশ্বাস করবে না। অন্ততঃ সুরপতির তো তাই ধারণা। কিন্তু শুধু ধারণাই বা বলি কেন? এ তার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রমাণও কি তার হাতে কম রয়েছে নাকি? ছায়ানট, ত্রিপিটক, কাকজ্যোৎস্না, শেষ লগন, আরও কত বইতো গরম ফুলুরি, বেগুনীর মতো বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সংস্করণের পর সংস্করণ। তারপর অনুবাদ,

রেডিও, সিনেমা, টি ভি—সব মিলিয়ে সে এক ছয়লাপ কাণ্ড! সাহিত্য পুরস্কার, অকাদেমী পুরস্কারের পর এবার নোবেল পুরস্কারটাও নাকি তার জন্যে তোলা রয়েছে।

এ হেন লেখককে যদি ধাপধারা গোবিন্দপুরের মতো এই নগণ্য বাগাড়িয়া-তে এনে ফেলা যায় তবে তা-কি কম বড় একটা কাজ? কম বাহাদুরী? শুধু নিজের গাঁ কেন, আশ্‌পাশের দশটা গেরামের লোক সুরপতির এলেম দেখে ভিরমি খাবে না? সুরবালার-র ঠাস্‌ঠাস্‌ কথাগুলো কি আর চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে না! তাই সুরপতির ধান্দা অনেক, নানারকম ফন্দিফিকির কসরৎ করতে হয় তাকে। নইলে আজকের দিনের মানুষ টিঁকে থাকতে পারে!

যা ভাবা তাই কাজ। এটা ছোটবেলা থেকেই সুরপতির অভ্যেস। অন্য কারো মাথায় চিন্তা আসার আগেই সে কাজটা সুরপতি কমপ্লিট করে ফেলেছে। কিন্তু এখানে একটু মুশকিল রয়েছে যে। গেঁয়ো পলিটিক্স রয়েছে। অবশ্য গ্রাম মানেই এসব কিছু একটা থাকতেই হবে। না থাকলেই যেন গ্রাম-গ্রাম ভাবটা আর থাকে না। ভাবে সে। তাই গাঁয়ের শ্রদ্ধেয় উকিল হুরমৎ আলী সাহেব-কে কথাটা একটু ভেঙ্গেই বলতে হল। অবশ্য সুবিধা একটা আগে থেকেই ছিল। আলী সাহেব থাকেন হটুগঞ্জে, গাঁয়ের বাইরে।

—আলীদা, তুমিই তো সব। তুমি বললেই হয়ে যায়। বেশ বিনয় করেই বল্‌লে সে।

—সুরের পতি, না সুরবালার পতি? তা-কি মনে করে, খবর কি তোমার? অনেকদিনপর তাকে দেখে হৈ হৈ করে ওঠেন হুরমৎ সাহেব। দিলদরিয়া মেজাজটা তাঁর।

—দাদা, এবার বাগাড়ের চড়কের মেলায় গান, লাঠি খেলা, সঙ্‌সাজার সঙ্গে নতুন একটা জিনিস যোগ করতে চাই। আপনার অনুমতি দরকার। বেশ আমড়াগাছি করেই জবাব দিতে জানে সে।

—কি ব্যাপার বলোতো সুরপতি। বিষয়টা স্পষ্ট করে জানার আগ্রহ দেখান আলী সাহেব।

—দাদা, এবার ছোটখাটো একটা সাহিত্য সভা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতার মতো করতে চাই এই মেলা উপলক্ষে। আড় চোখে সুরপতি তাকায়।

কথাটার প্রতিক্রিয়া জানার আগ্রহে। ভিতরে ভিতরে বেশ উত্তেজনা হচ্ছিল। বাইরে সে ভাব কিন্তু চেপে রাখে।

—বাব্বাঃ! বেশতো, সেতো খুব ভাল কথা হে। কিন্তু করবেটা কে শুনি? আজকাল তো তোমরা সবাই শহরে যেতেই ব্যস্ত। গাঁয়ের কথা ক'জন ভাবে? দুঃখ করেন তিনি।

—না দাদা, আমিই করছি সব। দেখবেন এমন একজনকে আনব—। নিজের কথা সাতকাহন করে বলতে না পারলে কি সুখ আছে না-কি?

—আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। খুশী হয়ে সম্মতি দেন আলী সাহেব। সাধাসিধে মানুষ তিনি। ওকালতি করেন ঠিকই, কিন্তু দিলটা তার সাফা।

এই গাঁ? গাঁয়ের বাড়ীতে ফেরার পথে নিজের মনেই ভাবতে থাকে সুরপতি। অদ্ভুত এই গ্রাম। এ গাঁয়ে হিন্দু যদি দশ ঘরতো মুসলমান দু'ঘর। অথচ আশপাশের সব গাঁই মুসলমান প্রধান। কিন্তু এ অঞ্চলে দাঙ্গা হয়নি, ঝগড়া হয়নি কখনওই। এই চড়কের মেলার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন এই অঞ্চলের দু'পক্ষের মাতব্বর-রা মিলে। সেও আজ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আজও তাই ধ্বসে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া হিন্দু জমিদারের বাড়ীতে চড়কের দিন মুসলমান কর্তা ব্যক্তিরা অন্নগ্রহণ না করলে গৃহকর্তা থাকেন অভুক্ত। আলী সাহেব এসে দাঁড়ালে তবেই চড়কের লাঠিখেলা শুরু হয়। গ্রাম-ছাড়া-সুরপতিরা একদিনের জন্যে হলেও দেশের মাটিতে ফিরে আসে।

ফিরে আসে কলকাতার কাউকে না কাউকে সভাপতি, প্রধান অতিথি করে' নিয়ে। সুরপতির সঙ্গে নির্মলবাবুর কি ভাবে যেন একটা যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল। সেটা ভাঙ্গিয়েই সে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে চাইল এবার। অবশ্য এঁদের এনে ফেলা কি যার তার কাজ? কত বায়নাক্কা থাকে। কিন্তু সুরপতি যেখানে জান লড়িয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে সেখানে কি আর কোনও কিছুর অভাব থাকে, থাকতে পারে, না ছিল কখন-ও?

তাই নির্মলকান্ত এসে একটু অবাক হয়েই গেলেন। এমন-কি একজন রিটায়ার্ড মুন্সেফকেও সুরপতি জোগাড় করে এনেছে! আবৃত্তি প্রতিযোগিতার তিনিও একজন বিচারক। হাসলেন নির্মলবাবু। জীবনের এই পঞ্চান্ন বছরে অনেক দেখেছেন তিনি। এও এক অভিজ্ঞতা। যেহেতু বিচার করেছেন ভদ্রলোক অতএব এখানেও সুনাম রাখলেন তিনি। নাঃ, সুরপতিদের মতো আরও ক'জন থাকলে পৃথিবীর যে কোনও দেশই একটা কিছু করে ফেলতে

পারে।

তিন নিজেও এই করে ফেলার কথাই বললেন। লোক মন্দ হয়েছিল না। স্থানীয় হাইস্কুলের মাষ্টাররা, সদরের ক'জন প্রফেসর, ডাক্তার, উকিল তো উপস্থিত ছিলেনই এমন-কি মহকুমা হাকিম পর্যন্ত এসে হাজির। খোঁজ খবর নিয়েছেন তাঁর সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে। নির্মলকান্তর নামটা কি ফেলনা? শুধু কি তাই? ভবিষ্যৎ উপন্যাস নিয়েও নানারকম প্রশ্ন ছিল তাঁর।

মিটিং-এও সেই কথাই হ'ল। সবারই এক কথা—আপনি কি লিখছেন? ভবিষ্যতে কি লিখবেন বলে ঠিক করেছেন? কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, প্রফেসর, ডাক্তারগিন্নী সবারই সেই একই প্রশ্ন। ভীড়টা কম হয়নি। সুরপতির আত্মপ্রসাদ লাভের যথেষ্ট অধিকার আছে বৈকি।

তিনিও খুব সংক্ষেপে সেরেছেন তাঁর কথা। দেখুন, আজ পর্যন্ত দু'শটি উপন্যাস লিখেছি, পঞ্চাশটি ছোট গল্পের সংকলন রয়েছে আমার। আত্মজীবনীও লিখেছি। কবিতার বই-ও আমার রয়েছে একটি। ঐ আমার সাহিত্যের শুরু। কিন্তু কবিতা আমার স্বভাবধর্ম নয় বলে' ওপথে আর যাইনি এছাড়া আরও কিছু ছোটখাটো রচনা রয়েছে আমার। জীবনের সব পথেই যেতে চেষ্টা করেছি আমি। সমাজ ও মানব জীবনের গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যেতে পারেননি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন সেকথা। তাঁর সৃষ্টি সর্বত্রগামী হতে পারেনি, তিনি জানতেন। আমি তাঁরই পদচিহ্ন—অনুসারী ক্ষুদ্র এক লেখক। কিন্তু আমি আমার জীবন থেকে এ ক্ষোভ দূর করার চেষ্টা করেছি। সফল হয়েছি কি না হয়েছি সে বিচারের ভার আপনাদের। কিন্তু তবু আমার ভবিষ্যৎ রচনায় আমি নিজের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভাবে কাজে লাগাব বলে ঠিক করেছি। আপনাদের প্রীতি, শুভেচ্ছা, সম্মান আমি পেয়েছি। তবুও মনে হয় যে, সব কথা আমার আজও বলা হয়নি, লেখা হয়নি। আমি তাই আগামী রচনায় জীবনের পূর্ণরূপ-কে সম্পূর্ণ সত্য হিসাবে প্রকাশ করব, প্রকাশ করতে চাই। সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। এই রচনাই আমার নাম কালের দরবারে চিরস্থায়ী করে রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে চললেন তিনি, আমি বিশ্বাস করি সেই হবে আমার মহৎ ও বৃহত্তম সৃষ্টি। আর, একটু দম নিয়ে বললেন তিনি, সেই হবে আমার শেষ রচনা। আমার শেষ সাহিত্য সৃষ্টি।

বক্তৃতা শেষে সে-কি হাত তালি! কিন্তু অবাক হয়েছিলেন তিনি যখন

নানা রকমের, নানা ধরণের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করছিল গাঁয়ের পাঠকেরা। তাঁর নাম সবাই জানে, তাঁর লেখা সবাই পড়ে, তার ভক্ত অগুনতি—এসবই তার জানা। কিন্তু এতো গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে তারা পড়েছে তা' দেখে খুশী হন তিনি। এদের দাবীকে অস্বীকার করার সাধ্য তার কোথায়? লিখবনা বললেই কি আর তিনি নিস্তার পাবেন? রেহাই পেয়েছেন কোনও দেশের, কোনও কালের জনপ্রিয়, মহান লেখক? গুণমুগ্ধদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া কি অতই সহজ?

তাই কিছুতেই আর প্রোগ্রাম ঠিক রাখা গেল না। ওদেরই অনুরোধে আরও দু'দিন থেকে যেতে হ'ল। সুরপতিই কাকে পাঠিয়ে বাড়ীতে খবর পৌঁছে দিল। তারইতো ইচ্ছেটা বেশি। বাড়ীতে এতোবড়ো একজন লোককে পেয়ে ঠিকমতো আদর-আপ্যায়ন, যত্ন-আত্তি করতে না পারলে দশটা গাঁয়ের লোক বলবেই বা কি আর ভাববেই বা কি? বলবে, ইয়ুনিয়ন বোর্ডের হবু-প্রেসিডেন্টের মুরোদ নেই। সে লজ্জার হাত থেকে সুরপতিকে রক্ষা করবে কে?

ফলে যা-কে তা-কে কি আর সে বাড়ীতে আসতে দেয়? গ্রামের পাণ্ডারা ছাড়া আর কাউকেই সে কাছে ঘেঁষতে দিতে চায়না। কিন্তু নির্মলবাবু রাগ করলেন। তিনি জনতার লোক। জনতা তাকে চায়, তরুণরা তাকে চায়, তাদের বাদ দিয়ে কি তিনি চলতে পারেন? সাহিত্য কি জীবন ছাড়া? এই রকম গজদন্তের মিনারে বসে থাকলে কি জীবন-সংগ্রাম জানা যায় কখনও? বাজে কথার ফুলঝুরি তিনি মনেপ্রাণে ঘেন্না করেন। নির্মলকান্ত জীবনের সঙ্গে মিশে বাস্তব সাহিত্যই রচনা করে এসেছেন এতদিন। তাই তো তাঁর সাহিত্য এত প্রাণবন্ত। পড়লে মনে হয় কলজেটা যেন দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দেবে। কথাগুলি বেশ একটু জোর দিয়েই বলেছিলেন তিনি মাতব্বরদের সভায়। কেননা সত্যসন্ধানই যে তার মূলধন। কত তিক্ততা, কত সংগ্রাম করে এ সত্য জেনেছেন তিনি। আজ কে ভাবে সে কথা, জানতে চায়?

কিন্তু ঘরের কথা বাইরেও গিয়ে পৌঁছেছিল। এক ছোকরা তাই ভীড় ঠেলে, গেট খুলে ভেতরে চলেও এলো সরাসরি। সুরপতিই এবার এগিয়ে গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এলো তাকে। হাওয়া বদলটা সে বেশ ভাল বোঝে।

ছেলেটি বেশ স্মার্ট। সুতির একটা সাধারণ সার্ট-প্যাণ্টপরা। হাতে নির্মলকান্তরই লেখা একটা বই। কাছে এসে দু'হাত তুলে নমস্কার করে।

—আপনি রাগ করেননি তো? আমি চলে এলাম। মাথা নামায় সে। তারপর বইটা এগিয়ে দিয়ে বলে, যদি একটা কিছু লিখে দেন।

—কি হ'ল দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সবইতো পেলে। লেখাও পেলে, পদধূলিও পেয়েছ, আর কি চাই? সুরপতি যেন একটু ধমকই দেন।

ছেলেটি তবুও দাঁড়িয়েই থাকে। স্যার—কি যেন বলতে গিয়েও ইতঃস্তত করে সে। সুরপতিদের চোখের দিকে না তাকিয়ে বলে সে এবার—স্যার, যদি দয়া করে একবার আমাদের বাড়ীতে পদধূলি···।

—বলে কি হে ছোক্‌রা? ছেলেটা কে হে? আরে আগের সেই পাগলা থার্ডমাষ্টারের ছেলে রতন না? এটাও পাগল না-কি? নানান জনের ছোটবড়ো মন্তব্য ভেসে বেড়াতে থাকে।

অল্প একটু সময়ের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন নির্মলবাবু। ভাবলেন, হায় এমনি ভাবেই ক্ষমতা, লোভ আর আত্মদম্ভের বলি হয়েছে বুদ্ধিজীবি। ন্যায়, সত্য আর প্রেম-প্রীতির পথ থেকে লেখককে এই প্রীতির বসতিতে এসেও কি দূরে সরিয়ে রাখবে না-কি? তাও কি সম্ভব? ভাবতেও হাসি পায় তাঁর। ওরা কি চেনেনা নির্মলকান্তকে? সাহিত্য তিনি যে জীবনের রক্ত দিয়ে লিখেছেন।

—চলো, তোমার সঙ্গেই একটু ঘুরে আসা যাক্। বললেন নির্মলবাবু। এসো সুরপতি, আপনারাও চলুন না, একটু ঘুরেই আসা যাক্। আপনাদের গ্রামটারও সবটা দেখা হয়ে ওঠেনি। পা' বাড়ালেন নির্মলকান্ত।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়ে মানে ঠিকইতো, ঠিক কথা। গ্রামটাও দেখা হবে, কি বল হে? ভালই হল য়্যাঁ? তোমার কি মত সুরপতি? বলতে চাইল কে যেন। সুরপতির দল গাঁইগুঁই করতে গিয়েও থেমে গেল। নির্মলকান্ত এগিয়ে গিয়েছেন। কথা বলছেন রতনের সঙ্গে।

গ্রাম যেন চিরকাল সেই একই থাকে। একই রকম থাকতে হয়। নাহ'লে যারা 'লং ইন্‌দি সিটি পেন্ট' তারা মুক্ত আকাশ, বাতাস, মুক্ত মন পাবে কোথায়? তারওতো ছোট বেলাটা গ্রামেই কেটেছে। কত বন্ধুই না ছিল তখন—এক্কা-দোক্কা, কিত্‌কিত্‌, গোল্লাছুট্‌, হাডুডু—আঃ ভাবতেই কেমন যেন আনন্দ! কিন্তু বুকের ভেতরটা কেমন এক বেদনাতেও যেন শির্‌শির্‌ করে ওঠে। সে দিন কি আর কিরে আসে?

ক'টা ছেলেমেয়ে একটা বিরাট তেঁতুল গাছের নিচে ডাণ্ডা-গুলি খেলছে। গুলি জত্‌লাল খেলা নিয়ে চুলোচুলি, হাতাহাতিও শুরু হয়েছে অন্যধারে। কজন আবার তেঁতুল গাছে উঠেছে, নিচের থেকে দু-একজন ঢিলও ছুঁড়ছে। এ্যাই এ্যাই ছাড়িসনা হেবো, লেগে গেলে কিন্তু খেয়ে ফেলব। বেশী বয়েসী একটা ছেলে দূরে দাঁড়িয়ে কি সব ওস্তাদি ফলাচ্ছে। গাছের ছেলে-মেয়েদের কিন্তু পরোয়া নেই। খাচ্ছে আর বেমালুম কোঁচড়ে ভরছে। একটু এগোতেই চোখে পড়ল পুকুর, ডোবা। মোষগুলো শরীর ডুবিয়ে রয়েছে, কেমন আরামে। ওদের চড়াবার মালিক হয়তো এখন কার গাছের আম পাড়ছে। ভাবতে চান নির্মলকান্ত। ভাবতে কেমন যেন ভাল লাগে। ওদের দেখেও কারোই কোন হুঁশ নেই। নিজেদের নিয়ে কেমন মেতে আছে। আঃ এই জীবন যদি আবার আসত! একটা বটগাছের নিচের পাথরটা সিঁদুরে মাখা-মাখি। কার থান হে? ওলা বিবি, না দক্ষিণ রায়? ভক্তিভরে মাথা নামায় সুরপতির দল। সামনে গরু, বাছুর সব অলস ভাবে ঘাস চিবুচ্ছে, খড় খাচ্ছে। হেইগো পেন্নাম দা ঠাকুর, পেন্নাম হই বাবাঠাকুর—পথ চলতি প্রণাম জানায় গাঁয়ের লোক। কোথায় চল্লেন বাবামশাই, কত্তারা সব যাচ্ছে কোথায়? অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে কেউবা।

এইরকমই একটা গ্রামে তাঁরও ছেলেবেলাটা কেটেছিল। কী সুন্দরই না ছিল সেই সব সোনার দিনগুলি! কে দেয়, কে ফিরিয়ে দেবে আজ আর তাঁকে? এবারই কি আসতে পারতেন নির্মলকান্ত? সুমি-তো একটা সীনই ক্রিয়েট করেছিল। কি হবে ছোটলোকদের মধ্যে গিয়ে? কি সম্মান, কি আর নতুন পুরস্কার দেবে তোমাকে? ক' পয়সার বই কিনে উপকার করবে শুনি?

সুমি রাগে। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে আজকাল। আঃ সুমি, প্লীজ্, হেভেনস্ সেক্। একটু চুপ করো লক্ষ্মীটি। ওরা শুনতে পাবে যে। সুরপতিকে বিদায় করার জন্যে তখন কথাই দিয়ে ফেলেছিলেন তিনি।

এইতো জীবন। এওতো সেই সুমিই! অথচ সেবার টিভি-র ইন্টারভিউ-তে বলতে হ'ল, আমার স্ত্রীর প্রেরণা না পেলে আমার বোধহয় লেখাই হ'ত না। সুমি-ও কেমন হাসি-হাসি মুখে সাহিত্যসভায় গিয়ে হাজির হয়। ওরতো মাঝে মাঝে নিজেরই ক্লান্তি আর বিরক্তি লাগে এসব একঘেয়েমিতে।

কিন্তু উপায় কি? সুমি টাকা চায়। অনেক, অ-নে-ক টাকা। আরও নাম

আরও কিছু। একটু নিজের কাছে নিজেকে পেতে চান নির্মলকান্ত অনেক সময়। নিজের মনের সংগে তিনি কথা বলতে চান। বোঝাপড়া করতে চান। কেন ছোটবেলায় লেখার ভূত চেপেছিল তার মাথায়? আজকের ছেলেদেরও আদর্শতো সেই দু'টির একটি। হয় রবীন্দ্রনাথ হ'ব, নয়তো উত্তম কুমার। হয় সাহিত্য, নয়তো সিনেমা। নাম কেনার সস্তা হাতিয়ার। কিন্তু সে লোভতো তাঁর ছিল না। টাকারই বা কি দরকার তার? বাবা কি কম টাকা রেখে গিয়েছিলেন? তাছাড়া ছেলেটিও জয়েন করেছে ম্যানেজমেন্টে। কিন্তু সুমি আর সেসব ভাববার অবসর দেয় কোথায়? নিজেই যোগাযোগ করে সব ঠিক করে রাখে। তারপর রেসের ঘোড়ার মত দৌড়ে নামিয়ে দেয় তাঁ-কে। কেমন এক নেশায় পেয়ে বসে সুমিকে।

অথচ ছোট বেলায় মা, বাবা, দাদা, দিদি, বন্ধুরা সবাই কত উৎসাহ দিত। বাড়ীতে কেউ এলে তার লেখা বাবা, মা দেখাতেন। পরে বাবা টাকা করলেও ছেলেবেলাটা কষ্টেই কেটেছে তার, কিন্তু তা ভাবতেও কি যে আনন্দ! আজ আর ওসব কেউ ভাবে না। এখন কেবল প্রতিযোগিতা, গোপন ঈর্ষা। তাই কতবার ভেবেছেন সেই ছেলেবেলার আনন্দ-কে আবার ফিরে পাবেন। পুকুরে আবার ঝাপ দিয়ে পড়বেন। ফুটবল খেলতে গিয়ে বল পুকুরে পড়লে লাফিয়ে নামবেন বল তুলতে। মা যেমন বকা—ঝকা দিয়ে আবার গা মুছিয়ে দিতেন সুমিও সেরকম আদর করবে, বকবে।

বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে—সুমির গলাটা এখনও স্পষ্ট শোনা যায়। কী কর্কশ, কী বীভৎস! অথচ এই সুমিই একদিন কবিতা লিখত। প্রেমের কবিতা। আজ সুমি একটা ময়দার বস্তা। তার শরীর এখন কবিতাকে পাত্তা দেয় না। তার চাহিদা আজ বেড়েই চলেছে। আজ সে টাকার ছন্দ মেলায়। মেলাতে ভালবাসে। শোনো, 'অন্য ভুবনে' তুমি একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছ। দশ হাজার টাকা। পনের দিন পর থেকেই লেখা যাচ্ছে, কথাটা খেয়াল রেখো। সেদিনের ছোকরা সুভাষ দেবনাথ এক বছরেই দু' দু'টো বাড়ী হাঁকড়েছে, সে কথাও মনে রেখো। স্বামীকে দিয়ে নিজে না লেখার অভাবটা সে পূর্ণ করে দেয় এভাবেই। সাহিত্যের এতবড়ো উপকার আর ক'জন, কবে করেছে?

মাঝে মাঝে তাই ভীষণ উত্তেজনা জাগে নির্মলকান্তর। মনে হয় পালিয়ে বাঁচেন কোথাও। কোথাও গিয়ে একটু রিল্যাকস্ করে কিছু আনন্দ পান।

এই যেমন এই জায়গায়, এখানে নয়তো অন্য কোথাও।

—ওদিকে নয় স্যার, এদিকে। এই বাঁ হাত ঘুরলেই আমাদের বাড়ী। ছেলেটি এগিয়ে এসে পথ দেখায়। কি যেন ভাবছিলেন তিনি? কই, কিছু নাতো!

মাটির ঘর। সামনে এক বারান্দা। সেখানেই এক চৌকির ওপর সদ্য কাচা একটা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে সুন্দর করে। চোখ ফেরালেন নির্মলকান্ত উঠোনের দিকে। তুলসী মঞ্চ। ওপরে জলধারা। পাশে ক'টা ফুলের গাছ; এলোমেলো ছড়ানো। এদিকে একটা মাটির উনুন। বোধহয় মুড়ি ভাজে কেউ। ওপাশে একটা মাচা করা, কি গাছ তুলে দেবে ওর ওপর?

—স্যার। আমার বাবা, উনিই আপনাকে আনার জন্যে বলেছিলেন।

—নমস্কার। হাত তুললেন নির্মলকান্ত।

—বাবা চোখেই দেখতে পান না ক বছর। ছেলেটি মুখ নামিয়ে জানিয়ে দেয় কথাটা ফিস্‌ফিস্ করে।

রথীনবাবু একটা জলচৌকির ওপর বসে কথা বলছিলেন। নতুন একটা জামা তাকে এখনই পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি দু'হাত তুলে নমস্কার জানালেন। খোকা, কে কে এসেছেন রে?

—তুমি যাঁর কথা বলেছিলে তিনি। গাঁয়ের সুরপতিবাবু, রমেনবাবুরাও আছেন।

রথীনবাবুর গলা আজও সতেজ রয়েছে। দেখুন আমি সমস্ত জীবন একটা আদর্শকে মূল্য দিতে চেয়েছি। সেই আদর্শ-র জন্যে আমার জীবনটাই বলতে পারেন বিষ হয়ে গিয়েছে। ভেবেছি, কেন এমন হল? এমন তো হবার কথা ছিলনা। তাই ইচ্ছে ছিল আমার স্বপ্ন নায়কের স্রষ্টার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে তার কাছে জানতে চাইতাম সবই কি তার মন গড়া চরিত্র, বাস্তবের কি কোনও চিহ্নই নেই তার রচনায়? বাস্তব জীবনে কি তার কোনও দামই নেই? দেবেনা কেউ?

কিন্তু আমাকে? মানে আমার কাছে কি জানতে চান আপনি? আ ঠিক বুঝতে পারছিনা। কেমন যেন একটু হকচকিয়েই যান নির্মলকান্ত।

—আপনিই লেখক নির্মলকান্ত মৈত্র নন? বেশ জোর দিয়ে বললেন তিনি।

—হ্যাঁ। ঐটিই আমার পিতৃদত্ত নাম বটে। নিজেকে ঠিকমতো পরিচিত করতে পেরে আশ্বস্ত হন নির্মলকান্ত যেন।

—তবে ? তীব্রভাবে বলে চলেন রথীনবাবু। সমস্ত শিরায় উপশিরায় কে যেন হাতুড়ি দিয়ে মারা শুরু করল নির্মলকান্তর। নিজেকে যেন সম্পূর্ণ অনাবৃত করে আজ তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন শেষ বিচারের রায় শুনতে। বলতে চান 'মিথ্যা' গল্পটি আপনার লেখা নয় নির্মলবাবু ? পুরন্দরের চরিত্রটি আপনার আঁকা নয় ?

হায় ভগবান ! এর থেকে ঘরে তুমি বাজ ফেললে না কেন ? কেন তুমি নির্মলকে আগুনের ওপর জ্যান্ত ঝলসালে না ? সেও যে এর থেকে অনেক সুখের ছিল। কে চেয়েছিল তোমায় কাছে এমন করে কৈশোরের স্মৃতি ভিক্ষা ?

সুখ কি দুঃখ ছাড়া আসে না ? সুখ-কে কি আলাদা সরিয়ে নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দেওয়া যায়না ? সেই সাব ডিভিশন শহরে থাকার সময় লুকিয়ে চুরিয়ে শঙ্কর ব্রহ্ম, প্রবীর রায়, দেবানন্দ দে আর নির্মল মিলে একটা লিটল ম্যাগাজিনই বের করে ফেললে সেবার। বেদব্যাস। কি সুন্দর একটা নাম ছিল কাগজটার। প্রবীরদা, দেবুদা তখন কলেজ প্রায় শেষ করে এনেছেন, শঙ্করদার সেকেণ্ড ইয়ার। আর নির্মল ? সে তখন স্কুলের শেষ ক্লাসের পোড়ো। ঐ বয়সেই লিখে ফেলল 'মিথ্যা'। নায়ক পুরন্দরের জীবনের সংঘাত ও সমাধানের ইঙ্গিত।

—কিন্তু দেখুন ওটা আমার জীবনের প্রথম লেখা। কাঁচা লেখা, বাজে লেখা। ওটা আমার কোনও সঙ্কলনেই যায়নি। আমি তারপর কত বই লিখেছি, কত ভাল ভাল বই। পুরন্দরের থেকেও কত সব পাওয়ারফুল ক্যারেকটার।

রথীনবাবুর কানে বোধ হয় কোনও কথাই যায়নি। নির্মলবাবু চুপ করে গেলেন। রথীনবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন। হাত দুটো বুকের ওপর নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—নির্মলবাবু, কথা বললেন রথীনবাবু, জীবনে একটা আদর্শ, একটি আকাঙ্ক্ষা, একটা সন্তোষ লাভই কি চরমকাম্য নয় ? আমি ক্ষুদ্র লোক। আপনারা বিদ্বান, আপনারা এসব কথা ভাল বুঝতে পারবেন। জীবনের জাঁতাকলে পড়ে আমি সাহিত্যপাঠের অবসর আর পাইনি। স্কুলে ছাত্র ঠেঙ্গিয়েছি। তাদেরই বই পড়েছি, নোট তৈরী করেছি। কিন্তু জীবনের ধ্রুবতারা করে রেখেছিলাম আপনারই পুরন্দর-কে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা,

জীবন সংগ্রাম, জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনা আমাকে বারবার পথ দেখিয়েছে। খোকাকেও আমি সে কথাই বলি বারবার। পুরন্দর হ'রে খোকা। পুরন্দর হ'। কিন্তু আজ, আজ বুঝতে পারছি সে আর আপনার নয়। আমার, কেবল আমারই সে। আমার প্রশ্নের জবাব আজ যে আমাকেই খুঁজতে হবে। পুরন্দরের কথা আপনি আর সে ভাবে ভাবেন নি। আপনাকে কষ্ট দিলাম বৃথাই এই গরীবখানায় এনে। কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি, এবার বসে পড়লেন ধুপ্ করে। আবেগে গলাটা ধরে এসেছিল তাঁর।

রতন এরই মধ্যে বোনের সাহায্যে সবাইকে চা, বিস্কুট দিয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ তার সৎ-ব্যবহারেও লেগেছেন।

কিন্তু নির্মলকান্তর সমস্ত মাথাটা যেন দুলে উঠল। জীবনে একটি অকাঙ্ক্ষা, একটি সন্তোষলাভই কি চরম কাম্য নয়? সন্তানও তো সেই স্যাটিসফ্যাক্শনেরই অন্য নাম। জীবনে এর বেশী কি চায় মানুষ? একটি সৃষ্টিতে, একটি কর্মে, একটি ভাবের উদ্বোধনেই মানুষতো সমকালীন আর উত্তরসূরীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। ঐ একটিই তো আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনে। ঐ চিরস্থায়িত্ব। এই লোভ, ঐ মোহ।

কোন্ সুদূর গাঁয়ের এক মানুষ যদি এই চল্লিশ বছর পরেও নির্মলকান্ত মৈত্র-কে মনে রাখে মিথ্যা-র জন্যে, তবে চারশ বছর পরেও কি তাঁর নামটা মুছে যেতে পারে কখনও? তাও কি সম্ভব নাকি?

জীবনের এক একটা ছোটখাটো ঘটনা এভাবেই জীবনের সব ভাবনা-চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। জীবনের ঈশ্বর মাত্র একবারই একজনের জীবনে প্রকাশিত হন। পরম ব্রহ্মের আস্বাদনও মানুষ জীবনে একবারই পায়। সেই উপলব্ধি নির্মলকান্তর জীবনেও এল এবার, এমনি আচমকাই।

তারপর? আমি অবাক বিস্ময়ে নির্মলবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। নরেন্দ্রপুরের কাছে কামালগাজীর এই আশ্রমে ওর সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ-ই। একটা ধুতি লুঙ্গির মতো পরে ক্ষেতে কাজ করছিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি জীবনের পূর্ণ আনন্দকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন? আপনি কি স্যাটিস্ফায়েড? কি মনে হয়?

আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চশমার লেন্সটা মুছে নিলেন একবার। হাসলেন। বড় মৃদু সে হাসি। বড়

বিষণ্ণ। বললেন, কি মনে হয়? বললাম, সুমিতা দেবী, মানে আপনার স্ত্রী-কে দেখছি না যে, তিনি আসেননি? এবার হা-হা করে হেসে উঠলেন নির্মলবাবু। বোকা ছেলে! ওহো···হাঁা হাঁা···কি যেন বলছিলাম? তারপর কি হল?

বাড়ী ফিরেই নির্মলকান্ত তার ভবিষ্যৎ উপন্যাসের খসড়া, প্রকাশিত রচনা, বই সব এনে জড়ো করে ফেললেন বাগানের ঠিক মাঝখানটাতে। ইউক্যালিপটাস্ গাছের একটু পাশ ঘেঁষে। গাড়ী থেকে পেট্রল বের করে এনে ছড়িয়ে দিলেন তার ওপর। একটা কাঠি নিয়ে সিগারেট ধরালেন। কয়েক সেকেণ্ড কি যেন ভাবলেন। তারপর প্রচণ্ড আবেগে সেই কাঠিটাই ছুড়ে দিলেন ঐ জঞ্জালের স্তূপে। আবর্জনা! জঞ্জাল! নয়তো কি? বিড়্ বিড়্ করলেন কবার। চল্লিশ বছর ধরে এক পাও আর এগোতে পারেননি। তার বাণীর দেউল আর গগন স্পর্শ করেনি, করবে না।

স্বামী পাগল হয়ে গিয়েছে মনে করে সুমি দমকলে ফোন করতেও ছুটেছিল। ছুটোছুটি করে হাঁকডাক করল সে, রামসেবক, যুগল, সরোর মা। কিন্তু এবার তাকে বাধা দিলেন নির্মলকান্ত নিজেই। কোনও লাভ নেই সুমি। ওদের সবাইকেই আজ ছুটি দিয়েছি। সমস্ত ঘরে, গেটে তালা দেওয়া। এসো সু, তুমিও এসো বাগানে। এসে ছাখো জীবনের আনন্দ কিভাবে আসে মানুষের জীবনে। তার হাত ধরতে চান নির্মলকান্ত।

সুমি কোনও কথা বলেনা। কেবল গোলাপ ঝাড়ের নিচে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে। কাঁদুক, আরও কাঁদুক আজ। নির্মলকান্তই চান, সুমি আরও কাঁদুক আজ।

পাশে একটু সরে গিয়ে চুপচাপ একটার পর একটা সিগারেট শেষ করতে লাগলেন তিনি। আগুনের হল্কা, বইয়ের টুকরো টুকরো পাতা, ছাই হাওয়ায় উড়ে বেড়াতে লাগল। নির্মলকান্ত সেদিকে তাকিয়েও যেন তাকালেন না। শহরের প্রান্তসীমায় তাঁর বাড়ী। অনেকটা জায়গা জুড়ে। পাড়ায় এমন কেউ নেইও যে ছুটে আসবে আগুন দেখে। বইগুলোতে তিনি প্রতিদিন হাত বোলাতেন, ভুলে গেলেন সেকথা। সুমি দিনে-রাতে ওগুলোকে পেটের ছেলের মতোই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত—মনে পড়লনা তাও। মনে যেন কোনও ঘটনাই দাগ কাটেনা। দাগ রাখতে পারেনা। আজকের জীবনের হৈ হৈ রৈ রৈ সবই কি ইতিহাস বুকে ধরে রাখে? প্রকৃতি বড় নির্মম, বড়

নিষ্ঠুর। অক্ষমতাকে, অসম্পূর্ণতাকে সে ক্ষমা করে না। সুমি এসব বুঝবে না, বুঝতে চাইবেনা। সে কেবল চেতনা হারিয়ে ফেলবে কাঁদতে কাঁদতে।

তারপর আকাশে, বাতাসে সমস্ত ছাই উড়িয়ে দিলেন নির্মল-কান্ত। পকেট থেকে অতি সাবধানে একটা বই বের করলেন তিনি। সেই বেদব্যাস। সেই অবুঝ মনের আত্মপ্রকাশ। ভাঁড়ার ঘরের ধূলোর পাহাড় থেকে গোপনে খুঁজে বের করে আনা পত্রিকা। ক'টা সংখ্যা বের করেছিল নির্মলরা? একটাই? না দুটো? ছেলেবেলার সেই আবেগ, ভালবাসাকে বুকের কাছে নিবিড় করে ধরতে চাইলেন তিনি।

এগিয়ে গেলেন এবার নির্মলকান্ত সুমির কাছে। সস্নেহে টেনে তুললেন তাকে। জড়িয়ে ধরলেন আবার সেই পুরনো দিনের উষ্ণতায়। চোখের জল মুছিয়ে দিলেন তার।

সুমি, দুঃখ কোরোনা। এসো আজ তোমাকে একটা নতুন লেখা পড়াই। এ আমার প্রথম লেখা। এতদিন এ লেখা বাজে ভেবে সবার কাছে আমি গোপনই করে এসেছি। কিন্তু এ আমার প্রথম প্রেমের অবৈধ সন্তান নয়। এ যে আমার পুরুষোত্তম কর্ণ। আমি আজ জেনেছি, চল্লিশ বছর পরেও আমি এর থেকে ভাল আর কিছু সৃষ্টি করতে পারিনি। সৃষ্টিকর্তা ঐ একবারই আমার কাছে ধরা দিয়েছিলেন। সেদিনের আনন্দের মধ্যেই আমি জীবন-স্বাদ উপভোগ করতে পেরেছিলাম। আমি আজ ঠিক জেনেছি এ লেখাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। তুমি কেঁদোনা সুমি। এসো। দুঃখ শেষ করে আনন্দকে, পরমব্রহ্মকে আমরা আজ খুজে নিই। তুমি একটু হাসো সুমি। প্লীজ একটু হাসো। আবেগে থরথর করে কাঁপতে থাকেন নির্মলকান্ত। এসো আমরা একটু হাসি। সেই প্রথম জীবনের মতোই সুমির হাত ধরে নির্মলকান্ত ছুটে বেড়াতে চান সমস্ত মাঠময়। অকারণ খুশীতে, প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়তে চাইলেন, হারানো জিনিস খুঁজে পেয়ে পুলকিত হ'তে ইচ্ছে হ'ল। চোখে মুখে সাফল্যের ঝিলিক যেন খেলে বেড়াতে লাগল তার।

আজও তাঁর সেই আনন্দের হাসি কান পাতলেই শোনা যায়। শুনতে ইচ্ছে করে।

ফকীরমোহন সেনাপতি

আত্মজীবন চরিত

মূল ওড়িয়া থেকে অনুবাদ : দিলীপকুমার বিশ্বাস

১০

ঠাকুরমার পরলোক-গমন (১৮৬৯)।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনে, বিকাল পাঁচটায়, আমার প্রতিপালিকা ঠাকুরমা কুচিলা দেই পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় চুয়াত্তর বছর। মনে হয় যেন আমার জীবন রক্ষার জন্যই পরমেশ্বর তাঁকে সে পর্যন্ত পৃথিবীতে রেখেছিলেন। আমি যখন আত্মরক্ষায় সমর্থ হলাম, তারপর এই জঞ্জালময় সংসারে তাঁর আর বেশীদিন থাকবার প্রয়োজন হল না।

আমার ঠাকুরদাদা কুশ সেনাপতি মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে দারোয়ান বা জমাদার-এই জাতীয় একটা কিছু নিতান্ত ছোটখাট চাকরী করতেন। সেই বিদেশেই তাঁর মৃত্যু হয়। সে সময়ে ঠাকুরমা কোলে দুটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান নিয়ে নিরাশ্রয়া হয়ে পড়েন।

ঠাকুরমা গৌরবর্ণা, মধ্যমাকৃতি, সুগঠিতদেহা, নীরোগ ও কর্মিষ্ঠা ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি। মাথার অর্ধেক চুল ছিল কাঁচা। তিনি ধীর প্রকৃতি ও সরল স্বভাবা ছিলেন। তাঁকে কখনো চিৎকার করে কথা বলতে কেউ শোনেনি। সেকালে গ্রামে কয়েকটি কলহপ্রিয়া বিধবা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঝগড়া লাগলে ঠাকুরমা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। তাঁর বড় পুত্রবধূ আমার জ্যাঠাইমা—কিছু গর্বিতা ও কটুভাষিণী ছিলেন। তিনি কোনো কারণে তর্জন-গর্জন করে গালাগালি দিতে সুরু করলে ঠাকুরমা সেখান থেকে পালাতেন ; মনোবেদনা অসহ্য হলে ঘরের অন্ধকার কোণে লুকিয়ে বসে অশ্রুপাত করতেন। তাঁকে উচ্চহাস্য করতেও কেউ কোনোদিন শোনে নি। সর্বদা যেন এক বিষাদ কালিমার ছায়া তাঁর মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। তিনি ছিলেন অতি নিষ্ঠাবতী ও ধর্ম-পরায়ণা—সব রকম ব্রতের অনুষ্ঠান নিষ্ঠাভরে পালন করতেন। বছরের

অধিকাংশ সময়ই তাঁর কাটতো উপবাসে ও হবিষ্যান্নভোজনে। গোমাতার কাঁধে—অর্থাৎ গরুর গাড়ীতে চড়া পাপ বিবেচনায় তিনি পায়ে হেঁটে অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। তিন-চার মাস অন্তর বাতজ্বরে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া আমি তাঁকে অন্য কোনো রোগে শয্যাগত থাকতে কখনো দেখিনি।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত তিনি মাথা নিচু করে এক মনে কাজ করে যেতেন; প্রয়োজন ছাড়া কারও মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন না। দুপুরে স্নানের পর পূজাসেবা ও সন্ধ্যায় মালাজপ ও পুরাণ শ্রবণ ছাড়া অন্য সময়ে তিনি বাড়ীর কাজে লেগে থাকতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে পরিবারস্থ সকলের আহার ও শয়নের পরে নিজে আহার ও শয়ন করতেন। তিন-চার ঘণ্টার বেশী তিনি ঘুমাতেন না। সে ঘুমও এত পাতলা ছিল যে ঘরের মধ্যে সামান্য শব্দ হলে বা কেউ একবার ডাকলেই উঠে পড়তেন।

তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ছিল তিনটি বাঁশের ঝাঁপি। এর মধ্যে একটি ছোট ঝাঁপি নানারকম শিকড়-বাকড় ও ওষুধ-বিষুধে পূর্ণ। দ্বিতীয়টিতে থাকতো বাগানের বিভিন্ন সাময়িক ফসলের বীজ। তৃতীয়টি বিরাট; সংসারের যা কিছু ভাঙ্গা-চোরা জিনিষপত্র—সব এটিতে জমানো থাকতো, কিছুই ফেলে দেওয়া হতো না। বাড়ীর বা গ্রামের কোনো ছেলের অসুখ করলেই আসতো তাঁর কাছে—তিনি চিকিৎসা করতে বসতেন। বাড়ীর পিছনে একটি ছোট বাগান—অবসর পেলেই এক মালিকে নিয়ে বাগানের কাজে লেগে যেতেন ঠাকুরমা। সময়কার ফলমূলে বাগিচা সর্বদা ভরা থাকতো—বাজার থেকে তরি-তরকারী কিনবার দরকারই হতো না। ঠাকুরমা চলে গেছেন—বাগানে তাঁর নিজের হাতে লাগানো আমগাছগুলি আজও দাঁড়িয়ে।

সংসারে সকলের সেবা ও তার জন্য অশেষ কষ্টভোগ তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তাঁর কষ্টের বিশেষ কারণ হয়েছিল আমার পিতার অকাল মৃত্যু। আমার জীবনরক্ষার জন্য যে দুঃখ তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে তা এখন মনে করলে আমার প্রাণ যন্ত্রণায় বিকল হয়। আমার পীড়ার সময়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কত দিন রাত্রি এই রোগীর সেবায় তিনি অতিবাহিত করেছেন। গরু মাঠে চরতে চরতেও যেমন নিজের বাছুরের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখে—তেমনি ঠাকুরমা যে কোনো কাজেই নিযুক্ত থাকুন না কেন তাঁর দৃষ্টি সর্বক্ষণ আমার প্রতি ছিল। প্রথমবার যখন কলিকাতা যাই তখন আমার

বয়স কুড়ি-বাইশ হবে। কলিকাতা থেকে ফিরে যখন বাড়ী পৌঁছেছিলাম, মনে আছে, তখন সন্ধ্যা ; ঠাকুরমা আমাকে দেখামাত্র পাগলিনীর মত দিশাহারা হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আধঘণ্টা ধরে ঘরে, বারান্দায়, উঠানে ছুটে বেড়ালেন। আমার অসহায় জীবনরক্ষার একমাত্র কারণ ঠাকুমার নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ,—আমার জীবনে যা কিছু উন্নতি তা সবই ঠাকুমার পুণ্যের ফল। তাঁর মৃত্যু আমার জীবনের এক বিশেষ শোকাবহ ঘটনা।

১১

সেকালের নানা কথা।

পূর্বোল্লিখিত সমিতি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ওড়িয়া ভাষার বহুল প্রচারের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিল বালেশ্বরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত রেমণা গ্রাম। বহু কাল থেকে এই গ্রাম বাঙ্‌লাদেশ ও ওড়িশায় সুপরিচিত। এখানে সুবিখ্যাত গোপীনাথ জীউর মন্দির অবস্থিত। চৈতন্যদেব পুরীযাত্রার পথে এই মন্দিরে বাস করেছিলেন।[১] আমরা সমিতির প্রায় সমস্ত সভ্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায়ে রেমণা যাত্রা করলাম। সঙ্গে গেলেন স্কুল বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্‌টার বাবু শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য। রেমণার কায়স্থ পল্লীর কাছাকাছি স্কুল স্থাপন করা হল। আমাদের সহপাঠী বাবু নবকুমার ভট্টাচার্য সঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন। হিসাব করে দেখা গেল দু'জন শিক্ষক, একটি ভৃত্য ও অন্যান্য খরচ বাবদ মাসিক পঁচিশ টাকার প্রয়োজন হবে। মহারাজা বাহাদুর (সে-সময়ে রাজা) বৈকুণ্ঠনাথ দে একাকী সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে প্রস্তুত ছিলেন—তিনি এক বছরের খরচ বাবদ আমার হাতে অগ্রিম তিনশ টাকা দিলেন।

বালেশ্বর সহরের মোতিগঞ্জবাজারের দক্ষিণ প্রান্তে গড়্‌গড়িয়া নামে একটি পুষ্করিণী আছে। এটি বটেশ্বর মৌজার অন্তর্গত। অধিকাংশ বিদেশী আমলা, কেরানী ও শিক্ষকের এই গ্রামে বাস। কখনো কখনো ডেপুটি, মুন্‌সেফ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও সেখানে বাসা নিতেন। গড়্‌গড়িয়ার পূর্ব-প্রান্তে একটু দূরে কবিবর রাধানাথের বাসা। পশ্চিম দিকে আর কিছু দূরে আমার বাড়ী। বাবু মধুসূদন দাস[২] সে-সময়ে বালেশ্বর জেলা স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাসাও গড়্‌গড়িয়ার কাছেই। গ্রীষ্মকালে আমরা

প্রায় প্রতিদিন পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও বায়ুসেবনের জন্য এই পুষ্করিণীর বাঁধানো ঘাটে জমা হতাম। পিতার শাসনের ভয়ে রাধানাথ দিনের আলোয় প্রকাশ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর এসে হাজির হতেন। কিন্তু মধুসূদন প্রত্যহ এসে আমাদের দলে যোগ দিতেন। সেই তরুণ বয়সে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের বিস্মিত করতো। পরে তিনি বালেশ্বরের চাকরী ছেড়ে কলিকাতা চলে যান।

আমার ইংরেজি শিখবার ইচ্ছা। একটি ফার্স্‌ট বুক্ সংগ্রহ করে গড়্‌গড়িয়ার ঘাটে সমবেত বন্ধুগণের সাহায্যে পড়তে আরম্ভ করলাম। আমার এক বন্ধু, স্থানীয় জেলায় স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। তিনি মাত্র কয়েকদিন আমাকে খানিকটা পড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে আমি নিজে নিজে ডিক্‌শনারীর সাহায্যে 'আরেবিয়ান্ নাইট্‌স', 'রবিন্‌সন ক্রুশো', 'বেঙ্গল পেজেণ্ট্ লাইফ্', 'বাইবেল্' ইত্যাদি কয়েকখানা মাত্র ইংরেজি বই পড়েছিলাম। এইটুকু ইংরেজি-শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে আমার অনেক কাজে লেগেছিল।

স্থানীয় ওড়িয়া ও বাঙালীর মধ্যে সে-সময়ে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতো। সেকালে উৎকলের সর্বত্র সরকারী মহকুমাগুলিকে প্রধান কর্মচারীরা সকলেই ছিলেন বাঙালী। ওড়িয়া ভাষা হটিয়ে বাঙলা চালাবার ব্যাপারে তাঁরা সকলেই একমত। সাধ্যমত নিজ নিজ মহকুমায় বাঙ্‌লা-ভাষা প্রবর্তন করতে সকলেই সচেষ্ট। কোনো পদ খালি হলেই নিজের লোককে সেখানে বসাতে এঁদের প্রত্যেকের প্রাণপণ প্রয়াস। পাব্‌লিক ওয়ার্ক্‌স ও ডাক বিভাগে একজনও ওড়িয়ার প্রবেশাধিকার ছিলনা। বালেশ্বর জেলার তখনকার সর্বপ্রধান জমিদার ছিলেন চুচুড়ানিবাসী বৃন্দাবন চন্দ্র মণ্ডল। লোকটি এদিকে খুব সাহসী, বুদ্ধিমান ও দানশীল; কিন্তু দুর্দান্ত মাতাল ও ক্রোধী ছিলেন। মদের বোতল তাঁর নিত্যসঙ্গী—বোতল ও গ্লাস বিছানায় না থাকলে রাত্রে ঘুম পর্যন্ত আসতো না। বালেশ্বরের সমস্ত বাঙালী কর্মচারী তাঁকে মুরুব্বী গণ্য করতেন। সন্ধ্যা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত মণ্ডলবাবুর কাছারিবাড়ীতে সমস্ত বাঙালী ভদ্রলোকেদের বৈঠক বসে। সাম্প্রতিক বৈঠকের প্রধান বিচার্য—কি উপায়ে সরকারী দফ্‌তরগুলি থেকে ওড়িয়া হটিয়ে বাঙলা চালানো যায়।

উক্ত বিষয়ে সভাসমিতিতে বক্তৃতা, 'সংবাদ-বাহিকা' পত্রে লেখালেখিও

প্রকাশ্যে তীব্র তর্ক-বিতর্ক করায় আমি স্থানীয় বাঙালী সমাজের পরম শত্রু হয়ে পড়লাম। বাঙালী বাবুরা নিদারুণ ঘৃণাবশত আমার নামপর্যন্ত আর উচ্চারণ করেন না—বলেন, 'শালা রিং লিডার!' বারবাটী স্কুল-কমিটির সাতজন মেম্বারের মধ্যে ছয়জনই ছিলেন বাঙালী, আমি একমাত্র ওড়িয়া। একদিন কমিটির আহূত অধিবেশনে দৈবাৎ আমি অনুপস্থিত ছিলাম। বৃন্দাবনবাবু প্রস্তাব করলেন, "ফকীরমোহনকে কমিটি থেকে তাড়ানো হোক-না হলে আমি সভ্য থাকব না।" কমিটি ভীষণ বিপদে পড়লেন। স্কুল চলে চাঁদার জোরে। চাঁদাদাতা বাঙালী-ওড়িয়া সংখ্যায় সমান সমান। বৃন্দাবন-বাবুকে ছাড়লে বাঙালীদলের কাছে চাঁদা আদায় হবে না,—আবার আমাকে ছাড়লে ওড়িয়ারা স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন। বৃন্দাবনবাবু স্কুলের সমস্ত ব্যয় বহন করতে স্বীকৃত হওয়ায় আমাকে কমিটি থেকে বহিষ্কৃত করা সাব্যস্ত হ'ল। তার ফলে ওড়িয়ারা সকলেই চাঁদাবই থেকে নাম তুলে নিলেন। বৃন্দাবনবাবু কয়েকমাস স্কুলের খরচ চালিয়ে টাকা দেওয়া বন্ধ করায় শেষপর্যন্ত স্কুল উঠে গেল।

এই ঘটনার পরবর্তী সপ্তাহে গভর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হল যে আমি বালেশ্বর জেলা স্কুল কমিটির সভ্য নিযুক্ত হয়েছি। সে-সময়ে জেলাস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন শ্রীনাথ দত্ত। গেজেটে ঐ সংবাদ প্রকাশিত হবার পর একদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি হাসতে হাসতে আমায় বলেন, "মশাই, কিছুতেই আপনাকে আঁটতে পারলাম না।"

বাঙালীবাবুদের অপ্রীতিকর আর একটি ঘটনা তখন ঘটেছিল। আমি ওড়িয়াতে "ভারতবর্ষর ইতিহাস" রচনা করি। বইখানি ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। এটি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য নির্ধারিত হয়। এই পুস্তক রচনার জন্য স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টার আমাকে সাতশ ও কমিশনার রেভেনশ সাহেব তিনশ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।

সেই সময়ে বাইবেল ও অন্যান্য পুস্তক থেকে ও পাদ্রীসাহেবদের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে খবর পেয়েছিলাম—একমাত্র প্রভু পরমেশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্তা ও ঈশ্বরের পুত্র যীশুখ্রীষ্ট আমাদের ত্রাণকর্তা। খ্রীষ্টের নামে 'ডুবিত'[৩] না হলে মৃত্যুর পর গতি অনন্ত নরকে। এই সঙ্গে মনে ধারণা জন্মাল—ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন—তখন তাঁর উপাসনা করলে তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন। এই সব দেবদেবীরা তবে কে ?

প্রতি গ্রামে গ্রামদেবতা, মন্দিরে মন্দিরে কত দেবতা,—এতগুলি দেবতার পূজা করি কেমন করে? এঁদের তো ত্রাণ করবার শক্তি নেই। পূজা করেই বা তাহলে লাভ কি? কবি রাধানাথকে এই সমস্যার কথা বললাম—এ অবস্থায় কর্তব্য কি তা নিয়ে দুজনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিচার চলল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল দুজনে একদিনে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত রাধানাথ একদিন স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে পারবেন না। একলা খ্রীষ্টান হতে আমার সাহসে কুলাল না।

এর কিছুকাল পরে কলিকাতা থেকে ঈশানচন্দ্র বসু নামে এক ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক বালেশ্বরে আসেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। প্রতিদিন আমাদের ধর্মবিষয়ে আলোচনা হয়। ক্রমশ ধর্মালোচনা ছেড়ে তিনি ভাষা-আলোচনা সুরু করলেন; উদ্দেশ্য-প্রমাণ করা বাঙলা বড় ভাল ভাষা, ওড়িয়া ভাষাটা ভাল নয়। এতে আমার বড় রাগ হল। আর তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি।

এ-ঘটনার বহুদিন পরে বালেশ্বর নিমক-মহলে প্রসন্নকুমার চাটুর্জ্যা নামক এক কেরানী নিযুক্ত হয়ে এলেন। শুনলাম লোকটি ব্রাহ্ম। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে আলাপ করলাম। প্রসন্নবাবুর বাসা ছিল ঝাড়েশ্বর মহাদেব মন্দিরের পিছনে। বাসা ও মন্দিরের মধ্যে মাত্র একটি সরু গলির ব্যবধান। প্রতি রবিবার রাত্রে তাঁর বাসায় ব্রহ্মোপাসনা হতো। উপাসনার পর আমরা উপাসকরা বসে মদ্যপান করতাম। সে-সময়ে কিছু ব্রাহ্মের নিকট মদ্যপানটা উপাসনার অঙ্গস্বরূপ হয়ে পড়েছিল। বাঙলাদেশে ঋষিতুল্য অনেক ব্রাহ্ম মহাত্মারও মদ্যপানে আপত্তি ছিল না।[৪]

কয়েকমাস পরে স্থির করা গেল প্রকাশ্যরূপে একটি ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করা হবে। উপাসক হিসাবে আমাদের পূর্বোক্ত সমিতির সভ্য—দামোদরপ্রসাদ দাস, গোবিন্দপ্রসাদ দাস, জয়কৃষ্ণ চৌধুরী, ভোলানাথ বাবু (সামন্ত রায়) ছাড়া সময়ে সময়ে অন্যান্য কয়েকজন সঙ্গীও উপাসনায় যোগ দিতেন। বালেশ্বরের মোতিগঞ্জ বাজারের পশ্চিম প্রান্তে ময়ূরভঞ্জ-মহারাজের একটি পাকা বাড়ী ছিল। সহরের লোক সেটিকে 'রাজা-কোঠা' (রাজবাড়ী) বলতো। সেই রাজা-কোঠায় ১৮৬৭-৬৮ সালে, সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকালে, নিয়মিত উপাসনা আরম্ভ হল। এতকাল পর্যন্ত বালেশ্বরবাসী ব্রাহ্মধর্মের নাম শোনেননি। ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনের খবর শুনে স্থানীয় প্রধান ব্যক্তি চমৎকৃত হলেন। প্রশ্ন উঠল,

ব্রাহ্মধর্ম বস্তুটি কি ? কাছারিতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। সবাই বলল, "এ সেই মিট্‌মিটে শয়তানের কাজ। কুলমাহাত্ম্য তো আগেই গিয়েছিল—এবার জাত খোয়াতে চলেছে।"

৩

বিবাহ (১৮৫৬ ও ১৮৬১)

তের বৎসর বয়সে জ্যাঠামশায় পুরুষোত্তম সেনাপতির আদেশে মাণিক-খম্বনিবাসী নারায়ণ পরিজার কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। আমার উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রথমা পত্নী জীবিতা ছিলেন। তিনি অতিশয় নিষ্ঠুরা, দাম্ভিকা, কটুভাষিণী ও আমার বিরুদ্ধাচারিণী ছিলেন। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেন মনোমালিন্য না ঘটে এ-বিষয়ে জ্যাঠাইমা সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন। ছেলেবেলাকার রোগযন্ত্রণার চেয়েও এই বিষময় দাম্পত্যজীবন আমার কাছে বেশী কষ্টকর মনে হতো। আমার এই সময়ে সেই প্রাচীন শ্লোকটি মনে পড়তো :

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি
ভার্যাচাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং
যথারণ্যং তথা গৃহম্॥

সে-সময়ে আমার একমাত্র শান্তিদায়িনী ছিলেন ঠাকুরমা। তাঁর মৃত্যুর পর আমার পক্ষে গৃহবাস নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক হল। এদিকে আমার স্ত্রীও ব্যাধিগ্রস্তা হয়ে পড়লেন। এক বছর পরে বোঝা গেল ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য ও মারাত্মক। কন্যার সুচিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার জন্য তাঁর পিতামাতা তাঁকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। পিত্রালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। আমি সে-সময়ে পুরীতে ছিলাম। আমার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাতা এক কন্যা বর্তমান।

দ্বিতীয়বার বিবাহ না করলে আমার পিতার নাম ও পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডলোপ হবে এই আশংকায় আমার এক হিতৈষিণী আত্মীয়া আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কন্যা-অন্বেষণে রত হলেন। কন্যা স্থির হয়ে গেল—নাম কৃষ্ণকুমারী দেই। ১৮৬১ সালের গ্রীষ্মকালে এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। কৃষ্ণকুমারীর পিতা শিবপ্রসাদ চৌধুরী ফৌজদারী হেড্ ক্লার্ক ও ভ্রাতা বসন্তকুমার চৌধুরী কাষ্টম্‌স হেড্ ক্লার্ক ছিলেন।

সংসারের সর্ববিধ দুঃখদুর্দশামোচন ও সুখসৌভাগ্য সম্পত্তি বর্ধনের জন্যই যেন দয়াময় ঈশ্বর কৃষ্ণকুমারীকে স্ত্রীরূপে আমার সংসারে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা, পতিপরায়ণতা, ধর্মানুরক্তি প্রভৃতি সবরকম সদ্‌গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আমার সেবাশুশ্রূষা করা, আমার আজ্ঞানুবর্তিনী হওয়া তিনি তাঁর পরম কর্তব্য জ্ঞান করতেন। আমার সঙ্গে বিবাহের সময়ে তাঁর বয়স ছিল এগার বছর মাত্র। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে যখন তিনি ধরাধাম ত্যাগ করে যান সেই মুহূর্ত থেকে সংসারে আমার জন্য সঞ্চিত সহানুভূতির ভাণ্ডারও নিঃশেষ হয়েছে। বর্তমানে আমার জীবন শূন্যময়

(ক্রমশঃ)

টীকা :

১. মধ্যযুগের চৈতন্য-জীবনীগুলিতে পুরীযাত্রার পথে চৈতন্যদেবের রেমণা গ্রামে আগমনের উল্লেখ আছে। বৃন্দাবনদাসের উক্তি সংক্ষিপ্ত :

হেনমতে শাক্তের সহিত রঙ্গ করি
আইলা রেমুণা গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
রেমুনায় দেখি নিজ মূর্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তগণ সাথ ॥

চৈতন্য-ভাগবত, শেষ খণ্ড, ২/২৭৫-৭৬

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। তিনি উল্লেখ করেছেন, চৈতন্যদেব রেমণার গোপীনাথ-মন্দিরে রাত্রিযাপন করেন :

পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা' সবারে কৃপা করি আইল রেমুণারে ॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥
চূড়া পাঞা মহাপ্রভু আনন্দিত মন।
বহু নৃত্যগীত কৈল লঞা ভক্তগণ ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেমরূপগুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥
নানারূপে প্রীতি কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা রঞ্চন ॥

—চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৪।১১-১৬

২. মধুসূদন দাস (১৮৪৮-১৯০৪): আধুনিক উৎকলের স্রষ্টাগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ। আদি শিক্ষা কটকে। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতা আসেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ও বি. এল. পাশ করেন। কলিকাতায় তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন ও সেই সময়ে বাঙ্‌লার ধনামধন্য পুরুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাল্যকালে তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টের ওড়িয়া অনুবাদকের কাজও করেছিলেন। পরে ওড়িশায় আইন ব্যবসায় করে সমকালীন শ্রেষ্ঠ ওড়িয়া আইনজীবীর মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর দীর্ঘ জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে মাতৃভূমি ওড়িশা, ওড়িয়া জাতি ও উৎকল সংস্কৃতির সেবায় উৎসর্গীকৃত। শিক্ষিত ওড়িয়াগণের সরকারী উচ্চপদপ্রাপ্তির সূত্রপাত তাঁরই চেষ্টায় হয়েছিল। মুখ্যত তাঁরই চেষ্টাতে ওড়িশার অস্থায়ী বন্দোবস্তের মেয়াদ ১৫ বৎসর থেকে বেড়ে ৩০ বৎসর হয়। ওড়িশার কৃষি, বাণিজ্য বয়নশিল্প ও কারুশিল্পের উন্নতির জন্য তিনি আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'উৎকল শিল্পভাণ্ডার' (Orissa Artwares) ও 'উৎকল চামড়া-কারখানা' (Utkal Tannery) ওড়িশার শিল্পৈশ্বর্যের প্রতি প্রথম পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওড়িশাকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গঠন করবার আন্দোলনেরও তিনিই পথিকৃৎ। ওড়িশায় শিক্ষা-বিস্তার, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও তাঁর কীর্তি স্মরণীয়। নিজ-চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে The Oriya নামক একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। যুক্ত বিহার-ওড়িশা প্রদেশের মন্ত্রীর পদেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু, মন্ত্রীরা বিনা মাহিনাতে কাজ করবেন-এই মর্মে তাঁর প্রস্তাব সরকার মেনে না নেওয়াতে তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি স্বয়ং সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। দেশের ও সমাজের সর্ববিধ কল্যাণকর কাজে অজস্র দান করার ফলে শেষ জীবনে এই আদর্শবাদী কর্মবীর দেউলিয়া হয়ে পড়েছিলেন।

৩. মিশনারীগণের ব্যবহৃত ওড়িয়া গদ্যের কৌতুককর নিদর্শন হিসাবে লেখক এই ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেছেন। মিশনারী বাঙ্‌লার মত প্রথম যুগের মিশনারী ওড়িয়াও ছিল অনেকাংশে হাস্যকর।

৪. প্রথম যুগের ব্রাহ্মগণের মদ্যপানের অভ্যাস সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন: "যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সেদিন আমি স্বগ্রামের দুই একজন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের

সহিত তাহা করি। যেদিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সেদিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতি বিভেদ আমরা মানিনা, উহা দেখাইবার জন্য ঐ রূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে।"—আত্মচরিত (কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ৪৬।

গল্প

একটি সেকালিনীর কাহিনী

সরোজেন্দ্রনাথ রায়

ওর পুরো নাম ছিল এমিলি রবসন। বন্ধুমহলে শুধু এমি বলে পরিচিত। ও ছিল একটি আইরিশ মেয়ে—সণ্ডন ইউনিভার্সিটির স্লেড স্কুলে আর্টের ছাত্রী। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। সেই কথাটা আগে বলে নিই।

ইংল্যাণ্ডে প্রায় দুবছর কেটে গেল কিন্তু শেক্সপীয়রের জন্মস্থান স্ট্র্যাট-ফোর্ড-অন্ এভনে যাওয়া হয়নি। তাই ঠিক করলাম আগামী বসন্তে সেই পুণ্য-কাজটা শেষ করে ফেলতেই হবে।

অবশেষে দীর্ঘ শীতের শেষে বসন্ত এল। গাছপালা যা শ্যাওলা ঢাকা ঝাঁটার মত দেখাচ্ছিল তা সবুজ কচি পাতায় ভরে গেল। আমাদের বাড়ীর উল্টো দিকে ঝাউ গাছের ডালে একটা থ্রাশ পাখী বাসা বেঁধেছিল। ভোর বেলায় তার জুগ জুগ তানে রোজ ঘুম ভাঙ্‌ত। আজও ভাঙ্‌ল। উঠে দেখি তরল রোদে নির্ম্মল নীল আকাশ হাসিতে ভরে গেছে।

ওয়াটারলু স্টেশন থেকে উত্তরপশ্চিমগামী একটা ট্রেনে চড়ে বসলাম। প্রথমে গাড়ীটা খালি খালি ছিল, পরে আস্তে আস্তে ভরে যেতে লাগলো। আমি জানলার কাছে একটা সীটে বসেছিলাম ট্রেন চলতে লাগল ফলের বাগানের মাঝ দিয়ে—আপেল, পীচ, এপ্রিকটের দিগন্ত বিস্তৃত বাগানের মাঝখান দিয়ে। চার দিকে লাল, নীল, সাদা ফুলের জলসা, মৌমাছির গুণ-গুণানি ও ফুলের সুগন্ধে আমার নেশা ধরে গিয়েছিল—চোখ দুটো ঘুমে

আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। একটা স্টেশনে ট্রেন থামার পর একজন যাত্রী আমার পাশে এসে বসলো। তার সেণ্টের সুগন্ধে আমি চোখ বুঁজেই বুঝতে পারলাম ইনি একজন মহিলা। আমি একটু গুটিয়ে নিয়ে জানলার আরও কাছে সরে গেলাম। চোখ খুলে মহিলাটিকে দেখে ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি জানলার পাশে বসতে চান?" তিনি বল্লেন: "না না ঠিক আছে। আপনি বসুন। ধন্যবাদ।" তারপর তিনি নিজেই মাঝে মাঝে দুয়েকটা কথা বলতে লাগলেন—কথাগুলো সৌজন্যসূচক, অবান্তর। এই ভাবে প্রায় দশটার সময় ট্রেন এসে থামল স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-এভনে। আমি নামবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উপরের র‍্যাক থেকে টুপিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলাটিও দেখি নামবার জন্য তৈরী। আমাকে একটা নড করে আগে আগে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি গেলেন এক পথে আমি অন্য পথে। শেকস্‌পীয়ারের পিতৃগৃহ, যেখানে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাঁর স্কুল, তাঁর পত্নী অ্যানা হ্যাথওয়ের বাড়ী, অবশেষে তাঁর গির্জা ও সমাধি দেখে গেলাম এভন নদীর দিকে। চার দিকে ফুলের ছড়া—ক্রোকাস আর টিউলিপ, পপি আর প্যান্‌জি, ক্যালেণ্ডুলা আর কস্‌মস্—হাজারো রঙে সমস্ত গ্রামটা একবারে রঙে রঙে মেতে গেছে। তারই মধ্যে দিয়ে গেলাম এভন নদীর তীরে। ছোট নদী, কি তীব্র বেগ! উইলো কুঞ্জের তলা দিয়ে চলেছে উদ্দাম গতিতে। স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে তিনটে সোয়ান—রাজহাঁস। অপরূপ দৃশ্য। চোখ জুড়িয়ে গেল। তারই একটি ঝোপের নীচে দেখতে পেলাম ট্রেনের সেই মহিলাটিকে। সামনে ইজলের উপর ক্যানভাস আঁটা। তার উপর চলেছে রঙের খেলা। চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে একটা অপূর্ব আবেশ—স্বপ্নের ঘোর। তাঁর কাজে যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্যে পা টিপে টিপে পিছে হটলাম। শুধু মনে হল তাঁর তন্ময়তা ভেদ করে যেন একটা অস্ফুট শব্দ উঠল—হ্যালো! আমিও 'হ্যালো' বলে পিছিয়ে গেলাম। তাঁর সঙ্গে আবার যে কোন দিন দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি।

কিন্তু হোলো। কিংগস্‌ কলেজ থেকে হোবার্ন হয়ে যাচ্ছিলাম রাসেল স্কোয়ারের দিকে। আকাশে তরল রোদ, টেমস্‌ থেকে ভেসে আসা মৃদু মন্দ পবন। সে আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল, আমিও দাঁড়ালাম। "চিনতে পারছেন?" হঠাৎ মুখ থেকে ফস্‌ করে বেরিয়ে গেল: "ভুলি কেমন করে?"

সে খিল খিল করে হেসে বলল : ভারতীয়েরা বড় ভদ্র। আমি বল্লাম : "কি করে জানলেন ? কটা ভারতীয়ের সঙ্গে মিশেছেন ?" "অনেকের সঙ্গে। বিশেষ করে একজনকে খুব ভালো করে জানি।" "তাই নাকি ?"—বিস্ময়ের সঙ্গে বল্লাম। এই ভাবে দুয়েকটা ঠুনকো আলাপের পর বল্লাম : "চলুন না ওই রেষ্টুর‍্যাণ্টে—এক কাপ কফি খাবেন আমার সঙ্গে।"

মহিলা কোন আপত্তি করলেন না, বরঞ্চ যেন বেঁচে গেলেন। ওঁর মনে কত কথা টগবগ করছিল—সেগুলো প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে যেন কৃতজ্ঞ হলেন। দেখলাম মহিলাটি অতি সরল, ভাবালু ও বিশ্বাসপ্রবণ।

ওঁর বলবার ও জানবার কথা অনেক ছিল। বিশেষ করে যখন জানলেন যে আমি কলকাতাবাসী। দেখলাম যে কলকাতা সম্বন্ধে জানবার জন্য ওঁর দারুণ কৌতূহল। আমাকে পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেলেন। সেদিন ব্যাপারটা যা শুনলাম তাতে মনে হল যে উনি কলকাতার একটি ছেলেকে ভালোবাসেন। এবং এ বিষয়ে খানিকটা অগ্রসরও হয়েছেন। তবে সেদিনকার সেই স্বল্প পরিচয়ে আমি আমার ঔৎসুক্য দমন করে রাখলাম।

এরপর এখানে সেখানে বিশেষতঃ বৃটিশ মিউজিয়ামে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতে লাগল। সে সময় মিউজিয়ামে আমি পড়াশুনা নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। লাঞ্চের সময় বাইরে এলে ওঁর সঙ্গে দেখা হত। সামনের রেষ্টুরেণ্টে বা কখনও কখনও মিউজিয়ামের বারান্দায় ওঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হত। আলোচনার বিষয় ছিল কলকাতা, ভারতীয়দের পারিবারিক জীবন, হিন্দুদের ঘর সংসার প্রভৃতি। উনি ওসব বিষয়ে নানা বই পড়ছিলেন। একবার আমার কাছে বাংলা ভাষা শেখার প্রস্তাবও করলেন।

ভদ্রতাজনিত সংযম বশতঃ আমি কিন্তু ওঁর ভেতরের কথা টেনে বার করবার কোন চেষ্টা করলাম না। কিন্তু মনে হল উনি সে সব কথা বলবার জন্য উসখুস করছেন। আমি কোন ঔৎসুক্য দেখালাম না। অবশেষে এক দিন ওঁর মনের বাঁধ ভেঙ্গে গেল।

সেদিন বাইরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। মিউজিয়ামের পায়রাগুলো খুব বকম বকম করে জোরে পাখা ঝাপটাচ্ছিল। আমরা বারান্দার টানা লম্বা বেঞ্চের এক কোণে বসে গল্প আরম্ভ করলাম সেদিন। ওঁর মনটা খুব অস্থির ছিল—যেন জীবনের একটা সঙ্গীন মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ব্যাপারটি হল এই : একটা ভারতীয় ছেলে মেয়েদের গানের মজলিশে ওঁর

সঙ্গে কলকাতার একটি ছেলের পরিচয় হয়। ছেলেটি বি. এসসি. পড়ে। তাকে দেখে উনি মুগ্ধ হয়েছেন। তার চেহারার মধ্যে একটা গ্রীক ভাস্কর্য্যের ছাপ আছে ওঁর আর্টিস্টের চোখে তা খুব আকর্ষনীয় লেগেছে। ছেলেটিও ওঁকে খুব ভালবাসে। উনি একজন আইরিশ মেয়ে—ভারতীয়দের প্রতি একটা ঐতিহাসিক টান আছে। কিন্তু উনি ক্যাথলিক—নির্মলা মাতা (Immaculate Mother) মেরীর দুর্বল কন্যা। কোনও অবস্থায় দেহকে অপবিত্র করতে পারেন না। তাই যখন বুঝলেন যে উভয়ে উভয়কে ভালবাসেন, তখন উনি প্রস্তাব করলেন যে আগে ওঁদের বিবাহ হোক তারপর ওঁরা এক সঙ্গে বাস করবেন। নতুবা তাঁদের জীবন হবে অভিশপ্ত—কখনও সুখী হতে পারবেনা। কিন্তু অপর পক্ষ তাতে রাজী নন। তিনি কোনও ধর্ম্মে বিশ্বাসী নন। তিনি চান মুক্ত প্রেম। বন্ধনহীন, সর্তহীন প্রেম। এইখানেই দ্বন্দ্ব। তার ফলে মহিলার মনে কোন শান্তি নেই।

এরপর জানলাম ভদ্রলোক দক্ষিণ কলকাতার অধিবাসী—নাম ব্যানার্জ্জী, মহিলা ডাকেন ব্যানী বলে। আমিও দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দে কিন্তু ব্যানার্জীকে কোন দিন দেখিনি। চিনি বলে মনে হলনা। একদিন আমি বল্লাম: আসুন না একদিন ব্যানার্জী মশায়কে নিয়ে আমাদের 'ডীগ্‌সে' (digs)। আমার ল্যাণ্ডলেডি চমৎকার রান্না জানেন।

এতদিনে অবশ্য আমাদের পরস্পরের নাম ধাম জানা হয়ে গেছে। ওঁর নাম এমিলি রবসন। আমার নাম ভাস্কর নন্দী। ওঁকে যখনই ডাকি মিস রবসন, উনি প্রতিবাদের সুরে বলেন: আমার নাম এমি।—এমি কিন্তু আমাকে ভাস্কর না ডেকে নন্দীই বলতেন।

অনেক ধস্তাধস্তির পরেও ওঁদের সমস্যার কোন সমাধান হয় না। অথচ এমির মনের আগুন দিনের দিন বেড়েই চলে। কোনও কাজে আর মন বসে না। ছবি আঁকাতেও নয়। ক্যানভাস আর রঙ নিয়ে বসে কিন্তু কিছুই এগোয় না। ওর হৃদয়ের আগুন ওকে নিয়ত পোড়ায়।

একদিন লেস্টার স্কোয়ার দিয়ে যাচ্ছি। দেখি এমি ও একজন ভারতীয় যুবক। এমি এক রকম জোর করেই ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। ভদ্রলোক একটুও সুখী হলেন না। অসন্তোষের ভ্রূকুটি তাঁর ললাটে কুঞ্চিত হয়ে রৈল। ভদ্রলোক শুধু বল্লেন: "আপনার সঙ্গে মিস রবসনের আলাপ হয়েছে শুনেছি। আপনার সম্বন্ধে ওঁর খুব উঁচু ধারণা।"

আলাপ জমল না। ভদ্রলোক যেন আমাকে সন্দেহের চোখে দেখলেন। এমি বুঝতে পারল ও দুঃখিত হল। কিছুদিন আর এমির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই। ভাবলাম বুঝি ওদের মামলার একটা ফয়সালা হয়ে গেছে। আমিও নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। অন্যের ভাবনায় অংশীদার হবার সময় নাই। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হবে।

হঠাৎ আবার দেখা হল। এমি খুব ক্লান্ত—অবসন্ন। সে যেন তার জীবন সংগ্রামে পরাজিত, পর্য্যুদস্ত। তার হৃদয়ের পবিত্র প্রেম যেন কলঙ্কিত। সে ব্যানার্জীকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোন ফলই হয়নি। চার্চ্চ-বিবাহ অকল্পনীয়। রেজিস্ট্রি ঘৃণিত। সব রকমের অনুষ্ঠানই তার অমনঃপূত। পরস্পরের প্রেমই হল একমাত্র বন্ধনগ্রন্থি—ব্যানার্জীর মতে আর সবই মিথ্যা। বলতে বলতে এমি হাঁপাচ্ছিল। সে হতাশার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে মনে হল।

অনেক দিন ধরে একটা কথা তাকে বলব বলব ভাবছিলাম, কিন্তু বলিনি। আজ অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম: "দেখুন কিছু যদি মনে না করেন তবে একটা কথা বলি।"

—"বলুন না। আমি কিছুই মনে করব না।"

"দেখুন, এ বিয়ে না করলেই কি নয়?"

"আপনি কি বলতে চান?" এমি রুদ্ধশ্বাসে আমার দিকে তাকিয়ে রৈল। কি জানি হয়ত ভাবছিল আমিই বুঝি একটা প্রস্তাব করে বসব। এমি সুন্দরী—তার হৃদয় মন খুব উন্নত। তার মত পত্নী পাওয়া পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম: "দেখুন যদি সম্ভব হয় আপনি আপনার দেশীয় কাউকে বিয়ে করে সুখী হোন। আমাদের দেশের জীবনের ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। আর কলকাতা শহর নোংড়া—কদর্য্য। আপনি সেখানে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়বেন। আমাদের সমাজ আপনাকে সানন্দেগ্রহণ করবে না। আপনি হয়তো একঘরে হয়েই থাকবেন। শেষ কালে অনুতাপ করবেন। বহু ইউরোপীয় মহিলা জীবনে অত্যন্ত অসুখী হয়ে ফিরে চলে এসেছেন।"

এমি আমার সতর্কবাণী উপেক্ষা করে বলল: "না, না, ওসব কথা আমি খুব ভেবেছি। আমি ভারতবর্ষকে খুব ভালবাসি—কোনো অসুবিধাই গ্রাহ্য করি না। যেখানে ব্যানী সেখানেই আমার সুখ। ব্যানী বলে, তার চাকরী

বাকরী পেতে দেরী হবে। কি করে আমাদের সংসার চলবে? আমি বলি, আমি রোজগার করব। আমি গৃহস্থালীর সব কাজ জানি। বাজার করা, রান্না, ঘর পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কোন কাজেই আমার ঘৃণা নাই। আমি শুধু সুখী হতে চাই।"

এর পর আমি আর কি বলব? যে এমন প্রেমকে অবজ্ঞা করে সে পরম পাষণ্ড। আমি চুপ করে গেলাম।

ব্যানার্জ্জী সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তাকে দেখে আমার ভাল লাগেনি। লোকটি দেখতে আকর্ষণীয় বটে, কিন্তু সে যে কি করে, কোথায় থাকে এসব আমি কিছুই জানি না। কোন খোঁজ খবর নেবার আমার সময়ও নাই।

কিছু দিন এমি আর এল না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে দেখতে ইচ্ছা হয় বৈ কি! কিন্তু নাঃ…।

প্রায় মাস খানেক পর এমির সঙ্গে আবার দেখা। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বারান্দায়। সেদিন তাকে যেন একটু উৎফুল্ল দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল: "জানেন আমি কাল একটা হিন্দু বিয়ে দেখেছি। বেশ আর্টিষ্টিক। মহিলার মাথায় ফুলের একটা টায়রা, গলায় সুগন্ধি ফুলের হার, পরণে চমৎকার সাড়ী। ধূপের কেমন সুন্দর স্পাইর‍্যালিং ধোঁয়া। তারপর আগুনের চার পাশে ঘুরে ঘুরে ভারি সুন্দর মন্ত্র পড়ল। সবই যেন একটা মনোরম চিত্র। ক্যাথলিক বিয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দুইই আছে। কিন্তু হিন্দু বিয়ে আরও বৈচিত্রময়। মন্ত্রগুলোও খুব সঙ্গীতময়। আমার খুব ভাল লেগেছে। ঐ রকম বিয়েতে আমার আপত্তি নাই।"

আবার কিছু দিন গেল। এবার এমি বেশ আনন্দে উৎফুল্ল। মনে হল তার সংশয়ের মেঘ কেটে গেছে। খুশীর ভারে হেলে পড়ে' সে বলল, তাদের বিয়ে হবে—হিন্দু মতে। ব্যানী রাজী হয়েছে। আমি কিন্তু বেশী খুশী হলাম না। আমার মনে কেমন একটা ধোঁকা লাগল। কালীঘাটের বিয়ে নয় ত? আমি শুধু কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লাম: "তাই নাকি? ভারি খুশীর কথা তো!" এমি আমার কাছে থেকে তেমন কোন সাড়া না পেয়ে দুঃখিত হল। শুকনো মুখে চলে গেল। কি ভাবলো কে জানে? ভাবলো না তো আমি জেলাস্?

তবু আর এক দিন সে এল। বলল: "আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমরা

একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি। কাল সন্ধ্যায় আমরা একটা পার্টি দিচ্ছি। আপনি এলে খুব খুশী হব। ব্যানী বড় দুঃখিত সে আসতে পারল না। ওর পায়ে একটা চোট লেগেছে। আমি বড় বিব্রত বোধ করলাম। যাব কি যাব না?

তবু খুশী হবার চেষ্টা করে বল্লাম—ধন্যবাদ—চেষ্টা করব।

এবার এমি রাগ করল। "আচ্ছা, আপনার কি হয়েছে বলুন তো? আমাদের বিয়েতে আপনি কি খুশী হন নি?"

আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম: "আপনি সুখী হলেই আমি সুখী।"

এমি আমার জবাবে সন্তুষ্ট হল না। তার আড় চোখের কোণ দিয়ে কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। মনে হল সে যেন আমার হাবভাবের মধ্যে নতুন একটা অর্থ খুঁজে পাচ্ছে যা আগে কখনও সন্দেহ করেনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি এমির নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। তাদের ফ্ল্যাটে গেলাম। ব্যানার্জী মৌখিক ভদ্রতা দেখাল বটে কিন্তু বেশ বুঝলাম সে একটুও সুখী হয়নি। আরও কয়েকজন বাঙ্গালী ছোকরা ও তাদের বান্ধবীরা উপস্থিত হয়েছিল। ওদের মধ্যে একজন ছোকরাকে ওয়াই এম সিএতে দেখেছিলাম। সে এগিয়ে এসে আলাপ শুরু করে দিল। ছোকরা বেশ আমুদে। প্রথামত ওয়েডিং কেক কাটা হল। স্বাস্থ্য পান করা হল। একটা ছোটখাটো রকমের চা পার্টি হল। এমি চা সার্ভ করছিল। তার আঙ্গুলে একটা ঝকঝকে পাথর বসানো আংটি দেখলাম। বুঝলাম বিয়ের আংটি।

চা পানের পর চেয়ার টেবিল সরিয়ে একটা নাচের বন্দোবস্ত হল। গ্র্যামোফোনে নাচের রেকর্ড শুরু হল। আমি তখন ব্যানার্জ্জী ও এমির কাছে বিদায় নেবার জন্য এগিয়ে গেলাম। ব্যানার্জ্জী একটু ব্যঙ্গ করবার বৃথা চেষ্টা করল। এমি কিন্তু খুশী হল না। সে একটা অর্থ পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শুধু বল্ল: কি আর বলব: এসেছেন এই ভাগ্যি।

কথা না বাড়িয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চলে এলাম।

তিন চার মাস আর ওদের খবর পাই নি। আমার কাজের শেষ পর্ব। ভীষণ তাড়া। একদিন দুপুর বেলায় কলেজ লাইব্রেরী থেকে বেরোচ্ছি লাঞ্চের জন্য, বীড্‌ল্ (beadle) বলল: আপনার জন্য একজন মহিলা লাউঞ্জে অপেক্ষা করছেন। আমি একটু বিস্মিত হলাম। গিয়ে দেখি, এমি।

একটা খবরের কাগজের পাতা উলটোচ্ছে। মুখের সে লাবণ্য যেন আর নেই। শুকনো গালে যেন দু একটা রেখা পড়েছে। আশ্চর্য্য হয়ে আমি বল্লাম :" হ্যালো! কি ব্যাপার? আজ সকালে কার মুখে দেখে উঠেছি!" সে শুধু ম্লান হাসি হাসল। তার মুক্তার মত দাঁতে যেন আর সেই ঔজ্জ্বলা নেই।

"আপনার সাথে একটা কথা আছে। আর বুঝি বৃটিশ মিউজিয়মে যান না?

"না, ওখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে।"

"তাই ওখানে আপনাকে পাইনি।"

"গিয়েছিলেন বুঝি?"

"শুনুন, কথা আছে। একটু বসবেন কি?"

"চলুন না কলেজ রিফেকটরিতে একটু খাওয়া যাক। ওখানেই কথা হবে।"

এমি বিশেষ কিছু খেল না। শুধু এক কাপ কফি নিল। তারপর অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে কথাটা পাড়ল। "আজ প্রায় এক মাস হল ব্যানী দেশে চলে গিয়েছে। ওর কাছ থেকে কোন খবর পাচ্ছি না।" আমি খুব আশ্চর্য্যান্বিত হলুম না। কিন্তু খুব আশ্চর্য্যান্বিতের ভাব দেখিয়ে বল্লাম : "দেশে চলে গেছেন? এত শীগগির?" "হ্যাঁ, তার বাবার খুব অসুখ। ইণ্ডিয়ান হাই কমিশন থেকে একজন অফিসর এসে তাকে একটা প্লেনের টিকেট দিয়ে অবিলম্বে চলে যেতে বলল। তাই সে চলে গেল। তার পৌঁছবার খবর পর্য্যন্ত পাইনি। তার ঠিকানায় চিঠি লিখেও কোন উত্তর পাই নি।"—যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হয়েছে বুঝলাম। লজ্জায় মুখ তুলে তার দিকে চাইতে পারছিলাম না। মুখ নীচু করেই সান্ত্বনার সুরে বল্লাম : "বোধহয় তার বাপ মারা গিয়েছেন। তাই চিঠি পত্তর লেখার সময় পায় নি। আশা করি শীগগিরই পাবেন।"

"সে কথাটা আমায় জানালো না? আমি তো তার স্ত্রী।"

কথা বেশী দূর এগোল না। অশান্ত মন নিয়ে এমি চলে গেল। তার জন্য আমি সত্যিই দুঃখ বোধ করলাম। কিন্তু উপায় কি? এমিই তো একমাত্র প্রবঞ্চিতা নারী নয়।

কয়েক দিন পর ওয়াই এম সিএতে সেই আমুদে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হল। "মশায়, আপনার বান্ধবীর খবর কি? খাঁচার পাখীতো উড়ে গ্যাছে।

এবার আপনার রাস্তা সাফ। মেয়েটা কিন্তু ভারি মিষ্টি, মাইরি।"

তার জিব দিয়ে যেন জল পড়ছিল। আমি কুণ্ঠিতভাবে বল্লাম: "তা হলে এ বিয়েটা একটা ফ্রড?"

"আরে মশায়, আপনি কতদিন হল এদেশে এয়েচেন? এ তো আকছার হচ্চে। বিনে পয়সায় মেয়েমানুষ পাওয়া গেল। তারই পয়সায় বেশ হোটেল খরচা চলল। বাসী হলেই চম্পট।"

"কিন্তু এই মহিলাটি একটু স্বতন্ত্র জাতের। সে সত্যিই ব্যানার্জীকে ভালবাসে। ভালবেসে সুখী হতে চায়।"

"দুত্তোর মশায়, আপনিও যেমন! ওরা সব ওয়ার্কিং ক্লাসের মেয়ে। সতী সাবিত্রী নয়। ওদের দেশের মাতাল মুটে মজুরের চেয়ে ভারতীয়েরা অন্ততঃ ভদ্র। মারধোর করেনা। মশায়, দশ বছর এদেশে আছি। বাবা ভাবছেন পড়াশোনায় ডুবে আছি। এ পর্য্যন্ত গোটা পাঁচেকতো হল।"

"তা হলে বিয়ের ভড়ং করার কি দরকার ছিল?" আমি রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম। "দুয়েকজন আছে যারা ওটা না করলে ধরা দিতে চায় না। তাদের জন্যে ঐ ফাঁদ পাততে হয় মশাই। একটা বিয়ে আমিই তো দিয়েছি। সংস্কৃত টংস্কৃত তো স্কুল ফাইন্যাল পর্য্যন্ত। সুর করে আওড়ালাম হিতোপদেশের "অস্তি গোদাবরী তীরে বিশালঃ শাল্মলী তরু, তত্র নানা দিগ্‌দেশাদ্ আগত্য পক্ষিনঃ নিবসন্তি।" ভুল ধরবার ভয় নাই। তারপর গোল করে কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দুজনকে সাতবার ঘোরালাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত। ব্যস হয়ে গেল বিয়ে। আপনি তো মশায় বইএ মুখ গুঁজে ক'বছর কাটালেন। দেশটা দেখলেন কিছু?'

ভদ্রলোকের কথা শুনে হাসলাম। কিন্তু এমিকেও ভাল করেই বুঝেছি। তার সম্বন্ধে আমি কোন ভুল করিনি। কাজেই তার সম্বন্ধে আমার চিন্তা হলো। আরও একদিন দেখা হল এমির সঙ্গে। তখন তার মন খুব অশান্ত। মুখে বলি-রেখা পড়ে গেছে। চোখের গোড়ায় কালী। কোন সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। আমি কি করতে পারি? সে চিঠি লিখেও কোন উত্তর পাচ্ছে না।

অবশেষে আমার লণ্ডন বাসের দিন শেষ হয়ে এল। ভারতে ফেরার আগে একবার কন্টিনেন্টটা দেখে যেতে হয়—রেওয়াজ। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এমি আমায় বিদায় দিতে এসেছিল। ট্রেন ছাড়ার আগে সে আমার হাতে একটা

বড় খাম দিল। কোন কথা বলতে পারলাম না। একটা ধন্যবাদও নয়। তার চোখ থেকে স্রোতের মতো জল পড়ছিল। আমার চোখও ঝাপসা হয়ে গেল। ট্রেন ছাড়ার পর খামটা খুলে দেখি এমির আঁকা আমার একটা ওয়াটার কালার ছবি। আমার প্রতি তার প্রীতির শেষ চিহ্ন।

দেশে ফিরে এসে ব্যানার্জ্জীর অনেক সন্ধান করলাম। কোন হদিশ পেলাম না। বিরাট কলকাতা শহর আরও বড় হয়েছে। কোথায় পাব ব্যানার্জ্জীকে? কলকাতা পৌঁছে আমি একটা ধন্যবাদ দিলাম এমিকে তার সুন্দর ছবিটির জন্য। ছবিটি আমার চাইতে অনেক সুন্দর হয়েছে। অনেকে চিনতেই পারেনি। আমি চিঠিতে ব্যানার্জ্জীর কোন প্রসঙ্গ করলাম না।

পরের মেলেই এমি জানতে চাইল আমি ব্যানার্জ্জীর কোন সন্ধান পেয়েছি কিনা। তাতে জানলাম যে তার লেখা চিঠি ডেড লেটার অফিস থেকে ফেরৎ গেছে। চিঠির উপর ডাকঘর থেকে লেখা হয়েছে—Not Known। কিছুদিন বাদে এমি লিখল যে ব্যানার্জ্জীর ফেলে যাওয়া কাগজ পত্তরের ভেতর সে একখানা চিঠি পেয়েছে তাতে ব্যানার্জ্জীর অন্য একটা ঠিকানা পাওয়া গেছে। সেই খোঁজে সে কলকাতায় আসতে পারে।

শ্রাবণ মাসের এক বাদল সন্ধ্যায় প্লেন এসে দমদমে নামল। তা থেকে বেরিয়ে এল এমি রবসন(বর্তমানে ব্যানার্জ্জী)। কেব্‌ল পেয়ে আমি ও আমার বোন অলকা এয়ারপোর্টে গেলাম তাকে আমাদের বাড়ীতে আনতে। আমাদের বাড়ীটি ছোট্ট—দক্ষিণ কলকাতার একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন পল্লীতে। বাড়ীতে আমরা তিন ব্যক্তি—মা, আমি ও আমার বোন। মা একবারে সেকেলে নন, বোনটি লোরেটোর ছাত্রী—ইংরেজী ভালই বলে। কাজেই আমাদের বাড়ীতে একজন বিদেশিনীর থাকা কোন পক্ষেই অসুবিধার নয়।

এমিকে দেখে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই ক'মাসে একি চেহারা হয়েছে তার! সেই স্ট্যাটফোর্ডের এমি আর এই এমি, আকাশ পাতাল তফাৎ। মুখটা শুকিয়ে সরু হয়ে গিয়েছে। চোখ বসে গেছে। ওর ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুলে আর কোন জলুস নাই। পরিচ্ছদের দিকেও আর কোনও দৃষ্টি নাই।

আমাকে দেখে একটা ম্লান হাসি হেসে আমার হাতে তার হাতটা দিল। অলকাকে একটু বুকে টেনে নিল। বাড়ীতে এসে আমার মাকে একেবারে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। মার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল।

তাকে আমরা একটা আলাদা ঘর দিতে পেরেছিলাম। সে রাত্রে আর বেশী কথা বার্তা হল না। সে স্নান করে তৈরী হলে খাবার ঘরে আমরা চার জনে এক সঙ্গে বসলাম। এমি আর আগের মত হাসি খুশী নয়। তবুও আমাদের রান্না খেয়ে সে বেশ খুশী হল। তাকে ক্লান্ত দেখে তাকে আমরা বিশ্রাম করতে বললাম।

বিলেত থেকে এসে আমি একটা চাকরীতে ঢুকেছিলাম। আমার সময়ের তাই টানাটানি। তবু পরদিন আমি আর আমার বোন এমিকে নিয়ে তার ঠিকানায় গেলাম। যে বাড়ীতে ঢুকলাম তা এলগিন রোডের একটা বিরাট প্রাসাদ—কলকাতার একটি বিখ্যাত সওদাগরী আফিসের মালিকের বসত বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকতেই একজন তকমা আঁটা দারোয়ান এসে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই। ব্যানার্জ্জীর নাম করতেই সে বলল: "তিনি এখানে থাকেন না।" নিউ আলিপুরের একটা ঠিকানা দিল।

আপিসের সময় হয়ে গেছে বলে সেদিন আর নিউ আলিপুর যাওয়া হল না। এমি কোন কথা বলল না। আমাদের মনও দমে গেল। সেদিন বিকেলে আমরা এমিকে নিয়ে জু গার্ডেনসে গেলাম। মেঘলা আকাশের নীচে ময়ুর পেখম ধরে নাচছিল। অপূর্ব দৃশ্য। ক্ষণিকের জন্য এমির আর্টিষ্ট মনে একটু আনন্দ জেগে উঠল। তারপর এলাম দীঘির পাড়ে। সহস্র গোলাপী পদ্ম দীঘির চারপাশে ডগমগ করছিল। এমি বলে উঠল: হাউ লাভলি! কি চমৎকার! আর কিছুতে তার মন সাড়া দিল না।

সেদিন সন্ধ্যায় তাকে খুব অন্যমনস্ক দেখা গেল। খাবার দাবার কিছুই ভাল লাগছিল না—যেন চিন্তার মধ্যে ডুবে গেছে। মার স্নেহ ভরা আদর যত্নও তাকে জাগাতে পারল না। সকালে তার চেহারা দেখে বুঝলাম রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি। সেদিন তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা তিন জনে নিউ আলিপুরে ছুটলাম। বাড়ী বন্ধ! কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। সেদিন বিকেলে আমরা একটা লঞ্চে বট্যানিক্সে গেলাম। বর্ষার ভরা গঙ্গার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখে শুধু তার মুখ থেকে একটা অস্ফুট ধ্বনি বেরুল: হাউ অফুল! আর কিছুতেই সাড়া জাগল না।

ক্রমেই সে অস্থির হয়ে পড়ছিল। আহার নিদ্রা কিছুতেই তার রুচি নাই। তৃতীয় দিন সে একলাই নিউ আলিপুরের বাড়ী গেল। একজন যুবতী মহিলা তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। উভয়ে উভয়কে দেখে বিস্মিত। খানিক ক্ষণ

কারোর মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। বাড়ী সম্বন্ধে ভুল হয়নি। ঘরে ব্যানার্জ্জীর ফোটো ছিল। প্রথমে এমিই কথাটা পাড়ল। সে মিঃ ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। লণ্ডনে পরিচয়। বাঙ্গালী মহিলা বললেন : তিনি বাড়ী নেই। কাজে বেরিয়েছেন। কাল সকালে এলে দেখা হবে। বয় একটা ট্রেতে কফি নিয়ে এল। এমি ভদ্রতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। দাঁড়িয়ে উঠে তার নামের একটা কার্ড দিয়ে বলল : মিঃ ব্যানার্জ্জী আশা করি চিনতে পারবেন। কাল আবার আসব।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পেছন থেকে শুনতে পেল : "আপনিও মিসেস ব্যানার্জ্জী। সেদিন এমি এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলল না। আমরা ভাই বোন কেউই বাড়ী ছিলাম না। মা অনেক সাধ্য সাধনা করে এমিকে এক গ্রাসও খাওয়াতে পারলেন না। সারাদিন সে ছটফট করল। আমরা বাড়ী ফিরলে সে ঐ ঘটনাটি জানালো। আমরা চোখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। কিছুই বললাম না।

পরদিন এমি প্রায় কিছুই খেল না। এক কাপ চা আর একটা টোষ্ট কোন রকমে খেল। অলকা তার সঙ্গে যেতে চাইল কিন্তু ও চাইল না। ও বলল ও নিজেই বাড়ী চিনে নিতে পারবে। আমি আমার কাজে চলে গেলাম।

প্রায় বারোটার সময় বাড়ী থেকে জরুরী ফোন এল যেন আমি তক্ষুনি চলে যাই। নানা উদ্বেগের মধ্যে বাড়ী ফিরে দেখি এমি ভীষণ অসুস্থ। সে ঘণ্টা খানেক আগে বাড়ী ফিরেছে। মা তার চেহারা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত। সে থরথর করে কাঁপছিল—বাজ পাখী যেমন পায়রাকে তাড়া করলে পায়রার অবস্থা হয়। মুখ বিবর্ণ, চোখ কোটরগ্রস্ত। শুনলাম, সে এসেই শুয়ে পড়ে। একটু পরই এক গ্লাস জল চাইল। যেমনি খাওয়া অমনি সঙ্গে সঙ্গে হড়হড় করে বমি, তারপর থেকে বিছানায় ছটফট করছে বিকারগ্রস্ত রুগীর মতন। কখনো হাত কামড়াচ্ছে, কখনো দুহাত দিয়ে টুঁটি চেপে ধরছে।

বাড়ী এসে তার ব্যাপার দেখে বুঝলাম যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটেছে। ডাক্তার ডাকা হল। তিনি ভাল করে পরীক্ষা করে ঘুমের একটা ইনজেকশন দিয়ে চলে গেলেন। এমি ঘুমিয়ে পড়ল। সারাদিন রাত আর জাগল না। কিছুই খেল না। মা আর অলকা সারারাত তার শিওরে জেগে রইল। পরেরদিন ডাক্তার এসে আবার ইনজেকশন দিয়ে গেলেন। অনেক কষ্টে মা একটু সুপ খাওয়ালেন। তাও বমি হয়ে গেল। এই ভাবে প্রায় সাতদিন চলে গেল। এমি

বিছানা থেকে উঠতে পারল না।

সাতদিন পর বিছানায় একটু উঠে বসতে আরম্ভ করল। তার বিকারের অবস্থা কেটে গিয়েছে। সে এখন অনেক শান্ত, কিন্তু অতিশয় দুর্বল। একদিন বলল: "আমার টিকেট করে দিন। দেশে ফিরব।" মা বলল: "এই অবস্থায় তোমাকে আমরা ছাড়তে পারিনা। আরও সুস্থ হও তারপর দেখা যাবে।"

প্রায় তিন সপ্তাহ পর এমি জোর করে বলল যে দেশে ফেরা তার নিতান্ত জরুরী। সে আর থাকবে না। সে যে অনেক কষ্ট দিয়েছে তার জন্য বড়ই লজ্জিত। মা বললেন: "তুমি আমার আর একটি মেয়ে। তোমার জন্য যা করেছি তা অলকার জন্যও করতাম। তার বেশী কিছু করিনি। তুমি কেন লজ্জা পাচ্ছ? 'সে বললে: "মা, তাকি আমি বুঝিনি? কিন্তু দেশে ফেরা আমার নিতান্ত দরকার।"

অবশেষে এমির দেশে ফেরার দিন এল। আমরা সবাই এয়ারপোর্টে গেলাম। আমাদের সকলের চোখে জল। এমি মাকে জড়িয়ে ধরে দুই গালে গাল ঠেকাল। উভয়ের চোখে জলের প্লাবন। অলকাও ফুঁপিয়ে উঠল। আমি অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করলাম। প্লেন ছেড়ে গেল। আমরা খালি বুকে বাড়ী ফিরলাম। কারুর মুখে কথা নাই।

প্রায় তিন চার মাস এমির আর কোন খবর নাই। পরে রোম থেকে লেখা নিচের চিঠিখানি আমাদের সকলকে স্তম্ভিত করে দিল:

প্রিয় বন্ধু,

রোম থেকে আমার এই চিঠিখানি পেয়ে নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন। আমি দুদিন হল এখানে এসেছি। আমি কাল একটা কনভেণ্টে ঢুকছি! এরপর বাইরের জগতের সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ থাকবে না। আপনার মাকে আমার প্রণাম জানাবেন। অলকাকে ভালবাসা। আমি একটি প্রবঞ্চিতা নারী। জগতে কেউ যেন আমার মত অপমানিতা না হয়।

আমি সেই দিন নিউ আলিপুরে ব্যানার্জ্জীর বাড়ী গিয়েছিলাম। ব্যানার্জ্জী ছিলেন না। তিনি সেই দিনই ভোর বেলায় প্লেনে মাদ্রাজে গিয়েছেন। কবে ফিরবেন তার ঠিকানা নাই। যে মহিলা আমাকে রিসিভ করলেন তিনি ব্যানার্জ্জীর বিবাহিতা স্ত্রী। ইংল্যাণ্ডে যাবার আগেই তাঁর সঙ্গে ব্যানার্জ্জীর বিবাহ হয়েছিল। মহিলার পিতা একজন মস্ত বড় মিল মালিক। তিনিই ব্যানার্জ্জীকে ইংল্যাণ্ডে পাঠান এঞ্জিনীয়ারিং পড়ার জন্য। তাঁর টাকাতেই

ব্যানার্জ্জী ফ্ল্যাট ভাড়া করে আমার মতন হতভাগিণী মেয়েদের জন্য ফাঁদ পেতে বসে থাকতেন। আমি তাঁর শেষ বলি। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান হাই কমিশন মারফৎ তাঁর শ্বশুর জানতে পারেন যে ব্যানার্জ্জী কোন পড়াশুনা করছেন না। কোন কলেজে তাঁর নামও নাই। অবশেষে তিনি হাই কমিশনকে চিঠি লেখেন ও টাকা পাঠান তাঁকে জোর করে দেশে পাঠাতে। এসব কথা বললেন তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী চোখের জলে গাল ভিজিয়ে। তিনিও আমার মত একজন প্রবঞ্চিতা নারী। তাঁর প্রবঞ্চিত হওয়ার জন্য আমিও দায়ী, যদিও অজান্তে। ঐ সহৃদয়া মহিলা আমার কাছে প্রস্তাব করলেন যে আমি তাঁর বাড়ীতে থেকে যাই। তিনি বাপের বাড়ী চলে যাবেন। বলাই বাহুল্য আমি সে প্রস্তাব গ্রহণ করিনি। তারপর তিনি তাঁর গলা থেকে হীরে বসান হার আমার গলায় পরিয়ে দেন। আমি সে হার তাঁর কোলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসি। ভগবান ঐ মহিলাকে শান্তি দিন।

আমি বুঝলাম যে, আমার অজ্ঞাতসারে আমিও পতিতা হয়েছি। ঘৃণায় আমার হৃদয় মন পূর্ণ হয়ে উঠল। স্থির করলাম যে এই পাপ দেহ আর বয়ে বেড়াব না। যেখানে হাত দিই মনে হয় কুষ্ঠ ব্যাধিতে আমার শরীর পচে যাচ্ছে। তাই আত্মহত্যাই আমার একমাত্র কাম্য হয়ে পড়ল। একদিন মধ্য রাত্রে ঘুমের ঘোরে দেখলাম যে আপনার মা আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। মনে হল যেন মা মেরী আমার শিওরে বসে। বুঝলাম পাপী বলে' নির্ম্মলা মা ম্যাডোনা আমায় ত্যাগ করেন নি। সেই রাত্রি থেকে আমার কন্‌ভারশন আরম্ভ হল।

লণ্ডনে এসে অবধি আমি ক্রুশ-কাঠ বুকে করে মায়ের চরণে পড়েছিলাম। অনেক তুচ্ছ বিষয়ের পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছি। একে একে সব ছাড়বার চেষ্টা করছি। অবশেষে মনে হল পাপ থেকে ক্ষমা পেতে হলে আমাকে ভিক্ষুনী হতে হবে। প্রতিদিন দেহকে শাস্তি দিয়ে পাপের মার্জ্জনা চাইতে হবে। উপবাস, জাগরণ, প্রার্থনার দ্বারা আমার মনকে পাপমুক্ত করতে হবে। তাই আমি রোমে এসেছি। কাল আমি একটা কনভেণ্টে প্রবেশ করছি। আপনারা সকলে প্রার্থনা করবেন আমি যেন পাপ থেকে মার্জ্জনা পাই।

যদি কখনও সুযোগ হয় তবে আবার ভারতে যাব। সেখানে আমার মতো প্রবঞ্চিতা, ধর্ষিতা, পতিতা বহু নারী আছে। তাদের সেবা করে' জীবন কাটিয়ে দেব। যদি তাদের চোখের জল একটুও মুছাতে পারি, তবে জীবন ধন্য হবে। আমাকে আশীর্বাদ করবেন।

এমি-

[৬৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আশা ছিল অনেকেরই। কিন্তু কালাজ্বরের কালো ছায়া আচ্ছন্ন করল তাতাদাকে। তখন এই রোগ ছিল দুরারোগ্য। যখন শীর্ণ হতে শীর্ণতর হয়ে তিনি প্রায় বিছানায় মিলিয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ এসে তাঁর পাশে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে তাঁকে শোনালেন গানের পর গান।

সুকুমার রায়ের নাম থাকবে তাঁর লেখার মধ্যে। সে-লেখাগুলি শুধু ছড়া নয়। ছোটো ছোটো গদ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যেও পাওয়া যায় নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহের পরিচয়। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, আমার মতে, আবোল তাবোলের শেষ কবিতা। এটি তিনি লিখেছিলেন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে। তাঁর জীবনের এই হল চরম মজা।

"আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে
রাম-ঘটাঘট ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্।"

এরপর—

"ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।"

এই আশ্চর্য কবিতাটি রচনার অল্পদিন পরেই তাতাদা ঘুমিয়ে পড়লেন চিরদিনের জন্যে।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

নীলরতন সেন

মানবিক গুণগুলির সুকল্পিত বিকাশের উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জনকে 'এডুকেশন' বা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে। নিয়মবদ্ধ অনুশীলনের সাহায্যে বিষয় বিশেষে অধিকার অর্জনও শিক্ষার অঙ্গীভূত।

প্রাচীন ভারতে ছাত্র গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ করত। জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠন সেই শিক্ষার মুখ্য অঙ্গ ছিল।[১] আচার্য বৃহস্পতির কাছে সোম,

১। প্রাচীন ভারতে তপোবনাশ্রিত গুরুগৃহে বা বৌদ্ধ বিহারগুলিতে যে-শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তাতে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, বৃত্তি, নিষ্ঠা, তপ প্রভৃতির চর্চা করা হত।

বা শুক্রাচার্যের কাছে কচের শিষ্যত্বের কাহিনী সুপরিচিত। মেয়েরা তখন প্রধানতঃ গৃহে পিতা বা স্বামীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মৈত্রেয়ী, গার্গী, অপালা প্রভৃতির বিদ্যাচর্চার উল্লেখ প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। রাজা-রাজড়ার ঘরে থাকতেন গৃহশিক্ষক। দ্রোনাচার্য কৌরবদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। কুলগুরুরাও শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। ঋষিগণ তপোবনের শান্ত পরিবেশে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে নিজেরা ধর্মচর্চা করতেন এবং ছাত্রদের বিদ্যাদান করতেন। বৌদ্ধরা ধর্মচর্চা ও বিদ্যাচর্চার জন্য 'বিহার' বা বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন ভারতে একদিকে যেমন ধর্ম ও দর্শনের চর্চা হত, অন্যদিকে তেমনি বস্তু-বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্য প্রভৃতির চর্চাও কিছু কম হত না।

গৌড়বঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানচর্চা কমে এলেও ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত পণ্ডিত বা আচার্যের টোলে হিন্দু ছাত্ররা ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য প্রভৃতির পাঠ নিতেন। মৌলিক গ্রন্থাদিও রচিত হত। নিমাই নবদ্বীপে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণের পাঠ গ্রহণ করে পণ্ডিত আখ্যা পেয়েছিলেন। রঘুনাথের ন্যায়চর্চা, রঘুনন্দনের স্মৃতিচর্চা, বা কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রচর্চা এই নবদ্বীপেই ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে হয়েছিল। শাস্ত্রীয় জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হিসাবে কাশী বৃন্দাবনের পাশে মিথিলা ও নবদ্বীপের নামও তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলাম রাজত্ব সুরু হবার পর থেকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য মক্তব-মাদ্রাসার প্রসার ঘটেছিল। সেখানে আরবী-ফারসী ভাষা ও ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থই মুখ্য পাঠ্য ছিল। সেই সঙ্গে আরব পারস্যের সমৃদ্ধ সাহিত্যেরও তারা পাঠ গ্রহণ করতেন। মনে হয়, পাঠান আমল (১৩-১৪ শতক) থেকে, বা তার কিছুটা আগে থেকেই প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির চর্চা একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম, ন্যায়, কাব্য-ব্যাকরণের চর্চার দিকেই আচার্য ও শিক্ষার্থীরা বেশী মনোনিবেশ করেছিলেন।

উনবিংশ শতকে ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ ঘটল। অল্পদিনের মধ্যেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়কদের সক্রিয় সহায়তায় প্রথম বাংলা দেশেই ইংরেজী শিক্ষাদর্শ প্রচলিত হল। সমাজ ও ধর্মসংস্কারে, শিক্ষা-

বিস্তারে সাহিত্যচর্চায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, খাদ্য ও পানীয়ে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে,—এক-কথায় সামগ্রিক জীবনচর্চায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাঙালী জীবনে প্রতিফলিত হল। ধীরে ধীরে ইংরেজী স্কুলের প্রসার ঘটতে লাগল এবং ইংরেজী শিক্ষিত একটি বাঙালী সম্প্রদায় গড়ে উঠল। এই নব্য ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী সমাজই উনবিংশ শতকে আধুনিক বঙ্গ সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল। তাঁদের বহুমুখী কর্মধারায়, সাহিত্যসৃষ্টিতে, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে, স্বদেশী আন্দোলনে, দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারে, জীবিকার পন্থা উদ্ভাবনে, নব্য বঙ্গ সংস্কৃতির যে ভাবে জন্ম ও বিকাশ ঘটেছিল ঐতিহাসিকগণ তার বিশ ইতিহাস লিখেছেন। ভাল এবং মন্দ উভয় দিকেই তার যে উত্তরাধিকারদ আমরা লাভ করেছি বিংশ শতকের বঙ্গ, তথা, ভারত-সংস্কৃতিতে তারই বহুমুখী প্রতিফলন সর্বত্র লক্ষ করা যায়।

উনবিংশ শতকের ইংরেজী শিক্ষাধারা একদিকে যেমন বাংলায় তথা ভারতে চিন্তার মুক্তি এনে দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি একটি বিপুলায়তন ইংরেজীজানা মধ্যবিত্ত কেরানী গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল। ইংরেজেরা এ দেশ শাসনের উদ্দেশ্যে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর উদ্দেশ্যে যে মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবি সম্প্রদায় গড়ে তুলবার উপযোগী শিক্ষাধারা চালু করেছিল বিংশ শতকে এসে সেই সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যমুখীন শিক্ষাধারার গলদ প্রকট হয়ে উঠল। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই দেশে এমন একটি অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিল যে ইংরেজী স্কুল কলেজের ডিগ্রিধারীরা অতি সামান্য মাইনের একটি চাকরীর আশায় সরকারী বেসরকারী অফিসের দরজায় ব্যর্থ আশায় ফিরতে লাগলেন।

ইতিমধ্যেই শিক্ষাধারার মোড় ফেরানোর চেষ্টা যে আরম্ভ না হয়েছিল এমন নয়। কেতাবীবিদ্যার তুলনায় হাতে কলমে শেখা কারীগরী বিদ্যা যে জাতিগঠনের পক্ষে অনেক বেশী কার্যকরী হতে পারে একথা প্রথম বুঝেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। সেকারণেই তিনি 'ভারত সংস্কার সভা' (১৮৭০) প্রতিষ্ঠা করে শিল্পবিদ্যালয় এবং শ্রমজীবি বিদ্যালয় মাধ্যমে বৃত্তিমুখীন শিক্ষা প্রসারে মনোযোগী হয়েছিলেন। তবে এ কাজে সর্বাত্মক ভাবে আত্মনিয়োগ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি বলেই বোধহয় এ শিক্ষায়তনগুলি বেশীদিন চলতে পারেনি। আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হয়ে ইংরেজী পাঠক্রম চালু রেখেও তারমধ্যে কিছুটা বাংলা পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করলেন,

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌দের টেনে এনে তাকে উচ্চতর জ্ঞানানুশীলনের পীঠস্থান করে তুললেন। কিন্তু ঘরে ঘরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা তাঁর সময়েই সবচেয়ে বেড়ে গিয়েছিল সন্দেহ নেই। তখন পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার ও বেকারত্বের প্রসার সমানভাবেই চলছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে 'বিশ্বভারতী'তে রূপদানের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। গান্ধীজিও ওয়ার্ধায় সেবাগ্রাম স্থাপন করে, হাতে কলমে শিক্ষালাভের উপযোগী, নতুন বুনিয়াদী শিক্ষাক্রম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একদল শিক্ষিত দেশপ্রেমী যাদবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল এবং কলকাতায় দু একটি স্কুল কলেজ স্থাপন করেছিলেন। গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনও কোনও দেশব্রতী চরিত্রগঠনোপযোগী শিক্ষাশ্রমও স্থাপন করেছিলেন। বাংলাদেশের এইসব শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী পরিকল্পনাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। শান্তিনিকেতনে তিনি যেমন কলা ও বিজ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি নৃত্য, সংগীত, স্থাপত্য এবং চিত্রশিল্প চর্চার আয়োজন করেছিলেন। 'শ্রীনিকেতন' পল্লীশিক্ষায়তনের মাধ্যমে চামড়ার কাজ, তাঁতের, সূঁচের ও কুরুশের কাজ, বাঁশ ও বেতের বুনুনীর কাজ, ছুতারের কাজ, কৃষিবিদ্যা, গরু ও হাঁসমুরগী পালন, মাটির শিল্পকাজ প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। চারপাশের গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রও স্থাপন করেছিলেন। সমবায় ভিত্তিক একটি গ্রামীন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রামীণ সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেবার জন্য বাৎসরিক মেলার আয়োজন করেছিলেন। হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপন, অনুন্নতদের সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠান চালু করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতিভিত্তিক গ্রামীণ সর্বতোমুখী শিক্ষার কথাই রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন। সেই সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিমের অন্যান্য সংস্কৃতিকেও তিনি বিশ্বভারতীর অঙ্গনে উদার আহ্বান জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিতে বার বার আহ্বান জানিয়েছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর এই দূরপ্রসারী সুচিন্তিত শিক্ষাবিস্তার-প্রচেষ্টা তখনকার শিক্ষিত বাঙালী সমাজে কিছুটা কৌতূহল জাগালেও তাঁদের তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। যতদূর মনে পড়ছে, তৎকালীন স্বাধীনতা-আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস থেকেও গান্ধীজির

বুনিয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে একটি শিক্ষাদর্শ ঘোষিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর ত্রিশ বছর ধরে ভারতের শাসনদণ্ড কার্যতঃ কংগ্রেসের হাতে রয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শ যেমন কিছুটা গ্রহণ করেছেন তেমনি পাশাপাশি সামান্য পরিবর্তিত ভাবে ইংরেজ শিক্ষাধারাও চালু রেখেছেন। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল, সহযোগিতার ভিত্তিতে হাতে কলমে কাজের শিক্ষা,—কেতাবী শিক্ষার গুরুত্ব কিছুটা কমানো,—অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ ঘনিষ্ঠতর করবার পরিকল্পনা। কার্যতঃ এখনো এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা যে চাকুরী প্রত্যাশী না হয়ে হাতে কলমে কাজ করে স্বনির্ভর হচ্ছে এমন নজির বেশী মিলবে না। এখনো ইংরেজী শিক্ষাধারার প্রতিই আমাদের ঝোঁক। সামান্য যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে সে হ'ল, স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম এখন মাতৃভাষা হতে পেরেছে। তার বিরূপ প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা যাবে। সমাজের বিশেষ এক শিক্ষিত শ্রেণী মোটা অর্থব্যয়ে মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী মিডিয়ম স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন। দেশীয় পরিচালনায়ও এমন কিছু ইংরেজী মিডিয়ম স্কুল গড়ে উঠেছে। যাঁরা নিজেদের 'অভিজাত সমাজের' লোক মনে করেন তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েদের এই ধরনের স্কুলে পড়ানো ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। এরা ইংরেজী চলন-বলন, আদব-কায়দা শিখছেন, বিসর্জনও যে না করছেন এমন নয়। এক বিশেষ ধরনের 'ডিসিপ্লিন' ও আয়ত্ত করছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র বা যোগেশচন্দ্র (বিদ্যানিধি) যাকে স্বদেশী শিক্ষা মনে করতেন তার সঙ্গে এই শিক্ষাধারার যোগসূত্র ক্ষীণ। একথা স্বীকার করতে হয়, চাকুরী ক্ষেত্রে এই 'ইংরেজী মিডিয়ম' স্কুলের ছাত্রছাত্রী যতটা কৃতিত্ব লাভ করছেন সরকারী সাহায্যপুষ্ট সাধারণ স্কুলের শিক্ষার্থীরা ততটা সফল হতে পারছেন না।—কলেজগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ কুলীন-অকুলীন দুটি শ্রেণী বিভাগ রয়েছে।

স্কুল কলেজী শিক্ষাধারাকে এতদিন চারটি স্তরে ভাগ করা হতঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পুনর্বিন্যাস করে দুটি পৃথক পরিচালন সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এখন আমাদের শিক্ষাক্রমের পাঁচটি স্তর হয়েছে বলতে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা এখন ভারতের সব রাজ্যগুলিতেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গ্রামে—গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় এখন প্রাইমারী স্কুলের ছড়াছড়ি। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ স্কুলই দৈন্যদশাগ্রস্ত। অর্ধশিক্ষিত স্থানীয় কোনও ব্যক্তি এর শিক্ষক। কৃষক ও শ্রমিকদের ঘরের ছেলেমেয়েরা এ সব স্কুলে পড়তে যায়। তাদের উপস্থিতি ও পঠন দুইই অনিয়মিত। দায়সারা এই বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থায় নিরক্ষরতা সামান্য কিছুটা দূর হলেও, সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শ ব্যবস্থা একে কোনোভাবেই বলা চলে না। শহরে এবং আধাশহর অঞ্চলে ইংরেজী আদর্শের (অধিকাংশই ইংরেজী মিডিয়ম) কিণ্ডারগার্টেন স্কুল বা নার্সারী স্কুল ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে। শুধু অভিজাত পরিবার নয়, নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তরের অভিভাবকরাও তাদের ছেলেমেয়েকে এই সব স্কুলে কিছু বেশী মাইনে দিয়েও পড়তে পাঠাচ্ছেন। শহর ও শিল্পাঞ্চলে পাড়ার 'ছোটলোকে'র ছেলেমেয়েদের ছোঁয়া থেকে নিজের সন্তানটিকে রক্ষা করতে 'ভদ্রলোকেরা' সকলেই ব্যস্ত। তাই সরকারী পরিচালনাধীন প্রাইমারী স্কুলগুলি 'ছোটলোক'দের স্কুলই হয়ে রইল। যদিও সরকারী মাইনের স্কেল কিছুটা ভাল হবার পর আজকাল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর তরুণ-তরুণীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা হয়ে আসছেন।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতের শিক্ষা কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করবার উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে পরপর তিনটি শিক্ষাকমিশন বসেছিল।[২] এদের সুপারিশ অনুযায়ী মুখ্যতঃ মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরেই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। গত ত্রিশ বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুলের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রছাত্রীও সম অনুপাতে বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের একটি মাত্র 'সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডে'র পক্ষে এতবড় দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার এখন সামলানোই এক সমস্যা। তারা সেজন্য আঞ্চলিক কয়েকটি শাখাবোর্ড খুলেছেন। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কয়েক বছর আগে একবার পুরোনো দশবছরের 'স্কুল ফাইনাল' কোর্স পরিবর্তন করে এগার বছরের উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু

২। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ১৯৪৮, মুদালিয়র কমিশন ১৯৫২ এবং কোঠারী কমিশন ১৯৬৪।

করা হয়েছিল[৩]। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কলেজে পূর্বপ্রচলিত দুবছরের ইন্টারমিডিয়েট এবং দুবছরের ডিগ্রিকোর্স তুলে দিয়ে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স (পাস ও অনার্স) প্রবর্তিত হয়েছিল। বহুকোটি অর্থব্যয়ে, অনেক দুঃখে ও যত্নে, বিভিন্ন স্কুল কলেজে এই পরিবর্তিত পাঠক্রম যখন সবে চালু হল ঠিক তখনই আবার কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে স্কুলগুলিতে দশ বছরের মাধ্যমিক কোর্স প্রবর্তন করা হল। সেই সঙ্গে নতুন 'হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ডের' পরিচালনাধীনে কিছু স্কুল এবং কিছু কলেজে নতুন ধাঁচের 'উচ্চতর মাধ্যমিক' কোর্স এবারে প্রবর্তিত হতে চলেছে। এর ফলে কলেজেও দুবছরের পাস ও তিন বছরের অনার্স ডিগ্রি কোর্স করতে হবে। এগার বছরের পুরোনো উচ্চমাধ্যমিক কোর্সে নবম শ্রেণী থেকেই ছাত্র ছাত্রীরা কলা, বিজ্ঞান, বানিজ্য, কৃষি, সমাজ বিজ্ঞান, (কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য) সুকুমার কলা—বিভিন্ন ধারায় পৃথকভাবে পড়াশুনা করত। এখন আবার নতুন মাধ্যমিকে কারীগরী ও শারীরবিদ্যা, বিজ্ঞান, কলা—সব মিশিয়ে একটি বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীদের এইসঙ্গে হাতে কলমে কাজের, মৌখিক উত্তর দানের এবং লিখিত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ বছর থেকে যে-উচ্চতর মাধ্যমিক কোর্স চালু হতে চলেছে সেখানেও কলা-বিজ্ঞান এবং কারীগরী বিদ্যায় দুটি ভিন্ন কোর্সে অনুরূপ হাতে কলমে কাজ শেখানোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে।[৪]

৩। এই উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, চারুকলা এবং কৃষি—এই ছয়টি শাখায় ভাগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম তিনটি শাখাতেই অধিকাংশ ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করত।

৪। উচ্চতর মাধ্যমিক কোর্সের প্রধান দুটি ভাগ; জেনারেল এবং ভোকেশনাল। 'জেনারেলে'র মধ্যে কলা, বিজ্ঞান, শরীরচর্চা-কর্মশিক্ষা সমাজ শিক্ষা প্রভৃতির পাঠ রয়েছে। ভোকেশন্যালে প্যারামেডিক্যাল, এগ্রিকালচারাল, টেক্সটাইল প্রভৃতি আরও পাঁচটি বিষয় পঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া 'ব্রিজ্ কোর্স' নামে সংযোগমূলক একটি কোর্সও প্রবর্তিত হচ্ছে। জেনারেলের মধ্যে আবার 'অ্যাডভান্স লেবেল' নামে অপেক্ষাকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পাঠক্রম রাখা হয়েছে। অনুমান করছি এবারের ছাত্রছাত্রীরা ভীড় করবে জেনারেল পাঠক্রমে—এবং তার মধ্যেও বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে। কর্তৃপক্ষ অবশ্য চাইছেন অপেক্ষাকৃত কমমেধাবী ছাত্র ছাত্রারা 'ভোকেশানাল' কোর্সে পড়াশুনা করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক।

সেকেণ্ডারী ও হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছেন তাঁরা কেতাবী পাঠক্রমের গুরুভার কমিয়ে বৃত্তিমুখী বিদ্যার দিকে নজর দিয়েছেন। এতে ছেলেমেয়েরা খেলাধূলায় ও হাতে কাজ করার যেমন আনন্দ পাবে, অপর-দিকে জীবনের সঙ্গে যোগহীন মুখস্ত কেতাবী বিদ্যার বোঝা থেকে মুক্তি পাবে। বাস্তবে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, লক্ষ করা যাচ্ছে, এই নতুন ধাঁচের পাঠক্রম অনুসরণ করবার উপযোগী মানসিকতা বা দক্ষতা স্কুল শিক্ষকরা এখনো অর্জন করতে পারেননি। তার ফলে বোর্ড চালু করতে চাইলেও কার্যতঃ এই কোর্সগুলির পঠন-পাঠন আশানুরূপ ভাবে হচ্ছে না। কয়েক লক্ষ নিরপরাধ ছাত্র ছাত্রীকে 'গিনিপিগ্' হিসেবে ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক নতুন পরীক্ষায় নেমেছেন। তাছাড়া প্রয়োজনীয় মানের পাঠ্য-পুস্তকও এখনো লিখিত হয়নি। যাঁরা সিলেবাস রচনা করছেন, মনে হয়, তাঁরাও সুকুমারমতি বালক বালিকার পক্ষে কতটা ভার বহন সম্ভবপর সেকথা মনে না রেখে তাদের কাছে অহেতুক বেশী প্রত্যাশা করছেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য, ১১+৩ বর্ষের পাঠক্রম বদল করে ১০+২+৩ বর্ষের পাঠক্রম চালু করাতে ছেলেমেয়েদের স্নাতক-ডিগ্রি পেতে এক বছর বেশী লাগবে। অভিভাবকদের উপর আর্থিক চাপ বেশী পড়বে। সেটা ভাল হল, না মন্দ হল, এখনই বলা সম্ভবপর নয়। কয়েকবছর এই নতুন ১০+২+৩ শ্রেণীর পাঠক্রম চলবার পর হয়তো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সংশোধন করতে পারবেন। ততদিনে আবার নতুন ক'রে কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর যে অপূরণীয় ক্ষতি হতে থাকবে শিক্ষাবিদগণ তার দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে ভেবেছেন কি?

স্কুল পর্যায়ে লেখাপড়া গত ৩৫ বছর ধরে মাতৃভাষার মাধ্যমে চলছে। কলেজী পর্যায়েও বোধহয় বাংলায় উত্তর লিখবার সুযোগ দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই এসেছে। আর দুচার বছরের মধ্যেই স্নাতকোত্তর স্তরেও মাতৃ-ভাষায় উত্তরপত্র লেখার সুযোগ ছাত্র ছাত্রীরা পাবেন আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা চর্চার গুরুত্ব গত তিন দশকে যথেষ্ট বেড়েছে।—সেই সঙ্গে সাধারণ স্কুল-কলেজে ইংরেজী চর্চার গুরুত্বও অনেক কমানো হয়েছে। তৎসত্ত্বেও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি, পুরোনো পাঠক্রমে যাঁরা ইংরেজী মাধ্যমে লেখাপড়া করেছেন তাঁরা বাংলা যতটা নির্ভুল ভাবে লেখেন নতুন পাঠক্রমের ছাত্র ছাত্রীরা বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া করেও তা লিখতে পারেন না।

ইংরেজীর কথা আর না তোলাই ভাল। সবচেয়ে অসঙ্গতি লক্ষ করা যাচ্ছে সরকারী বেসরকারী অফিসগুলিতে। এখনো সেখানে ইংরেজীতেই খাতা-পত্র রাখা হয়, নোট চালাচালি হয়, চিঠিপত্র লেখা হয়। ডাকঘর থেকে বাংলায় ছাপা ফর্মে ইংরেজীতে লেখা চিঠি পাচ্ছি। বেশী কথা কি, পশ্চিম-বঙ্গেরই একটি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো একবর্ণ বাংলা না পড়িয়েই বি. এ. অনার্স ডিগ্রি দিচ্ছেন অর্থনীতি, ইংরেজী ও সমাজবিদ্যায়। ছেলেমেয়েকে উত্তরপত্র লিখতে হচ্ছে ইংরেজীতেই। এই অসঙ্গতি আমাদের দোলাচল মানসিকতারই পরিচায়ক বলে মনে করি।

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে স্কুল কলেজের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। অনুমান করছি, এ রাজ্যের পাঁচকোটি জনসংখ্যার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দুকোটির মতো লোক প্রাইমারী স্কুল থেকে স্নাতকোত্তর কলেজ পর্যন্ত কোথাও না কোথাও পাঠ গ্রহণ করেছে বা করছে। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে গেছে, কলেজের সংখ্যাও বোধহয় অর্ধসহস্র ছাড়িয়েছে। আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যাও বোধহয় দুলক্ষ ছাড়িয়েছে। এখন ঘরে ঘরে বি. এ./এম.এ. পাস বেকার যুবক যুবতী অন্ধকার ভবিষ্যৎ চিন্তায় দিশেহারা। অথচ শতবর্ষকাল পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রথম বি. এ. পাঠক্রম চালু হয়েছিল তখন গ্রাজুয়েট হলেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী বাঁধা ছিল। পরিকল্পনাহীন শিক্ষাক্রমের গতানুগতিক ধারা দীর্ঘকাল ধরে চলবার ফলেই শিক্ষিতসমাজে এই বেকারত্বের সমস্যা এত কঠিন হয়ে উঠেছে।

এতদিন প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয় বা পুরোনো উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম শেষ করবার পর অধিকাংশ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের অভিভাবক ছেলেমেয়েকে চাকরীর বাজারে দাম ও মর্যাদা আছে এমন কোনও অর্থকরী বিষয় পড়াতে চাইতেন। যে সব ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল করে, তারপর যে ছেলে-মেয়ের অভিভাবকদের সুপারিশ ও অর্থের জোর থাকে তারা ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি মর্যাদাসম্পন্ন বৃত্তিধর্মী শিক্ষা গ্রহণে সচেষ্ট হয়। তারপর রসায়ণ, পদার্থবিদ্যা জাতীয় জড় বিজ্ঞান বিষয়গুলির চাহিদা। চাকরী পাওয়া সহজ বলে কৃষিস্নাতক হবার দিকেও ছেলেমেয়েদের বেশ আগ্রহ বেড়েছে। কমার্স এবং অর্থনীতির চাহিদাও কিছু রয়েছে। কিছু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী সমাজবিদ্যা, ইংরেজী সাহিত্য প্রভৃতিও পড়তে যায়। যারা স্কুলের পরীক্ষায়

ভাল ফল করতে পারেনি এবং অভিভাবকদের সুপারিশেরও তেমন জোর নেই তারা 'অকুলীন' (ইতিহাস, দর্শন, বাংলা, সংস্কৃত ইত্যাদি) বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়তে যায়। যাদের সে সুযোগও জোটে না তারা পাসকোর্সে বি. এ. পড়তে চায়। এরপর আশা, এম, এ, এবং বি,টি, পড়বার যদি সুযোগ পায় অন্ততঃ স্কুল শিক্ষকতার একটি চাকুরী সংগ্রহ করতে পারবে। ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, বিজ্ঞান বিষয়ে যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিতে পারে তাদের ভবিষ্যৎ চাকরীর বাজারে উজ্জ্বলতর। সাধারণ পাস কোর্সের স্নাতকরা স্কুলশিক্ষক বা সওদাগরী অফিসের কেরানী হতে পারলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে।

অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙ্গালীর চাকরীমুখীন মনোভাবের পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন,—তাদের স্বনির্ভর ব্যবসায়মুখীন হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু স্কুল কলেজে যে ধরনের শিক্ষা ও মানসিকতা তাদের গড়ে ওঠে তাতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকেরা চাকরী ভিন্ন বিকল্প কোনও স্বনির্ভর জীবিকার কথা ভাবতেই ভয় পায়। অথচ একথাও বোধহয় অস্বীকার করা যাবে না, এ যুগের যুবকেরা চাকুরী ক্ষেত্রেও তাঁদের পূর্বগামীদের মতো দক্ষতা ও নিষ্ঠা দেখাতে পারছেন না।

বিদ্যা, কর্মদক্ষতা বা চারিত্র অর্জনে এ যুগের বাঙালী তরুণরা কেন সফলকাম হতে পারছেন না তার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমত, গত দেড় শতাব্দী কাল ধরে যে ধরনের ইংরেজী শিক্ষা আমরা (অর্থাৎ তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণী) গ্রহণ করেছি তাতে ক্রমান্বয়ে ভারতের মূল সমাজধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত বলে সবচেয়ে সমাজে সম্মান লাভ করেছেন, ধনে-মানে-প্রতিষ্ঠায় উচ্চস্থানের অধিকারী হয়েছেন,—ভারতের মূল প্রাণধারার সঙ্গে কিন্তু তাঁদের প্রকৃত যোগ ঘটেনি। আমরা তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় একটি মেকী সহর ঘেঁষা পৃথক সমাজ গড়ে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করছি। অথচ, সেই ইংরেজ আমল থেকেই এই 'ভদ্রলোক' শ্রেণীই দেশের 'ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী সেজে বসে আছে। একটু খেয়াল করলেই ধরা যাবে, 'ভদ্রলোক শ্রেণী' এবং চাষী মজুর শ্রেণীর মধ্যে শুধু অর্থনৈতিক নয়, মানসিক দিক থেকেও কি বিপুল ব্যবধান রয়েছে। এককালে আমাদের শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর পরিবারগুলিতে মেয়ে-পুরুষের মধ্যেও এই ধরনের একটি ব্যবধান ছিল। মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ

করার পর, বিশেষ করে বাইরে বেরিয়ে চাকরী-বাকরী আরম্ভ করার পর ওই ব্যবধান অনেকটা কমে এসেছে। কিন্তু সমাজে 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোকে'র ব্যবধান ঘোচাবার পথ এখনো উদ্ভাবিত হয়নি। মূল সমাজ-প্রেরণার সঙ্গে যোগবিহীন শিক্ষা মনের প্রকৃত বিকাশ ঘটাতে পারে না, চারিত্রিক বনিয়াদ ও গড়ে তুলতে পারে না[৫]।

দ্বিতীয়ত, ইংরেজ আমলে, বিশেষ করে বিংশ শতকে, প্রধানতঃ আমলা-তন্ত্রের প্রয়োজনে, বশংবদ কেরানী তৈরীর জন্য যে ইংরেজী শিক্ষাধারা স্কুল কলেজে চালু হয়েছিল দেশ স্বাধীন হবার পর সেই শিক্ষাধারায় মৌলিক কোনও পরিবর্তন এতকাল ঘটে নি। তার ফলে সীমিত করণিক বৃত্তির চাকরীর তুলনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকারের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী স্কুল কলেজী কেতাবী শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। এদেরই এক বৃহৎ গোষ্ঠী প্রত্যাশার তুলনায় অনেক নিম্ন মানের চাকরীতে অফিসে, স্কুল কলেজে ঢুকতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের সেই ক্ষোভ এবং হতাশা যেমন অফিসগুলিতে কর্মদক্ষতা নষ্ট করেছে, আধা পঙ্গু কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও বিপর্যস্ত করেছে। অর্ধশতাব্দী পূর্বে অতিসামান্য বেতন পেয়েও স্কুলকলেজের শিক্ষকগণ যে নৈতিক আদর্শ ছাত্রদের সামনে রেখেছেন এখন তার দশ পনেরো গুণ মাইনে বাড়লেও নবীন শিক্ষকেরা আর সে আদর্শ রক্ষা করতে পারছেন না।—হয়ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে রক্ষা করবার উপযোগিতাও দেখছেন না। এ এক ধরনের আত্মহনন বলা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, শিক্ষাবিদ্ এবং দেশনায়কদের সুষ্ঠু পরিকল্পনাবোধের অভাবে যে ধরনের ছাত্রছাত্রীরা এখন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে বা কলেজে এসে ভীড় জমাচ্ছে তাতেও যথার্থ শিক্ষা পরিবেশের অবনতি ঘটছে। এখন জীবিকার অন্য কোনও রাস্তা দেখতে না পেয়ে যে-ছাত্রছাত্রীরা উচ্চমাধ্যমিক বা বি. এ., এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হচ্ছে এদের অধিকাংশই সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক কোনও

৫। লক্ষ্য করবার বিষয়, স্বাধীনতার পর থেকেই অনুন্নত শ্রেণীর প্রতি সরকার বিশেষ দৃষ্টি দেবার ফলে এখন কিছু কৃষক পরিবার থেকে ছাত্রছাত্রী স্কুল কলেজে সরকারী বৃত্তি নিয়ে পড়তে আসছে। তারাও শিক্ষালাভ করে আর নিজের সমাজে খাপ খাওয়াতে পারছে না। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর দলবৃদ্ধি করে চাকুরী করতে শহরে এসেই ভীড় করছে। আর কিছুকালের মধ্যে এই দূরদৃষ্টিহীন নীতির ফলও আমাদের ভুগতে হবে, সন্দেহ নেই।

কারীগরী শিক্ষার পথ খোলা পেলে,—এবং সে শিক্ষায় সম্মানের সঙ্গে জীবিকার্জন সম্ভবপর হবে বুঝতে পারলে, এই গতানুগতিক শিক্ষার স্রোতে গা ভাসাত না। বস্তুত দেশের প্রয়োজনানুগ শিক্ষা-পরিকল্পনার অভাবে আমাদের দেশে তরুণ শক্তির কি বিপুল অপচয় ঘটছে ভাবলে অবাক হতে হয়।[৬]

এখন প্রশ্ন হল, কাকে এর জন্য দায়ী করব? কোঠারী কমিশনের সুপারিশ মেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এবারে ১০+২+৩ বছরের স্কুল-কলেজী নতুন পাঠক্রম ভারতবর্ষে চালু করতে চলেছেন, সেখানেও অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ঘোড়ার আগেই গাড়ী জুতে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা তৈরী না করেই, স্কুলগুলির নতুন কোর্স চালাবার মতো শক্তি আছে কিনা না দেখেই একংরকম বাইরে থেকে পাঠক্রম ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মর্মান্তিক পরিণতি এখন কয়েক বছর ধরে হাড়ে হাড়ে সবাইকে,—বিশেষ করে বিবেকবান অভিভাবক এবং শিক্ষকদের ভোগ করতে হবে। আশঙ্কা করছি, নতুন হায়ার সেকেণ্ডারী এই চরম অপ্রস্তুত অবস্থায় চালু করতে গিয়ে একই, হয়তো বা আরও মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। একথা ঠিক, জীবিকা এবং শিক্ষার মধ্যে সামাঞ্জস্য এনে নতুন পাঠক্রম তৈরী করতে হবে। তার জন্যে শিক্ষায়তনগুলিকেও নতুন ছাঁচে ঢালতে হবে। হাতে কলমে কাজ শিখবার নতুন পথে ছেলেমেয়েকে চালিত করতে হবে। কিন্তু কারা চালিত করবে সেটা না ভেবে নতুন পাঠক্রম পাঠিয়ে দিলেই বোর্ড-কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালিত হল এমনটি ভাবা ঠিক হবে কি?

৬। সম্প্রতি সেকেণ্ডারী বোর্ড থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, দু লক্ষ ছেলেমেয়ের মধ্যে সওয়া লক্ষের উপর অকৃতকার্য হয়েছে। স্কুলে গত এগার বারো বছর ধরে পড়িয়ে এই ভয়াবহ ব্যর্থতার বোঝা যে তরুণ সম্প্রদায়ের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হল জাতীয় শক্তির অপচয়ের দিক থেকে তার গুরুত্ব একবার কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেছেন কি? পুরোনো উচ্চ মাধ্যমিকে যেগুলার পরীক্ষার এটিই শেষ বছর। এদের এই ব্যর্থতার হিমালয় পরিমাণ বোঝা জাতিকেই বইতে হবে। এদের মেরুদণ্ড সোজা করে সুস্থ নাগরিক হিসেবে চলবার অধিকার কেন ছিনিয়ে নেওয়া হল—কে তার উত্তর দেবে? এ ঘটনা প্রতি বছরই বিভিন্ন স্কুল কলেজী পরীক্ষায় পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকে স্যার হেনরী হার্ডিঞ্জের প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য পল্লী অঞ্চলে যে বাংলা পাঠশালা খোলা হয়েছিল, প্রয়োজনীয় পুস্তক, শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়কের অভাবে সেগুলি প্রায় অচল হতে বসেছিল। তখন সরকারী অনুরোধে বিদ্যাসাগর একাজে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি যেমন একদিকে নিজেই বিদ্যালয়পাঠ্য প্রাথমিক পুস্তক রচনা করেছিলেন, তেমনি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়েও স্কুলপাঠ্য বই লিখিয়েছিলেন। একদিকে যেমন, সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক তৈরীর উদ্দেশ্যে নর্মাল স্কুল স্থাপন করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি নিজে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলি আদর্শ প্রাথমিক বাংলা বিদ্যালয় খুলে সেগুলি চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নতুন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম যাঁরা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে চালু করে দিলেন, .তাঁরা কিন্তু এখনো এই পরিচালনার দিকটি সুষ্ঠুভাবে গড়তেই পারেন নি। এর ফলে, দেশের তরুণ ও যুব শক্তির আরও অপচয় হবার আশঙ্কা করি। একেই এ রাজ্যে তরুণরা চাকুরীমুখী মানসিকতার জন্য তীব্র বেকারত্বের জ্বালায় বিভ্রান্ত; আশঙ্কা করছি, এই প্রস্তুতিবিহীন নতুন পাঠক্রম চালু করার ফলে সেই বিভ্রান্তি তাদের আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের বিবেচনায়, রাষ্ট্রের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে, সমগ্র দেশের এই বিপুল তরুণ শক্তিকে কি ভাবে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী করে তোলা যায়, কি ভাবে তাদের মনে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তোলা যায় সে কথা চিন্তা করে শিক্ষাধারার পুনর্গঠন করতে হবে। তার জন্য রাষ্ট্রবিদ, সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ্ এবং অর্থনীতিবিদ্‌গণকে একসঙ্গে বসতে হবে। পাঠক্রম যেমন সাবধানে রচনা করতে হবে, তার রূপায়নের পথটিও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তৈরী করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দেশের সর্বাপেক্ষা বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী যেমন কারীগরী বিদ্যার চর্চা করে' কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ধারায় একাধারে জীবিকার্জন ও দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করবে,—অন্যদিকে তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা, উচ্চতর গবেষণা এবং সঙ্গীত-নৃত্য-কারু-চিত্র-স্থাপত্য জাতীয় সুকুমার কলাবিদ্যার চর্চাও রক্ষা করতে হবে। যারা বৃত্তিমুখী অর্থকরী বিদ্যা অর্জন করতে যাবে তাদের জন্য পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যেন বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থার্জনেরও সুযোগ পায়। দরিদ্র

দেশে নিজের পড়ার খরচ নিজেকেই তুলতে সুযোগ দিলে সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তার সহজতর হবে। যাঁরা এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তনের কাজে হাত দিয়েছেন তাঁদের এত তাড়াহুড়ো করে একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ভালো কাজকে সূচনাতেই বিপর্যস্ত করে ফেলা ঠিক হচ্ছে না বলেই মনে করি। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষাধারার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদের একসঙ্গে বসতে হবে, বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। মনে হয়, দীর্ঘ তিরিশ বছর সময় হাতে পেয়েও শিক্ষা-নিয়ামকগণ তার সদ্ব্যবহার না করে প্রথম বড়ো ভুল করেছেন। এবারে আবার পাঠক্রম পরিবর্তনে অত্যধিক তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরও বড়ো ভুল করতে চলেছেন।

শেষ করবার পূর্বে প্রাসঙ্গিক আর একটি প্রশ্নের আলোচনা করতে চাই। ধর্মনিষ্ঠ বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন, বর্তমান শিক্ষার ব্যর্থতার একটি বড়ো কারণ হল, ধর্মসংযোগহীনতা। প্রাচীন ভারতে ধর্মচর্চাকারী ঋষিরাই আচার্যের ভূমিকা নিতেন। অর্থাৎ শিক্ষা মূলতঃ ধর্মভিত্তিক ছিল। একালে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে বলেই যুগপৎ শিক্ষাব্রতীগণ এবং তরুণ ছাত্রছাত্রীরা সহজেই চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়ছেন। আপাতদৃষ্টে এ-যুক্তি স্বীকার্য বলে মনে হবে। রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় দেশীয় ধর্মসংস্থাগুলি বা বিদেশী মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষায়তনগুলি ছাত্রছাত্রীদের অনেক বেশী নিয়মানুবর্তী করে তুলতে সক্ষম হয়। তবে কঠোর ধর্মবন্ধন বা নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা শিক্ষার মূল সমস্যাকে বেশীদিন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। বরং আর একটি দিক থেকে মিশনারী শিক্ষায়তনগুলির কুফল সম্পর্কে আমাদের সচেতন হবার সময় এসেছে। এই ধরনের স্কুলগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে ওঠার ফলে অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়েরাই এসব স্থানে পড়তে আসছে। মেধাবী দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা সে তুলনায় কম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। তার ফলে, সমাজে আর একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া, অনেক সময় কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ফলে ধর্মবোধের বিরুদ্ধে ছেলেমেয়েদের মনে চাপা বিদ্রোহের মনোভাবও সৃষ্টি হচ্ছে। আসলে, দেশের সর্বস্তরের ছেলেমেয়ের নৈতিক মানোন্নয়নের কথা মনে রেখে দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করাই বাঞ্ছনীয়। সেখানে পাঠ্যসূচীর মধ্যে বা নিত্য আচরণ বিধির মধ্যে অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্মকথা অবশ্যই যোগ করা যেতে পারে। কিন্তু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শিক্ষায়তন গড়লে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য, সে কথা ভুললে চলবে না।

মৃত্যু দেবতা

জ্যোতির্ময়ীদেবী

ধ্যানদৃষ্টি শিল্পী আঁকে, স্তব্ধ ঘোর বন
মৃতপতি সাবিত্রীর সকাশে শমণ
দাঁড়ায়ে করুণনেত্র—নহে জীবত্রাস,
নাই করে ভয়ঙ্কর ভীম দণ্ড পাশ,
নীরব কোমলমূর্ত্তি প্রশান্ত মরণ।
মুগ্ধ কবি কন, যম সুন্দর এমন!

হেরিছে আতুর বিশ্ব সকল ভুবন,—
মন্ত্রসম কানে কানে করিল শ্রবণ;
রূপময় রূপহীন বরাভয়ঙ্কর!
জন্ম মৃত্যু স্বপ্নসম, মায়া চরাচর।
জীবন দেবেতে মেশা মরণ দেবতা,
দেহের আশ্রয়মুক্ত মুক্তির বারতা।
বন্ধু মিত্র সখা প্রভু সুহৃৎ শরণ,
প্রসাদ প্রসন্নস্পর্শ সুন্দর মরণ।*

---

* নন্দলাল বসুর আঁকা যমের ছবির উপরে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি পড়ে' লিখিত।

CENTRAL LIBRARY

প্রে মেথেয়ুস বাউণ্ড

জীবনকৃষ্ণ শেঠ

স্বর্গ হ'তে চুরি করি জগতের তরে
অগ্নি-রত্ন তুলে দিলে মানবের করে।
সভ্যতা সমৃদ্ধ পথে যাত্রা হলো সুরু
তুমি দেব মানবের আদিতম গুরু।
স্বর্গাধীশ জুপিতর বিদ্রোহী তোমারে
কঠোপাসে বাঁধি দিল তুষার-প্রাকারে।
ঝড়ের উদ্ধত নৃত্য, শকুনি গৃধিনী
দেহ লয়ে রাত্রিদিন খেলে ছিনিমিনি,
বিদ্যুৎ ঝলক নামে প্রচণ্ড পাবক
দগ্ধ করে দেহ তব। করুণা-সাধক,
সর্বদুঃখ তুচ্ছ করি ঊর্দ্ধ শিরঃ তুলি
অভীক দাঁড়ায়ে আগে। আত্মদাহ ভুলি।
দুঃখ নত তব কাছে, নত মৃত্যুভয়,
জাগে আত্মা জীবনের জয়ধ্বনিময়।

চিত্রপট

হরপ্রসাদ মিত্র

বিকেলের বালিয়াড়ী

দক্ষিণে সমুদ্রশব্দ, হাওয়ায় পাঞ্জাবি উড়ে যায়,
উঠোনের কুসুমিত জবাতে ও নয়নতারায়
এবং যে ছোটো ছোটো সূর্যমুখী পশ্চিমে তাকায়
বিকেল চিত্রিত করে মিহিপত্রী যে-সকল ঝাউ,
এইসবে যে একক তাতে আরো দল বা পল্লব—
যেমন, বাঁধানো লনে কক্-কক্ মোরগ-মুরগীরা,
দক্ষিণে পাঁচিল ঘেঁষে মর্মরিত নারকেল প্রহরী—
এবং বালির ঢেউ,—সুখ দুঃখ একই বালিয়াড়ী।

ভোরের দাঁড়কাক

মত্ত আবেগ যেন অফুরন্ত ফেনা আর ফেনা—
দর্শন মানেই কোনো চিরন্তন আদিগন্ত তট,
আকাশ অনন্ত রূপ-রূপান্তর ফোটানো ইজেল।

বেগুনী বোগনভিলা-কেতন ওড়ানো ঝোড়ো হাওয়া,
ইঞ্জনের শাঁখের আওয়াজ,
পশ্চিমে মন্দিরচূড়া দিগ্‌বলয়ে আরক্তিম ধ্বজা,
উড়ে গেল ছিন্ন দাঁড়কাক।

ভালবাসা যুদ্ধ হয়

গোপাল ভৌমিক

যুদ্ধ আর ভালবাসা ঘুরে ফিরে আসে :
ভাবি যাকে ভুলে গেছি
সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে
অকস্মাৎ দেখি তার স্থির চিত্র ভাসে
অতীত বয়কটকারী চোখের সম্মুখে
এবং বেচাল হয় সুখী বর্তমান।

মনে হয় ভালবাসা মরেও সরে না :
হয়তো সে ডুবে থাকে স্মৃতির গভীরে
এবং সুযোগ মত দেয় মাথাচাড়া।
কার তাতে ক্ষতি লাভ হিসাব কে রাখে ?
রণেভঙ্গ দিতে চাও যেতে পার দূরে
ভালবাসা হৃদয়কে ঠিক থাবে কুরে।
ঘৃণা থেকে যুদ্ধ আসে সেও তো চঞ্চল
মারমুখী কখনো সে কভু হৃতবল

আপসের পথে হাঁটে
দিতে চায় প্রেমের দোহাই
কিন্তু কত দিন সেটা কেউ তা জানে না,
ভালবাসা একদিন ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ হয়ে ওঠে।

এক সময় তুমি নিজেও

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দিনগুলো প্রচণ্ড রোদে এক সময়
বড়ো বেশী শুষ্ক ;
রাতগুলো অঝোর ধারার বর্ষণে
বড়ো বেশী স্যাঁতসেঁতে ;
দিন বা রাত কোনোটাকেই
কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

এ' যেন মায়াবী পোষাকপরা কোনো যাদুকর,
তোমার দিনরাত্রির
নিয়ন্তা ;
যখন তোমার ঠাণ্ডা হাওয়া দরকার,
বইয়ে দেবে আগুনের হলকা ;
যখন একমুঠো রোদের প্রতীক্ষায়,
নেমে আসবে বন্যাছড়ানো বৃষ্টি।

অথচ কাজে লাগাতে হবে রোদকে
স্যাঁতসেঁতে পারিপার্শ্বিক
চাঙ্গা করবার জন্যে ;
ব্যবহার করতে হবে বৃষ্টিকে
চষা মাঠের উর্বরতা বাড়াতে।

তুমি কাজে লেগে যাও এই সময়
চেষ্টা করতে করতে এক সময়
দেখবে
তুমি নিজেও অনেক বদলে গিয়েছ॥

অগ্নিঘর

আলোক সরকার

ওই আমাদের অগ্নিঘর সতর্ক হয়ে ঢুকবে।
দমকা হাওয়া আসার আগেই
জ্বেলে নেবে শুকনো গাছের ডাল, সতর্ক বাইরে আসবে।

বাইরে উথালপাথাল রোদ্দুর রোদ্দুর লাফিয়ে উঠে নাচছে
একবার উচু পাতার সবুজ তারপর নিচের পাতা।
দাঁড়াও সপ্রতিভ ঋজু পাশাপাশি ঘোষণার মতো রাখো

এই আমাদের আলো,—লকলক করছে লাল শিখা
মাঝখানে নীল আর সোনালী মেশানো স্তব্ধ।
দৃপ্ত আর নিয়মানুবর্ত রোদ্দুর আর আমাদের এই আলো।

নৃত্যময় ছন্দে ছন্দে ঘোরো জ্বলতে থাকুক শুকনো গাছের ডাল।
স্বতঃস্ফূর্ত আর বিকীর্ণ আর উজ্জ্বল
রোদ্দুর ঢেউয়ের মতো নামছে ; নৃত্যময় ছন্দে ছন্দে ঘোরো

ছুঁড়ে দাও শুকনো গাছের ডাল রোদ্দুর ভেদ ক'রে চলে যাক।
ওই আমাদের অগ্নিঘর
সতর্ক হয়ে ঢোকো, জ্বেলে নাও শুকনো গাছের ডাল।

প্রতিবিম্ব

বিজয়কুমার দত্ত

এই মাত্র তুমি চেয়েছিলে ?
নির্ভাজ মুখের মধ্যে বিদ্যুৎ স্বভাবে
ঠোঁটভাঙা হাসির ইশারা

যেন এক কৌতুক ও করুণার দৃশ্যমুখ, ভেসে উঠছে তার

চোখের মণিতে :
তুমি কোন অবোধ বালক
খেলা ভুলে, রয়েছো তাকিয়ে
হাঁটু জল জমে থাকা রাজপথে, বৃষ্টির বিকেলে :
যেন তার কণ্ঠের তরঙ্গভঙ্গ, শ্রুতিতে তোমার
গান হবে,—সুরের ঐশ্বর্য ভুলে হঠাৎ একদিন
শব্দের ভাস্কর্য মেলে কবিতার সহজ শরীর
তোমার মস্তিষ্ক-শিরা, হৃৎপিণ্ডের উত্থানে পতনে
নৃত্যপরা হবে।

এর চেয়ে বেশী প্রতিদান, অথবা প্রত্যাশা
অশোভন, কেন তুমি চাও ?
অথচ নিঃশেষে তাও ভেঙে চুরে যতবার হ'তে চেয়েছিলে
সাবালক, স্থিতধী-স্বভাব
তত সেই মুখের চিত্রিত পটে, রেখাঙ্কণ দেখে
তুমি আরো পিছু হাঁটো, পথহারা নির্বাক শিশুর
অশ্রু স্বেদ মাখামাখি অজানা জগতে

পায়ের ধ্বনি

বাণিক রায়

নিঃশব্দ পায়ের ধ্বনি প্রেরণার মতো
নগ্ন হয়ে আসে ধীরে হৃদয়ের কাছে,
ফুলের পাপড়ির রঙে রামধনু জ্বলে
আকাশের গায়, হৃদয়ের বসন্তের দিনে
শ্রাবণের বকুল সহসা জেগে ওঠে
পাহাড়ের গোপন ঝর্ণায়, পৃথিবীর
ভালোবাসা ঝরে পড়ে পাথরের বুকে।

আকাশে আকাশে নীল অজস্রের ঢেউ,
বেদনার নৌকায় মর্মর পুষ্প কতো
ধ্বনির আনন্দে জলে নিবিড় আনন্দে
গোপনে বেড়ায় নেচে মাটির ওপরে
মাস্তানের এ পৃথিবী কখন যে প্রেরণায় মজে !

অভিজ্ঞান

বাজীরাও সেন

কারখানার ছোট্ট এই সহকারী সামান্য অফিসে
মুখোমুখি স্বয়ম্ভর অবসর নেই।
অতিব্যস্ত টাইপের নিষ্প্রাণ চাবিতে অবিরাম চাঁপার আঙুলগুলো।
ডিক্টেশান, ড্রাফ্ট নাও। নির্ভুল গণিত কষো
লাভ ও ক্ষতির।
আরো গতি, আরো মনোযোগ।
সুতরাং অলস গুঞ্জন নয়,
চারিদিকে কর্মিষ্ঠ উত্তাপ,
সারাক্ষণ সমস্ত টেবিল জুড়ে ফাইলের শব।
উর্দিপরা বেয়ারারা ছুটোছুটি করে,
হয়তো বা কোনো কোনোদিন
এক আধাটি সাহেবেরও লাঞ্চে যেতে জোটে না সময়।
হঠাৎ অবাক দেখি—
সেকশানের দুঃসাহসী জুটি—শম্পা ও সমীর
সামনে দাঁড়িয়ে, হাত জোড়া হলুদ ছোয়ানো খাম।
তেরই ফাল্গুন—!
—তাই নাকি ?
একরাশ প্রজাপতি বাতাসে সাঁতার কাটে।
অলক্ষ্য জ্যোৎস্নার গন্ধে ভরে ওঠে সমস্ত নিঃশ্বাস।
মনে পড়ে, অফিসেরই গেটটার সামান্য ওপারে

ফুলে ফুলে উচ্ছলিত একাগ্র করবা।
তাহ'লে এ পৃথিবীর ও মড়াকাটা ঘরে—
মাঝে মাঝে এই সব উজ্জ্বল সংবাদ আসে।
রং চটা পরাতন পলেস্তরা নিঃশব্দে খসিয়ে
অন্তর অপরূপ ছবি
এই ই জীবন বুঝ!

বিচার প্রার্থী

মৈত্রেয়ী দেবী

বুকের কাছে মোচড় দিও না
আমি তোমায় শুধেছি দেনা।
হাতে ছিল অতুল বৈভব,
একে একে তুলে নিচ্ছ সব—
এখন কি রয়েছি ঋনী
আমাকে তাই রেখেছ বন্দি?
আজকে ছাড়ো আবার দেখা হবে
নূতন কোনো প্রাণের মহোৎসবে
সিংহাসনে যেথায় বিচারক
যেতে হবে বিনত মস্তক,
সেদিন বোঝা যাবে
কে দণ্ড পায়
কেই বা ছাড়া পাবে।

পশ্চিমা দুনিয়ার প্রতি চেতাবনী*

আলেকজাণ্ডার সলঝেনিট্‌সিন

বি. বি. সি. তাঁদের অকৃপণ সৌজন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন : পাশ্চাত্য দেশগুলি সম্পর্কে—বিশেষ তাঁদেশ দেশ ব্রিটেন সম্বন্ধে—আপন স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত বিদেশী আমি আমার মতামত দিই। বহিরাগতের দৃষ্টি হয়তো নতুন কিছু দেখতেও পারে। আমার একান্ত আশা, আমার এই বক্তব্য, আপনাদের কাছে খুব ক্লান্তিকর না ও ঠেকতে পারে। অবশ্য আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করি যে আপনাদের দেশের আভ্যন্তরীন সব কিছু সম্বন্ধে-আমি তেমন খুব ওয়াকিবহাল হয়তো নই। কিন্তু অন্য অনেক রাশিয়ানের মতোই আমি ও ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতি খুব আগ্রহের সঙ্গেই চিরকাল অনুসরণ করে এসেছি। আমি যা বলবো সোজা সরল ভাবেই বলবো, আপনাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবো না—তবে বিশ্বাস করবেন, আপনাদের নির্জ্জলা প্রশংসা করতে পারলে আমিই সবচেয়ে খুশী হতাম।

পঁচিশ বছর আগে কাজাখস্তানের শ্রমশিবিরে থাকা কালে আমরা যখন কম্যুনিষ্ট ট্যাঙ্ক বাহিনীর গতি রোধের ব্যর্থ চেষ্টায় নিরত ছিলাম, তখন পাশ্চাত্য দুনিয়া আমাদের কাছে স্বাধীনতার আলোক স্বরূপ প্রতিভাত হতো। আমরা পশ্চিমী জগৎকে কেবল আত্মিক শক্তির দুর্গই নয়, মানবিক প্রজ্ঞার আধার রূপেও দেখতাম।

ওই বছরেই আপনাদের একজন মন্ত্রী, হারবার্ট মরিসন, কী ভাবে যেন 'প্রাভদা'কে রাজী করেন যাতে তাঁর বক্তব্য কাটছাঁট না করে' পুরো এক পৃষ্ঠা জুড়ে তাতে বেরোয়। হায় ভগবান, কী অধীর আগ্রহেই না আমরা দৌড়েছিলুম, সেই "প্রাভদা"টি যেখানে দেওয়ালে লটকে দেওয়া হয়েছিল আমাদের জন্যে—আমরা সেই মাথাঙ্গাড়া, ময়লা ছেঁড়া জামা ও জেলখানার ধ্যাবড়া বুট পরা কয়েদীর দল!

---

* গত ১লা এপ্রিল ১৯৭৬ বি, বি, সি, লণ্ডন-এর রেডিও-র প্রোগ্রামে সলঝেনিট্‌সিনের এই ভাষণটি সম্প্রচারিত হয়। —মূল ইংরাজী থেকে অনুবাদক : শ্রীবিষাম্পতি চৌধুরী।

ওঃ এই কাণ্ড! আমরা ভেবেছিলাম, অবশেষে আমাদের অন্ধকার মাটির তলাকার জগৎটা এইবুঝি হীরকদ্যুতি কঠিন সত্যের আলোক-উদ্ভাসে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। শেষ মেষ সোভিয়েত সেন্সরশিপ তার চল্লিশ বছরের বুলডগের কামড় বুঝি শিথিল করলো এবার। যা যথার্থ সত্য এইবার ওঁর দ্বারা প্রকাশিত হবে। তিনি আমাদের পক্ষে দাঁড়াবেন। কিন্তু যতোই আমরা তাঁর সেই দুর্ব্বল বিস্বাদ লেখাটি পড়ছি ততোই আমাদের সব আশা ভরসা কল্পনা সব ভেঙ্গে পড়ছিল। এ-তো সবই ভাষাভাষা কথা,—কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার নৃশংস বর্ব্বরতার কাঠামো সম্বন্ধে ও সেই দুনিয়ার নিষ্ঠুর অভিপ্রায় সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই তার কথা! বুঝলাম, এজন্যেই "প্রাভদা" এতো উদারতার সঙ্গে সেটি প্রকাশ করেছে! আমরা চল্লিশ বছর ধরে' নরকবাস করছিলাম, আর এই ব্রিটিশ মন্ত্রীপ্রবর আমাদের জন্যে একটি আশার বানীও শোনাতে পারলেন না!

বছরের পর বছর কাটলো। তারপর। কয়েক দশক কেটে গেল। লৌহ-যবনিকা সত্ত্বেও পশ্চিমী দুনিয়ায় কী ঘটছে না ঘটছে, তারা কী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে, এ সব খবর বি. বি, সি-র রুশভাষায় সম্প্রচারের কল্যাণে—যদিও তা 'জ্যাম' করার দুরন্ত চেষ্টার বিরাম ছিল না—আমাদের কাছে এসে পৌছোচ্ছিল। কিন্তু যতোই আমরা তা পেতুম আমরা বিমূঢ় বোধ করতুম।

জানি, মানব প্রকৃতি দুর্ব্বোধ্য রহস্যময়তায় ও পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তুতে ঠাসা। এবং তাদের এই জটিলতাই শিল্পের জনক—শিল্প বলতে আমি যা কিছু সরলরৈখিক সূত্র, সমতল মীমাংসা অথবা অতিসরলী কৃত ব্যাখ্যার অতিরিক্ত তাই বোঝাতে চাইছি।

এই রকম একটি ধাঁধা বা রহস্য হলো: যারা দাসত্বের ভারে নিষ্পিষ্ট, যারা নরকের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত তারা কী করে যে তবু উঠে দাঁড়াবার ও মুক্তি অর্জ্জনের —প্রথমে দৈহিক ও পরে আত্মিক মুক্তি অর্জ্জনের—শক্তি সংগ্রহ করে, যেখানে স্বাধীনতার তুঙ্গ শিখরে যাদের অবাধ সঞ্চরণ তারা কী করে সহসা স্বাধীনতার অমৃতের স্বাদে তৃপ্তি হারায়, তাকে রক্ষার দৃঢ় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে, এবং মারাত্মক বিভ্রান্ত হয়ে দাসত্বের জন্যই যেন আকাঙ্ক্ষা করে! কিম্বা এই বা কী রহস্য যে, যেসব সমাজ জোর করে' গেলানো মিথ্যার বিষে অসার হয়ে গেছে, তারাই আপন অন্তরে লব্ধ স্বচ্ছ দৃষ্টিদ্বারা সব কিছু নির্ভুল পরিপ্রেক্ষিতে দেখে ও ঘটনা বৈচিত্র্যের আসল তাৎপর্য্যও অনুধাবন করে,—ওদিকে যারা সর্ব্ববিধ তথ্য ও

সত্যকে জানার অজস্র সুযোগের অধিকারী—তারাই সহসা কেমন করে' যেন, কী এক সম্মিলিত দৃষ্টিহীনতায় ও ঐচ্ছিক আত্মপ্রতারণায় তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে পড়ে ?

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের আধ্যাত্মিক পরিণতির ক্ষেত্রে আমরা ঠিক এই বিপরীত পর্য্যায় লক্ষ্য করেছি। এবং হায়, আপনাদের পরিণতির ক্রমিক গতি আমাদের তুলনায় পাঁচ অথবা দশগুণ দ্রুততর। পরিস্থিতি এতই ভয়ানক যে মানব-জাতির পক্ষে এক সামূহিক বিনষ্টি এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনাই যেন তিরোহিত হয়ে যায়। বহুদিন এটা আমরা বিশ্বাস করিনি। মনে করতুম, আমরা পাশ্চাত্য জগৎ সম্বন্ধে পুরো খবর পাচ্ছিনা বলেই ঐরকম ভাব'ছি। বছর কয়েক আগে নোবেল পুরস্কার বক্তৃতায় আমি আমার এই গভীর আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলাম।

কিন্তু পশ্চিমে না আসা পর্য্যন্ত, ও দুবছর সব কিছু গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ না করা পর্য্যন্ত, আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, পশ্চিমী দুনিয়া জাগতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে চোখ বুঁজে থাকতেই চায়, এবং তারা তাদের ইচ্ছাশক্তি কতটা হারিয়ে বসে' একটা ইচ্ছাশক্তিহীন জগতে পর্য্যবসিত হয়েছে : যাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাই হলো নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করা, তারা যেন বিপদের সম্মুখীন হয়ে প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে।

একটা জার্মান প্রবচন আছে : Mutverloren—allesverloren. "সাহস হারালো তো সবই হারালো।" একটি লাটিন প্রবচনও আছে যার বক্তব্য : বুদ্ধিনাশ বিনাশেরই সূচনা।

কিন্তু যে-সমাজে এই দ্বিবিধ বিনষ্টি—সাহসের ও বুদ্ধির—ঘটেছে তার কী ভবিষ্যৎ ? এই চিত্রই আমি পশ্চিমী দুনিয়ায় দেখছি।

এর অবশ্য একটি খুবই সরল ব্যাখ্যা আছে—তবে সেই অগভীর ব্যাখ্যা নয়, যা বলে, যে, মানুষ দোষী নয়, সব দোষ তার ত্রুটিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার। যে-ব্যাখ্যার কথা আমি বলছি তা সম্পূর্ণত মানবিক। একদা ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং স্বীকৃতও হয়েছিল, যে, মানুষের উর্দ্ধে মহত্তর কোনো অস্তিত্ব নেই। মানুষই সৃষ্টির মুকুটমনি—এবং সব কিছুর মানদণ্ড। তাই মানুষের প্রয়োজন, কামনা, বাসনা এবং দুর্ব্বলতাই—বিশ্বজগতে একমাত্র বিবেচ্য।

কাজে কাজেই তা-ই একমাত্র ভালো এবং করা আবশ্যিক, যা আমাদের রোচনীয়। য়ুরোপে এই দার্শনিক মতবাদের জন্মকাল কয়েক শতাব্দী আগে। সেকালে এর ভোগবাদী আতিশয্যের স্বপক্ষে কি হিসেবে তৎপূর্ব যুগেরযু

রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের আতিশয্যের উল্লেখ করা হোত। এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ঐ জীবনদর্শন অপ্রতিহত বেগে সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ পরিপ্লাবিত করে এবং তা অখণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঔপনিবেশিক বিজয় অভিযানে, এবং আফ্রিকায় ও এশিয়ায়, ক্রীতদাস সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়। আর এসমস্তই ঘটে খৃষ্টীয় বহিরঙ্গ সম্পূর্ণত বজায় রেখে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা পরিপূর্ণ বিকাশের সমতালে। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই বিশেষ জীবনদর্শন সভ্যতা ও বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশের তুঙ্গ শীর্ষে উপনীত হয়। এবং আপনাদের দেশ ব্রিটেন, যে চিরদিন পাশ্চাত্য জগতের মর্ম্মকেন্দ্র ও ভূষণ স্বরূপ বলে' গণ্য হয়েছে, এই বিশিষ্ট সভ্যতার ভালো ও মন্দ উভয় দিকেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

১৯১৪ সালে, আমাদের ভাগ্যহত বিংশ শতকের সূচনায়, একটা প্রচণ্ড ঝড় যেন ভেঙ্গে পড়লো এই সভ্যতার উপরে—যে ঝড়ের বিরাটত্ব ও প্রবলতা সেদিন কেউ সম্যক অনুধাবন করতে পারে নি। চার বছর ধরে য়ুরোপ ধ্বংস করলো নিজেকে এবং ১৯১৭-তে একটা ফাটল দেখা দিল য়ুরোপেরই এক প্রত্যন্ত প্রদেশে—এমন ফাটল যা বিস্তৃত গহ্বর হয়ে সমস্ত বিশ্বকেই যেন তার অন্ধকার অতলে আকর্ষণ করতে লাগলো।

এই গহ্বরের কারণ কিন্তু খুব দুর্ব্বোধ্য নয়। যেসব মতবাদ দীর্ঘদিন ধরে য়ুরোপে প্রচারিত ছিল এ তারই স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু ঐ গহ্বরটার প্রকৃতি যেন কিছুটা এই মহাবিশ্বের স্বভাবধর্ম্মী—তার অতলস্পর্শী গভীরতাও যেমন, তার অকল্পনীয় বিস্তারধর্ম্মিতাও তেমনি ; এবং ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় মনুষ্য সমাজকে তার অতলে গ্রাস করার ক্ষমতার জন্যও বটে।

এরও চল্লিশ বছর আগে ডষ্টয়েভ্স্কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বলি হবে দশ কোটি মানুষ। তখন এটা একটা অবাস্তব অঙ্ক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়ান পরিসংখ্যানবিদ কুরগানভের যে-রিপোর্ট আজ বারো বছর হলো পশ্চিমী দুনিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে—ব্রিটিশ সাংবাদিক-দের আমি সে রিপোর্টটি সম্বন্ধে পরিচিত হতে বলি। কিন্তু মুস্কিল এই যে, সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে যা রোচনীয় তাই আমরা গ্রহণ করে' থাকি—অন্যটা উপেক্ষা করি। অধ্যাপক কুরগানভের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে ডষ্টয়েভ্স্কি বিশেষ ভুল করেননি—এবং ভুল যদি করে' থাকেন ত কম করে' হিসাব করার ভুল। আসলে ১৯১৭ থেকে ১৯৫৯ পর্য্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বলি হয়েছে এগারো কোটি জীবন।

মৃত্যুগহ্বর

যখন কোনো ভৌগলিক বিপর্য্যয় ঘটে তখন তখনই কিন্তু মহাদেশগুলি সমুদ্রে গড়িয়ে পড়ে না। যা প্রথমে ঘটে তা হলো ঐ মৃত্যু গহ্বরের আবির্ভাব —যে কোনো একটা অঞ্চলে। অনেকগুলি কারণের জন্য এবার এই মুখব্যাদান প্রথমতঃ ঘটে রাশিয়ায়। আর কোনো স্থানেও তা হতে পারতো। কিন্তু যে-রাশিয়াকে সবাই পশ্চাৎপদ বলে' এতদিন জেনে এসেছিল সে এবার হঠাৎ পুরো একটি শতাব্দী লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল, আর পাল্লা দিয়ে পৃথিবীর আর সব দেশকে ধরে ফেললো। এর ফলে আমাদের রাশিয়ানদের অমানুষিক সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হলো—এমন সব অভিজ্ঞতা যা পাশ্চাত্য জগৎ —এবং তদন্তর্ভুক্ত ব্রিটেন—কোনো ধারণাই করতে পারবে না, পশ্চিমী মানুষ যা ভাবতেও ভয় পাবে।

আমরা যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এসেছি তারা আজকের পাশ্চাত্য দুনিয়ার দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাই। আমরা যেন একই গ্রহের প্রতিবেশী নই, সমকালীনও নই। তবু আমরা পশ্চিমী জগতের সম্পর্কে, বিশেষ তাদের ভবিষ্যৎ কোন্ পথে, এ নিয়ে ভাবি; এবং আমাদের সত্তর বছরের পূর্ব্বেকার অতীতকে যেন সহসা পুনরুত্থিত হতে দেখি। আমরা দেখি, তখন যা ছিল, এখানেও অবিকল ঠিক তাই—একই প্রকার পরিস্থিতি -- প্রবীণরা সন্তানের মতামতকে মান্য করছে; তরুণের দল ভেসে চলেছে খেলো ও বাজে ভাবচিন্তার প্রবাহে; অধ্যাপকরা চলতি হাওয়ার বিরুদ্ধে মুখ খুলতেও নারাজ; সাংবাদিকরা সদাসর্বদা যে সব কথা অনর্গল বলে' অপব্যয় করছে তারা তার দায়িত্ব স্বীকারে পরাঙ্মুখ; বৈপ্লবিক চরমপন্থীদের প্রতি সর্ব্বত্র অঢেল সহানুভূতি; মনে যাদের প্রবল আপত্তি তারাও তা প্রকাশে হয় অনিচ্ছুক নয় অক্ষম; সমাজের আত্মরক্ষার সহজাত ক্ষমতাই যেন পঙ্গু; আধ্যাত্মিক বিপর্য্যাস এবং তা থেকে রাজনৈতিক বিক্ষোভ। এই সবের ফলশ্রুতি কী তা এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে, কিন্তু আমাদের নিদারুণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বোধ হয় অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, কী ঘটবে ও ঘটতে চলেছে।

১৯১৭-র বিশ্বজোড়া মহাবিপ্লবের পরের বৎসরগুলিতে যে-দার্শনিক স্তন্যরসে য়ুরোপের মন লালিত হয়েছে, সেই নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনীহ প্র্যাগ্‌মেটিক দর্শন এখন তার যুক্তিসিদ্ধ পরিণামে এসে পৌঁছেচে। যখন

আমাদের উর্দ্ধে উচ্চতর কোনো আধ্যাত্মিক শক্তি আর কিছু নেই, এবং যখন আমিই অর্থাৎ মানুষই সৃষ্টির মহত্তম মুকুটমণি, তখন কোথাও আজ যদি কাউকে মারা পড়তেই হয় সে যেন এই অমূল্য আমিটি না হই, আমি এবং আমার স্বজনবর্গ বাদে আর যে কেউ মরে মরুক ক্ষতি নেই।

তখনো সেই প্রলয়ঙ্কর ঝড় একদা রাশিয়া নামে খ্যাত ভূখণ্ডের উপর দিয়ে প্রবহমান যখন পশ্চিমী দেশগুলি তাড়াতাড়ি করে নিজেদের ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ থেকে গুটিয়ে নিল ;—কারণ আবার ফ্যাসান, সমৃদ্ধি ও নবতর লাভের প্রমোদ যে ফিরিয়ে আনতে হবে! লয়েড জর্জ্জ তো বলেই ফেল্লেন,—"রাশিয়ার কথা ভুলে যাও। আমাদের কর্ত্তব্য হলো দেশের লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান।"

কিন্তু ১৯১৪ সালে যখন পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির সাহায্যের দরকার হয়েছিল, তখন ঐ রাশিয়ার কাছে আবেদন করতে তাদের বাধেনি। কিন্তু যে সব রাশিয়ান জেনারেল তাঁদের রাষ্ট্রের সামর্থ্যের শেষ সীমায় গিয়েও তিন বছর ধরে পশ্চিম রণাঙ্গনে মার্ণ, সম্ ও ভার্দুন রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন ১৯১৯-এ পশ্চিমী মিত্র শক্তি তাঁদের কোন সামরিক সাহায্যও দেননি, কিম্বা কোনো মৈত্রীচুক্তির আশ্বাস দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেননি। বহু রাশিয়ান সৈন্য ফরাসী দেশের মাটির নীচে শুয়ে আছে। এবং যারা কনষ্ট্যানটিনোপ্‌ল্ গিয়েছিল তাদের কাছে রেশনের দাম আদায় করা হয়েছিল এবং দিতে অক্ষম হলে দামের পরিবর্তে তাদের অন্তর্বাস কেড়ে নেওয়া হয়েছিল! তারপর তাদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাশিয়ায় ফেরতও পাঠানো হয়েছিল, বলশেভিকদের হাতে কড়া ধোলাইএর জন্য, অথবা ব্রেজিলে পাড়ি দেবার জন্যে—সেখানে কফি আবাদে আধা ক্রীতদাসে পরিণত হবার জন্য! যে কাজ কুৎসীত তা প্রায়শঃই বড় বড় বুলির উপচার সহযোগে পরিবেশন করা হয়ে থাকে—তাদের সাধুত্ব প্রমাণের জন্যে। ১৯১৯-এ একথা খোলাখুলি কেউ বলেনি যে তোমাদের দুর্গতি তা আমাদের কী? এর ছলে বলেছে: হোক মিত্রশক্তি, তবু জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার অধিকার কায়েম রাখতে কী বলে' সাহায্য করবো!

(এই প্রসঙ্গে স্মরনীয় যে, ১৯৪৫-এ যখন লক্ষ লক্ষ সেভিয়েত নাগরিককে গুলাগ আর্চিপিলেগোতে নির্বাসনের জন্য দেশে ফেরত পাঠানো হলো তখন কিন্তু ঐ যুক্তির কিছু সুবিধাবাদী অদল বদল করা হলো। বলা হলো: আমাদের মিত্রশক্তির অধিকার অস্বীকার করে' কী করে এই লক্ষ লক্ষ

লোকের ইচ্ছাকে সম্মান করি ? —মানুষের অহমিকা কতো সহজে একটি লাগসই বুলির দৌলতে পরিতৃপ্ত হয় !)

তবে আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁদের আরো কিছু মহত্তর যুক্তিও ছিল, যেমন রাশিয়াতে যা ঘটছে তা গোটা য়ুরোপে আঠারো' ও উনিশ শতকে যা ঘটেছিল তারই পুনরাবৃত্তি, উদারনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সমাজবাদে উত্তরণের চিরকালীন পদক্ষেপ। আইডিয়ার এই সহজ ধারাবাহিকতা,—সবাই এর বেশ তারিফও করলো। এই ভাবে সমাজের মধ্যে যারা বলিষ্ঠতর ও প্রভাবশালী—এটা আবার ব্রিটেনের পক্ষে বেশী সত্য—তারা ইউ, এস, এস. আর-এ যে অভূত-পূর্ব্ব এক পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। ওদিকে আমরা তখন গুলাগ আর্চিপিলেগোর কাঁকড়ার দাঁড়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়ছি : লক্ষ লক্ষ কঠোর পরিশ্রমী চাষীকে মধ্যশীতের সাইবেরিয়ায় পাঠানো হচ্ছিল। এবং আপনাদের থেকে খুব একটা দূরে নয়, য়ুক্রেন ও ক্যুবান-এ প্রায় ষাঠ লক্ষ চাষী—তার মধ্যে শিশু নারী ও বৃদ্ধও ছিল,—হাঁ, এটা শান্তির সময়েই ঘটে—ক্ষিদেতে ফুলে ঢোল হয়ে এবং অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল। কিন্তু একটি পশ্চিমী সংবাদপত্রও এই দুর্ভিক্ষের খবর কিম্বা ছবি ছাপেনি। এমন কি আপনাদের রসিক চূড়ামণি বার্ণার্ডশ' এর অস্তিত্বই স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন : "রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ ! আমি তো সোভিয়েত সামান্ত পার হয়ে' যেমন ভালো খেয়েছিলাম, তেমন ষোড়শোপচারে আর কখনোই খাইনি।" কয়েক দশক ধরে' আপনাদের শাসকবর্গ, পার্লামেন্টের সদস্যরা, মুখপাত্রেরা, সাংবাদিকরা, লেখকেরা, চিন্তানায়করা—কেউই দেড়কোটি বন্দীর নিবাস গুলাগ আর্চিপিলেগোকে লক্ষ্যই করলেন না ! গুলাগের উপরে আমার বইএর আগে আরও ত্রিশখানা বই য়ুরোপে প্রকাশিত হয়—কিন্তু একটির দিকেও কেউ দৃষ্টিপাত করেননি।

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, একটা সীমা আছে, যা পেরোলেই ঐসব 'মহান্ প্রগতিবাদ,' 'নূতন যুগের উষা' ইত্যাদির যুক্তি ধূর্ত্ত ভণ্ডামি হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু (অস্বীকার করা যাবেনা) দেহমনের আরাম সুনিশ্চিত করার জন্যই এগুলি কাজে লাগানো হয়।

তবে, হাঁ, গত একশো বছরের ইতিহাসে একটা মহৎ ব্যাতিক্রমের দৃষ্টান্তও আছে—এবং সে হলো এ্যাডল্ফ্ হিটলারের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রাম : যখন ব্রিটেন তার প্র্যাগমেটিজ্ম বা সুবিধাবাদ ও ইউটিলিটেরিয়ানিজম্ বা

উপযোগবাদ রূপ দার্শনিক মত—যার নীতি হলো কোনো গুণ্ডাবাহিনী কোনো দেশকে কব্জা করতে পারলেই তাকে সে দেশের শাসক বলে' স্বীকৃতি দেবে—ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। নৈতিক ভূমিতে অধিরূঢ় হয়ে হিটলারের বিরুদ্ধে ব্রিটেনে যুদ্ধ করেছিল; এবং এটাই তাকে তার ইতিহাসের এক মহান্ বীরত্বের অধ্যায় রচনায় অনুপ্রাণিত করে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও নৈতিক পদবীতে আরোহন আমাদের আত্মাকে সুরক্ষিত করে; মাঝে মাঝে এও দেখা যাবে যে আমাদের অস্তিত্বও রক্ষা করে। হঠাৎ বোঝা যায় যে. আমাদের হিসাবী সুবিধাবাদের চেয়ে নৈতিক পদবী অনেক বেশী দূরদর্শী।

হিটলারের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রাম অবশ্য আরিষ্টটেলীয় অর্থে ট্র্যাজিক হয়নি। আপনাদের ত্যাগ, দুঃখবরণ ও ক্ষতিস্বীকার অসঙ্গত হয়নি, যুদ্ধের উদ্দেশ্যের বিপরীতমুখী হয়নি। আপনারা যা রক্ষা করতে চেয়েছেন তাই সাফল্যের সঙ্গে রক্ষাও করেছেন। কিন্তু ইউ. এস. এস. আর-এর মানুষদের পক্ষে এই যুদ্ধ একটি ট্র্যাজিক যুদ্ধ। আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে আমাদের সব সাধ্য ও শক্তি দিয়ে রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এবং আপনাদের বহুগুণ ক্ষতিও সহ্য করেছিলাম: কুরগানভের হিসাবে ভুল নেই, চারকোটি চল্লিশ লক্ষ জীবন দিয়ে। কিন্তু এর দ্বারা যা কিছু আমরা সব চেয়ে ঘৃণা করে এসেছি আমদের সেই হত্যাকারী জল্লাদদের ক্ষমতা, আমাদের প্রতি তাদের অত্যাচারী ও বৈনাশিক ক্ষমতার, বৃদ্ধিসাধনে বাধ্য হয়েছি। এবং এখন দেখতে পাচ্ছি আপনাদের ধ্বংসের বীজও বপন করেছি এর দ্বারা। এবং যখন সেই সব লক্ষ লক্ষ সেভিয়েত মানুষ ঐ অত্যাচারী জল্লাদদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়ে যাবার দুঃসাহস করে, কিম্বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সুরু করে, তখন আমাদের স্বাধীনতা প্রিয়' পশ্চিমী বন্ধু—রাষ্ট্রগুলি—তাদের মধ্যে আপনাদের ব্রিটিশদের ভূমিকাও গৌণ নয়—বিশ্বাসঘাতকতা করে' তাদের নিরস্ত্র ও বন্দী করে, এবং কম্যুনিষ্টদের হাতে মরবার জন্য তদ্দের সমর্পণ করে। সেই বন্দীদের তখন পাঠানো হয় উরাল পর্ব্বতের নিকটে এক শ্রম শিবিরে যেখানে তাদের খনি থেকে তুলতে হয়, ইউরেনিয়াম—যে-ইউরেনিয়াম আপনাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহারের জন্য এ্যাটমবোমায় রূপান্তরিত।

সংবাদপত্রের ষড়যন্ত্র

আপনারা সত্তর বছরের বৃদ্ধের উপরেও বন্দুকের কুঁদো ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি—সেই বৃদ্ধেরা যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আপনাদের ব্রিটিশদেরই

মিত্ররূপে লড়াই করেছিল ; এবং তাদেরই আপনারা মেরে ফেলবার জন্যে তাড়াহুড়ো করে হত্যাকারীদের হাতে তুলে দিলেন। এক ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকেই এক লক্ষ সোভিয়েত নাগরিককে জোর করে' তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয় ; এবং গোটা য়ুরোপে তাদের সংখ্যা ছিল দশলক্ষেরও বেশী। কিন্তু সব চেয়ে যা বিস্ময়কর তা হলো আপনাদের মুক্ত স্বাধীন, সৎ ও সব রকম দুর্নীতির-উর্দ্ধে-স্থিত সংবাদপত্রগুলি, আপনাদের 'টাইম্‌স্,' 'গার্ডিয়ান,' নিউ-ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' এবং আরো যে সব আছে, তারা জেনে শুনে এই পাপকর্মটি চাপা দিলো ; এবং আজ পর্য্যন্ত হয়তো কেউ মুখ খুলতেনও না যদি না অ্যামেরিকায় প্রফেসার এপষ্টাইন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও যে কীভাবে ফ্যাসিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে, তা নিয়ে অনুসন্ধান না চালাতেন। ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির এই ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত সফল হয়েছিল। আজও বহু ইংরাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে অনুষ্ঠিত এই ঘোরতর অপরাধ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু এই অপরাধ সত্য-সত্যই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং রাশিয়ানদের স্মৃতিতে বেদনার গভীর ক্ষতচিহ্ন-রূপে তা এখনো বিদ্যমান।

দু'দুবার আমরা পশ্চিম য়ুরোপের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করেছি। এবং দুবারই আপনারা আমাদের ক্রীতদাসত্বের মধ্যে নিক্ষেপ করে' আমাদের প্রতি ঋণ শোধ করেছেন। আপনাদের অভিপ্রায় বেশ স্পষ্ট। এই দ্বিতীয় বারও আপনারা চেয়েছিলেন এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব বেরিয়ে আসতে। আপনারা বিশ্রাম চেয়েছিলেন, সমৃদ্ধি চেয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য মূল্যও যে দিতেহলো। আপনাদের মহৎ সুবিধাবাদী দর্শন আবার আপনাদের পরামর্শ দিলো, চোখ বন্ধকরে' থাকো, সব কিছু দেখো না। দেশকে দেশ সাইবেরিয়ায় নির্বাসন, ক্যাটিন (Katyn)-এ নির্বাসন। ওআরস'তে নির্বাসন—এ সবের প্রতি চোখ বন্ধ করে' থাকো। আপনারা ভুলতে চেয়েছিলেন এষ্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়াকে। এবং ছয় ছয়টি যে-য়ুরোপীয় ভ্রাতৃদেশ ক্রীতদাসত্বে সদ্যসমর্পিত হলো এবং সপ্তমটি দ্বিধাখণ্ডিত হলো, সে-কথাও। এবং তারপর আপনাদের যে নুয়রেমবার্গে এমন সব বিচারকদের পাশে বসতে হবে যারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চেয়ে কোনো অংশেই কম ঘৃণ্য ও কম খুনে নয়—এও তো আপনাদের ব্রিটিশ ন্যায়বুদ্ধিকে বিচলিত করলে চলবে না ! যখনই নূতন কোনো স্বৈরতন্ত্র কোথাও, তা যতদূরেই হোক্, উদয় হলো—যেমন চীন কিম্বা লাওস—ব্রিটেন সর্ব্বাগ্রে তাকে স্বীকৃতি দেবেই। এ ব্যাপারে আর সবাইকে ধাক্কা দিয়ে

সরিয়েও তাকে প্রথম হতেই হবে।

এবং এসবের জন্যে যে প্রচণ্ড নৈতিক চিত্তবল প্রয়োজন, আপনাদের সমাজে তারও অসদ্ভাব নেই। প্রয়োজন শুধু এই যাদু মন্ত্রটি আউড়ে চলা: "নতুন যুগের প্রভাত।" আপনারা এটি মৃদুস্বরে বলেছেন, চীৎকার স্বরেও বলেছেন। আর যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন, কিম্বা বিশ্বের কাছে আপনাদের শক্তি সামর্থ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন, তখন আপনারা অতুলনীয় সাহস দেখিয়েছেন—আইসল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, স্পেনের বিরুদ্ধে, যারা আপনাদের কোনো জবাবও দিতে পারবে না।

পূর্ব্বগার্লিনে, বুডাপেষ্টে, ও প্রাগ্-এ ট্যাঙ্ক বাহিনী হাঁক দিয়ে বললে যে, "জনগণের অভিপ্রায় অনুসারেই" তারা সেখানে হাজির হয়েছে। আপনারা একটা জায়গা থেকেও আপনাদের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করে নিলেন না। দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় অজ্ঞাতসংখ্যক বন্দীকে গোপনে হত্যা করা হলো এবং এখনো হচ্ছে,—কিন্তু তবু কোনো ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকেই প্রত্যাহার করা হয়নি। প্রতিদিন সোভিয়েত রাশিয়ায় মনোরোগ চিকিৎসকরা (Psychiatrists রা) ইন্‌জেকসন দিয়ে মানুষ মারছে,—কারণ তারা নাকি সরকারের অননুমোদিত বিষয়েও চিন্তা করে, অথবা ভগবানে বিশ্বাস করে। কিন্তু তবু ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করা হয় না। কিন্তু যেখানে জনা পাঁচেক সন্ত্রাসবাদীকে—সত্যি সত্যি যারা খুনী—যখন মাদ্রিদে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো, তখনই সেখানকার ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহৃত হলো এবং এ কীর্ত্তি সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হলো! ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে সে কী ঝড়ের দামামা নির্ঘোষ ছড়িয়ে পড়লো! হাঁ, প্রতিবাদ কী করে করতে হয় তা জানা চাই। খুব রাগের সঙ্গেই তা করতে হবে—এবং ততক্ষণই যতক্ষণ তা' যুগের হাওয়ার অনুকূল, এবং প্রতিবাদের ফলে কোনো ক্ষতি ভোগ করতে হচ্ছে না। হায়, যদি আপনারা মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাদের ব্রিটিশ সন্দেহবাদ (Scepticism) কাজে লাগাতেন, যা আপনাদের স্বভাবকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ নিশ্চয়ই করেনি—এবং নিজেদের যদি পূর্ব্বযুরোপের নির্য্যাতিত জাতিগুলির স্থ-ক্ষেত্রে স্থাপন করতে পারতেন, তা হলেই নিজেদের কুৎসীত আচরণের স্বরূপটা আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পারতেন। স্পেনের প্রধান মন্ত্রী নিহত হলেন—এবং সমস্ত যুরোপ পুলকিত হলো। কিছু স্পেনীয় পুলিশ ও কেশপ্রসাধনকারী নিহত হলো—সারা যুরোপে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল: যেন এর ফলে তাদের

নিজের নিজের পুলিশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের শিকার আর হবে না, তারা বীমা সুরক্ষিত হয়ে গেল।

এখন বিমানবন্দরের দিকে গমনশীল একটি যাত্রী পরিবারও আর নিশ্চিন্ত ন'ন যে, তাঁরা কোনো এক "স্বাধীনতার" সৈনিকের—যে কোথাকার কার যেন স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে—বন্দুকের গুলির শিকার হবেন না। রাস্তায় যাঁরা চলেন তাঁরাও শেষ পর্যন্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারবেন কি না, জানেন না। সন্ত্রাসবাদীরা কিন্তু নিশ্চিত জানে যে, জনমত তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি-দেবে. তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য প্রচার করবে, এবং ধরা পড়লেও তারা স্বাচ্ছন্দ্যময় অবরোধেই থাকবে—যতদিন না আর কোনো সন্ত্রাসবাদী তাদের মুক্তি সাধন করে। সমাজটা যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে বলা চলে "সন্ত্রাসবাদী সংরক্ষণ সমিতি"। পতনের পুর্ব্বে রাশিয়াতেও সমাজের অবস্থা ঠিক একই প্রকারের ছিল। আমরাও বিনাশের ঐ পথ ধরেই গিয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে সেই গহ্বরটা দিনে দিনে আরও বিস্তৃত হয়েছে, পৃথিবীর বুক জুড়ে আরও প্রসারিত হচ্ছে, অন্যান্য মহাদেশেও ছড়িয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সর্ব্বাধিক জনবহুল দেশ সেই গহ্বরে তলিয়ে গেছে। আরও দশবারোটি দেশ ও গেছে। তেমনি গেছে অসংখ্য আত্মরক্ষায় অসমর্থ খণ্ডজাতির দল—কুর্দ-রা, উত্তর আফ্রিকীয়রা, সোমালিরা, আঙ্গোলানরা—কিন্তু ব্রিটিশরা তাঁদের স্বাধীনতার মহৎ ঐতিহ্য সত্ত্বেও এসব তুচ্ছ বিষয়ে এতটুকু উদ্বেগ প্রকাশ করেনি! আপনারা এখনো সেই আরামদায়ক চিন্তায় বিভোর—আপনাদের এই দ্বীপগুলি ঐ গহ্বরের টানে কোনোদিন দ্বিধাবিভক্ত হবে না। বিরাট কোনো বিস্ফোরণে উর্দ্ধেও উৎক্ষিপ্ত হবে না। কিন্তু, এখনই, আপনাদের পায়ের তলাতেই, ঐ গহ্বর বিস্তৃত হয়েছে। প্রতি বছর নতুন নতুন দেশ আগামী যুদ্ধের সেতুমুখ হিসেবে সবলে অধিকৃত হচ্ছে, অথচ সারা বিশ্ব দেখেও কিছুই করছে না।

এমন কি মহা সমুদ্রগুলিও অধিকৃত হচ্ছে এবং আপনাদের ব্রিটিশদের কাছে এর অর্থ ও উদ্দেশ্য, সমুদ্র কীভাবে ব্যবহৃত হবে তা খুলে' বলার দরকার নেই। এবং গোটা য়ুরোপের চেহারাই বা কি? কতগুলি পিস্‌বোর্ডে তৈরী মঞ্চসজ্জার 'সেট' যাদের কাজ হলো পরস্পরের সঙ্গে দরকষাকষি করা, কে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের অঙ্ক কমাতে পারবে যাতে আরেকটু আরামের বন্দোবস্ত করা যায়। যে-য়ুরোপে মানব সমাজকে নেতৃত্বদানের জন্য বহু শতাব্দী ধরে প্রস্তুতির সাধনা চলেছিল,

তা এখন সব শক্তি সামর্থ্য প্রভাব প্রতিপত্তি সব খুইয়েছে—শুধু দৈহিক প্রভাবই নয়, তার বৌদ্ধিক প্রভাবও। প্রাণপ্রবল সিদ্ধান্ত, বৃহৎ আন্দোলন, এসব এখন য়ুরোপের সীমানার বাইরেই সুরু হচ্ছে। কী অদ্ভুত ব্যাপার! কখন থেকে মহাশক্তিধর য়ুরোপ তার প্রতিরক্ষার জন্যে বাইরের শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করলো! একদা তো সে আপন এলাকায় ভীষণ আত্মঘাতী লড়াই চালিয়েও উপনিবেশ ইত্যাদি সংগ্রহ করতেও সক্ষম হয়েছিল। আর. একটি যুদ্ধে না হেরেও সে এতই দুর্ব্বল হয়ে গেল!

মানুষের দৃষ্টির যতোই অগোচরে থাকুক না কেন, কেজো মানুষের কাছে যতোই বিস্ময়কর লাগুক না কেন, মাঝে মাঝে এটা চোখে পড়বেই যে, অপরের ক্ষতি সাধন আর নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আছে। যারা প্র্যাগ্‌মেটিক তারা হয়তো একে সাধারণ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলঘটিতই বলবে। কিন্তু যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্ম্মনৈতিক তারা এর মধ্যে পাপ ও প্রায়শ্চিত্যের যোগ সূত্রই দেখতে পাবে। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই এটা সত্য বলে' প্রতিপন্ন হবে। আজকের প্রজন্মকে তাদের পিতৃপিতামহের অপরাধের ফলভোগ করতে হচ্ছে—যে পূর্ব্বপুরুষগণ মানুষের কান্না, দুঃখ ও সর্ব্বনাশের প্রতি তাঁদের চোখ ও কান রুদ্ধ করে রেখেছিলেন।

অগভীর বিশ্লেষণ

আপনাদের সংবাদপত্রগুলি তাদের ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত কিন্তু তবু তারা এমন সব রচনা প্রকাশ করে যার অগভীরতা ও অদূরদর্শিতা লজ্জাকর। যখন আপনাদের এক প্রধান 'লিবারাল' পত্রিকা আজকের রাশিয়ায় যে-আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ঘটছে তাকে শূকরের ওড়ার প্রয়াসের সঙ্গে তুলনা করে, তখন তাকে কী বলা সম্ভব বলুন। এটা আমাদের স্বদেশীয়দের আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি শুধু অবজ্ঞা প্রদর্শনই নয় তার চেয়েও ব্যাপক। এ হলো সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের প্রতিই নাক-উঁচু অবজ্ঞা—যে কিছুর মূলে অর্থনীতি নেই, নৈতিক মূল্যমানের উপরে যার প্রতিষ্ঠা, সেই সব কিছুর প্রতিই অবজ্ঞা। চারশো বছরের ভোগবাদী সভ্যতার কী করুণ পরিণতি!

এ যুগে চিন্তার অবনতি আরও দ্রুততর হয়েছে সাম্যবাদের ছায়ামূর্ত্তির ধোঁয়াটে আবির্ভাবের জন্য। ন্যায় ধর্মের প্রতির মানুষের স্বভাবে যে-গভীর পিপাসা বিদ্যমান সাম্যবাদেই সে পিপাসার নিবৃত্তি সাধন সম্ভব হয়েছে এই

এক মিথ্যা ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। এবং সাম্যবাদ মানুষের চিত্তে এই মোহ বিস্তার করেছে যে, তার সব কিছু থেঁতলে সমতল করে' দেওয়া ষ্টীমরোলার আসলে মহামুক্তি-প্রদায়ক আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। কার্য্যতঃ সাম্যবাদ সাধারণের মধ্যে সর্বাধিক ভণ্ডামির প্রসার ঘটিয়েছে : ফলে য়ুরোপ তার সীমান্তের গায়েই ছয় কোটি ষাট লক্ষ মানুষের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটা উপেক্ষা করতে পারলো। সাম্যবাদের একটিও নির্দ্দিষ্টও সর্ব্বগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই : যা আছে তা হলো মনোমুগ্ধকর একটি ধারণা যে তা যেমন মহৎ তেমনি সুন্দর। কাজেই যখন দুজন সাম্যবাদী পরস্পরের সহিত সাম্যবাদ বিষয়ে কথা বলে তারা প্রায়শঃই সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ নিয়েই আলোচনা করে। এবং তাই কোনো নব্যপন্থী আফ্রিকান স্বৈরনায়ক যদি নিজেকে সাম্যবাদী বলে' ঘোষণা করেন, কেউ যে তার ভুল ধরবে সে-আশঙ্কা অমূলক।

কিন্তু সমাজবাদ আসলে যুক্তির ধারই ধারে না। মূলতঃ এটি একটি ভাবাবেগ, একটি পার্থিব ধর্ম্ম বিশেষ, যদিও এর প্রাচীন প্রবক্তাদের মতামত পড়া বা অনুধাবন করা কেউ আর প্রয়োজন মনে করে না। ভাসা ভাসা উড়ো কথা দিয়ে তাঁদের লেখার বিচার হয়, শুধু তাঁদের উপসংহারটুকু তৈরী জিনিষের মতো গ্রহণ করা হয়। এক অদ্ভুত বিচারহীন আবেগ দ্বারা সাম্যবাদকে সমর্থন করা হয়ে থাকে—কিন্তু বিশ্লেষণ নৈব নৈব চ। তাই কোনো সমালোচনাই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সাম্যবাদ—বিশেষতঃ মার্কসীয় সাম্যবাদ—সব গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনাকেই 'সম্ভাব্য আলোচনার কাঠামোর বহির্ভূত" (outside the framework of possible discussion) এই আখ্যায় ভূষিত করে থাকে। আলোচনার ভিত্তি হিসেবে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সাম্যবাদী তত্ত্ব আপনাকে আগেই গ্রহণ করতে হবে। কাজেই বাকি থাকে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ, যা নিয়ে ইচ্ছা হয় তর্ক বিচার করতে পারেন!

আরেকটি গল্প কথা প্রচলিত যে, সমাজবাদ নাকি খুবই আধুনিক এক ব্যবস্থা, এবং মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের সে বিকল্প। আসলে কিন্তু ধনতন্ত্রের উদ্ভবের অনেক অনেক পূর্ব যুগেও এ ছিল।

আমার বন্ধু এ্যাকাডেমিসিয়ান ইগোর শাফারেভিচ্, সমাজবাদ নিয়ে তাঁর অতি বিস্তৃত গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, সমাজবাদী ব্যবস্থা, যে-ব্যবস্থার স্বপ্ন-রঙীন ভবিষ্যতের ছবি চোখের সামনে নাচিয়ে অনেক মনকে উদভ্রান্ত করা হচ্ছে,

তা মানব ইতিহাসের অধিকাংশ কাল জুড়েই বর্ত্তমান ছিল—পুরাতন প্রাচ্য খণ্ডে, চীনদেশে—এবং পরে আবার য়ুরোপের 'রিফর্মেশন' অধ্যায়ে তা-ই রক্তাক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় হয়েছিল। এবং সাম্যবাদী তত্ত্ব—যদিও তা অনেক দেরীতে উদ্ভূত হয়েছে, তবু তার বয়স তিনি দেখিয়েছেন প্রায় দু' হাজার বছর। এবং তাও তার উদ্ভব হঠাৎ কোনও প্রগতিশীল চিন্তা ধারার উদ্‌বিদারণ ঘটিত নয়—যেমনটা লোকে আজকাল বিশ্বাস করে—বরং প্রতিক্রিয়া জনিত—অ্যাথেনিয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্লেটোর প্রতিক্রিয়া, সফিস্‌ট্‌-দের বিরুদ্ধে খৃষ্টানধর্মীদের প্রতিক্রিয়া—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গতিময় জগতের বিরুদ্ধে শুষ্কস্রোত, নৈর্বক্তিক প্রাচীন জীবনচর্যার প্রতিক্রিয়া। এবং যদি আমরা য়ুরোপ মহাদেশেই প্রচারিত সাম্যতত্ত্ব ও "ইউটোপিয়া"গুলির বিস্ফোরক ক্রমপর্য্যায় অনুসরণ করি,—টমাস মোর, কাম্‌পানেল্লা, উইষ্ট্যান্‌লি, মোরেলি, দেশাম্প্‌, বাব্যিয়ুফ, ফুরিয়ে, মার্কস এবং আরো বহুসংখ্যকের দ্বারা প্রচারিত—তা হলেও এঁদের কীর্ত্তিত কোনো কোনো সাম্যবাদী বৈশিষ্ট্য আমাদের রক্ত শীতল করে' দেবে। তাই আজ সময় এসেছে, প্রকৃতিস্থ সাম্যবাদীদের ডেকে বলতে হবে, তোমরা ধীর মস্তিষ্কে এবং মুক্ত মন নিয়ে—শুধু দশ বারোটি মুখ্য সাম্যবাদ প্রবক্তাদের প্রধান লেখাগুলি পড়ো, বিচার করো, এবং নিজেদের প্রশ্ন করো: এ্‌দের এই সামাজিক আদর্শ সত্যিই কি এমন কিছু যার জন্যে তাঁরা নিজেদের ও আরও অসংখ্য মানুষের জীবন উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন?

সুরুতে সমাজতন্ত্র সব মানুষকে ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে সমান করে দেয় (এটাতে-যে বলপ্রয়োগ দরকার হয় তা সব ছাপের সমাজবাদীরাই স্বীকার করে থাকেন)। বস্তুতঃ যুক্তিসিদ্ধ ধাপে "আদর্শ" সাম্যের দিকে অগ্রসর হতে গেলেই জবরদস্তি প্রয়োজন হবেই। আরও চিন্তনীয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মৌল উপাদানগুলি—সেই সব উপাদান যা শিক্ষা, যোগ্যতা, মনীষা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অশেষ বৈচিত্র্যে প্রতিফলিত হয়—সেগুলি সবই সমভূমি হয়ে যাবে। ইংরেজদের একটি কথা আছে: 'আমার গৃহ আমার দুর্গ'—এ কিন্তু সাম্যবাদের পথে মস্ত প্রতিবন্ধক।

তারপর দেখুন, ঐ যে সোশ্যাল ডেমক্রেসি বা সমাজবাদী গণতন্ত্রের গাল-ভরা ফরমুলাটি—সেও কিন্তু সোনার পাথরবাটির মতোই অর্থবহ। কারণ সমাজবাদ রূপ ড্র্যাগনই গণতন্ত্রকে গ্রাস করতে আজ উদ্যত। বিশ্বের সর্বত্র,

যেমন যেমন গণতন্ত্রগুলি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে,—এবং যে-হুট মহাদেশে পিছু হঠছে—সমান তালে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন সেখানে বিস্তৃত হচ্ছে।

আপনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বেগার প্রথা (forced labour") সব সমাজবাদী প্রবক্তাদেরই কার্য্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত—এমন কি "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর" প্রবক্তাও বাদ যান না। এবং একথা মনে করারও কোনো সঙ্গত যুক্তি নেই যে "গুলাগ আর্চিপিলেগো" হলো একটি মহৎ আদর্শের এশীয়াবাসীদের হাতে, বিকৃতি মাত্র। এটা এই ব্যবস্থারই অমোঘ পরিণাম।

আধুনিক সমাজ সমাজতন্ত্রের নামে মন্ত্রমুগ্ধ। এর মোহে তারা দেখতে পাচ্ছে না কী প্রাণঘাতী ভয়ঙ্কর বিপদ তাদের গ্রাস করতে চলেছে। এবং সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে, আপনারা আপনাদের বিপদ সম্বন্ধে চেতনাই হারিয়ে ফেলেছেন—কোন্ দিক থেকে তা আসছে তা বুঝতেও পারছে না, যদিও তা অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সাবধান বাণীতে আপনারা কান দেন নি। হয়তো এটাই সত্য যে, একজনের অভিজ্ঞতা আরেকজনের কাজে আসে না: প্রত্যেককেই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হয়।

অবশ্য এটা শুধু ব্রিটেনের একলার প্রশ্ন নয়—এটা পূর্ব্ব ও পশ্চিম সকলেরই আমাদের উদ্বেগের বিষয়। স্বার্থক্ষেত্রে কিছু প্রভেদ থাকলেও আমরা সকলেই এক সাধারণ অদৃষ্টের জালে আবদ্ধ—একই লৌহ বেষ্টনীতে বাঁধা। আমরা সকলেই এক ঐতিহাসিক মহাধ্বংস লীলার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি, এক প্রলয়ঙ্করী বন্যা যা সব সভ্যতার লেখাটুকু মুছে ফেলতে ও যুগান্তর আনয়নে উদ্যত। বর্ত্তমান বিশ্বপরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে এই কারণে যে, ইতিহাসের ঘড়িতে একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রহর বাজতে সুরু করেছে। আমাদের সকলকেই আজ যে-মহাসঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে তা শুধু সামাজিক নয়, শুধু রাজনৈতিক নয়, কেবলমাত্র সামরিকও নয়। এবং শুধু যে আমাদের মোকাবিলাই করতে হবে তাই নয়, আমাদের সকলকেই এই ক্রান্তিলগ্নে দৃঢ় পদে দাঁড়াতে হবে—যে ক্রান্তি মধ্যযুগ থেকে রেনেসাঁয় উত্তরণেরই হয়তো সমপর্য্যায়ের। ঠিক যে-ভাবে শেষ মধ্যযুগে মানুষ তাদের ভ্রান্ত ও নিদারুণ বিপথগামিতা (deviation) সম্বন্ধে সহসা সচেতন হয় এবং সভয়ে পেছিয়ে আসে, ঠিক সেই ভাবেই আমাদেরও Enlightenment যুগের শেষ অধ্যায়ের এই মারাত্মক বিপথ-গামিতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। যা কিছু রমণীয়, যা কিছু সুখদায়ক, যা

কিছু বস্তুময় তারই দাসসুলভ পূজায় আমরা আপাদমস্তক জড়িত হয়ে পড়েছি।

আপনারা ভাবছেন, বিপদ বুঝি কেবল পৃথিবীর আরেক প্রান্তেই—এবং তা'র দিকে আপনাদের ক্ষয়িত তূণ থেকে শর নিক্ষেপও করছেন। কিন্তু সব চেয়ে বড় যে বিপদ তা হলো, আপনারা আত্মরক্ষার সঙ্কল্পই হারিয়ে ফেলেছেন।

আত্মপ্রতারণা

এবং গ্রেটব্রিটেন, যাকে আমরা পাশ্চাত্য জগতের মর্ম্মস্থল বলে এসেছি—সেই ব্রিটেনেই অন্য দেশ অপেক্ষা এই শক্তি ও সঙ্কল্পের ক্রমদুর্ব্বলতা সর্ব্বাধিক পরিস্ফুট। গত কুড়ি বছর ধরে আমাদের এই গ্রহে তার কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়নি। তার চারিত্রশক্তি বিনষ্ট হয়েছে, তার যৌবন দীপ্তি আর নেই। আধুনিক বিশ্বে ব্রিটেনের গুরুত্ব বলতে গেলে, রোমানিয়া কিম্বা উগাণ্ডার চেয়েও কম। ব্রিটিশদের যে সহজবুদ্ধি—এত স্বচ্ছ ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত—এখন তাও কি দেউলে হয়ে গেল? সমসাময়িক ব্রিটেন আত্মপ্রতারণা ও মোহের মধ্যে বাস করছে—রাজনীতির ক্ষেত্রেও যেমন ভাবজগতের ক্ষেত্রেও তেমনি। তাঁরা চারদিকে ভঙ্গুর প্রাচীর খাড়া করে ভাবছেন, আর বিপদ নেই; এবং বিপদের অমোঘ অগ্রগতিকে স্থিতিশীল বিশ্বের ভূমিকা রচনা মনে করছেন।

আমরা রাশিয়ার নির্যাতিত জনগণ, পূর্ব্ব য়ুরোপের নির্যাতিত জনগণ, গভীর হতাশার সঙ্গে য়ুরোপের এই মর্ম্মন্তুদ (tragic) দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করছি। আমরা আমাদের বেদনা যন্ত্রনার অভিজ্ঞতা আপনাদের দিচ্ছি। আপনারা সেই অতি ভয়ঙ্কর দাসত্ব ও মৃত্যুর মূল্য না দিয়ে তা গ্রহণ করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

আমরা মানব সমাজ কি এই দুর্ব্বহ বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারবো এবং মানবাত্মার অবারণ চলার গতিপথ মুক্ত করে দিতে পারবো—যে আত্মার মহৎ ঐশ্বরিক অধিকারই মানুষকে পশুজগৎ থেকে স্বতন্ত্র চিহ্নিত করেছে?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পপ্রত্যয়

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

॥ এক ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে ও সাহিত্যে একটি বিপ্লবী অঙ্গীকারের বাণীবাহক। শুধু বাণীবাহক নন, সেই অঙ্গীকার চরিতার্থ করার পথ নির্দেশক। মানিকের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হবার আগেই তাঁর প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল। হাতে কলম ধরার আগেই মনের ক্ষেত্র তৈরী হয়ে গিয়েছে। আবির্ভাব-লগ্নেই পরিপক্ক জীবন-বোধের ঋকৃপ নিয়ে মানিক বাংলা সাহিত্যে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন। রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান-শুদ্ধ বাস্তব জীবনবোধের সোচ্চার ঘোষণায় প্রথমাবধি তিনি মুক্তকণ্ঠ। নির্মোহ নির্মম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং নিরাসক্ত নিরঞ্জন বাস্তব দৃষ্টির কথাকোবিদ্ হিসেবে সমকালে বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিঃসঙ্গ অবস্থিতি। কল্লোলীয়দের ছদ্ম রোম্যান্টিকতাও তাঁর নেই, আর শৌখিন বাস্তববাদীদের অভিজ্ঞতাবর্জিত 'কৃত্রিম পণ্যে'র পসরাও ব্যর্থ করেনি তাঁর বিপ্লবী অঙ্গীকারকে। এক হাতে অস্ত্র, আরেক হাতে বাঁশরী নিয়ে নামেননি তিনি সাহিত্য-রণাঙ্গনে। প্রথম থেকেই তিনি অস্ত্রধারী। সে অস্ত্র কোপ মেরে গলা কাটেনা, চিড়ে চিড়ে দেখায়। শল্যবিদের ব্যবচ্ছেদের মতোই তীক্ষ্ণ এবং অনুপুঙ্খ সে বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণী দৃঢ়তারই আরেক নাম বিপ্লবী করণ-কৌশল। 'এ কৃতিত্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। কথাশিল্পে তিনি মিতভাষী অনুচ্চকণ্ঠ; কিন্তু শিল্পবিশ্বাসে অস্ত্রধারী সৈনিক। এই সম্পদ-ঋদ্ধ মানসিকতার বলেই তিনি অবলীলায় ফ্রয়েড এবং মার্কসের দুই বিপরীত কোটিতে অবস্থান করেও দ্বিধাবিভক্ত নন। ফ্রয়েডের মনোবীক্ষণের তীক্ষ্ণতা এবং মার্কসের সমাজ-বিশ্লেষণের তথ্যনিষ্ঠ যুক্তি নির্ভরতার প্রাণরসটুকু নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে এক দুঃসাধ্য সমীকরণ সাধন করলেন। একদিকে ফ্রয়েডের অবদমন, অদস্ (Id) অহং (Ego), অধিশাস্তা (Superego), অন্যদিকে মার্কসের নৈয়ায়িক বস্তুবাদ এবং শ্রেণীসংগ্রামসম্ভূত যৌথ চেতনা—দুই

পরস্পর-বিরোধী মতাদর্শের মধ্যে সমীকরণ করলেন। কথাটা অবিশ্বাস্য ঠেকলেও মানিকের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত সত্য। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে কোনো দোটানায় পড়তে হয়নি। তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠ মনই তাঁকে নির্ভুল লক্ষ্যের পথে হাত ধরে নিয়ে গেছে।

॥ দুই ॥

আগের মন্তব্যটির সূত্র ধরেই বলি, মানিকের এই সমন্বয়-ক্ষমতার মর্মার্থ অনুধাবন করতে না পারলে, তার সম্বন্ধে বিচার বিভ্রাট ঘটতে পারে। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত দু'একজন সমালোচক এই বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তাঁরা মানিক-সাহিত্যকে দু'টি জল-অচল-কক্ষে (water-tight compartment) বিভক্ত করে দেখিয়েছেন যে, তিনি সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে ফ্রয়েড্-পূজারী, দ্বিতীয় পর্বে মার্কস-অনুরাগী। এই দু'টি পর্ব পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সেই জন্যেই দ্বিতীয় পর্বে তাঁর 'দ্বিতীয় জন্ম' হয়েছিল বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ধারণায় মানিকের সাহিত্য ভাবনায় দুটি ধারাই অবিচ্ছিন্ন। ফ্রয়েড বলেন, অবদমিত কাম বক্রতার জনক। কিন্তু মানিক বিশ্বাস করেন কামশক্তিকে (libido) সৃষ্টিশক্তির সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে ঊর্ধ্বায়িত (sublimated) করা যায়। কামশক্তির সাহজিক দাবি স্বীকৃত হলে তা সরীসৃপ পন্থায় বক্রগতি লাভ করে। এই বিশ্বাসের প্রমাণ তাঁর দুটি ছোটগল্প —'প্রাগৈতিহাসিক' এবং 'সরীসৃপ'। প্রাগৈতিহাসিক গল্পের ভিখু সেই সহজ প্রাণাবেগের প্রতিভূ। পাঁচীর প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণে স্বাভাবিকতা আছে বলেই তাতে অসুস্থতা নেই। দেহ তার অসুস্থ, পঙ্গুপ্রায়। কিন্তু মনে সে আদিম স্বাভাবিক মানবশক্তিতে বলীয়ান। কিন্তু 'সরীসৃপ' গল্পে কাম নেহাতই রিরংসা। পয়সা দিয়ে নারীদেহ শিকারের বক্রপন্থায় তাই সরীসৃপ-বৃত্তি প্রকট। এ যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অসুন্দরও। মানিকের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'রা এত বল এবং সাহস পেল কোথা থেকে? সঙ্ঘশক্তি এবং পারস্পরিক সহানুভূতি-নির্ভর যৌথ চেতনাই তাদের এ শক্তি দিয়েছে। মানিকের প্রথম যুগের গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক,' কিন্তু দ্বিতীয় যুগের গল্প 'সরীসৃপ' এবং 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'। কিন্তু দুই পর্বেই তো ফ্রয়েড-মার্কসের সহাবস্থান লক্ষ করা যাচ্ছে। কথা হচ্ছে এই, মানিক নেতি নেতি করে ইতিতে পৌঁছেছেন। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে অবদমন থেকে যৌথ জীবনে

উন্নয়নের দিকে এগিয়েছেন। অবদমন-জনিত বিকৃতি তাঁর সাহিত্যে এই জন্যেই দেখানো হয়েছে যে, স্বাভাবিকতার পথে বিকৃতি বর্জনীয়, কিন্তু প্রকৃতি (natural) গ্রহণীয়। প্রকৃতি-সম্মত কামশক্তি সুস্থতার লক্ষণ, বিকৃতি-জাত কামশক্তি অসুস্থতার দ্যোতক। সেই অসুস্থতার নেতিবাচক প্রভাবের প্রতি বক্রকটাক্ষে 'সরীসৃপ' গল্প ইঙ্গিতময়। সুস্থতার সহজ স্বীকৃতিতে প্রাগৈতিহাসিক গল্প তাৎপর্য মণ্ডিত। কিন্তু কামশক্তির স্বাভাবিকতার স্বীকৃতি শেষ কথা নয়—এ হচ্ছে জীবন-ব্যাপারের প্রাথমিক প্রয়োজনমাত্র। একে স্বীকার করে নিয়েও অতিক্রম করে যাওয়াতেই মানবশক্তির মহিমা। সেই মহিমাময় জীবনের সৃষ্টি যজ্ঞে উত্তরণই মানিকের অন্তিম অন্বিষ্ট। কাজেই তাঁর সাহিত্যে বিবর্তন আছে, বিবর্তনের পথে বিচার আছে এবং বিচারান্তে উর্ধ্বায়নের অঙ্গীকার আছে। কিন্তু ধারাটি অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর-সম্পৃক্ত। কাজেই তাঁর ক্ষেত্রে 'দ্বিতীয় জন্মে'র পরিবর্ত স্বাভাবিক জাতকের মতোই ক্রম-বিবর্তন-গত পরিণতি ঘটেছে। এই পরিণতি সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন, অবচ্ছিন্ন কক্ষাবর্তন নয়। মানিক নিজেই লিখেছেন, "মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে কেন সাহিত্য করতে নেমেছিলাম ভেবে আত্মগ্লানি বোধ করলে সেটা মার্কসবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধেই যাবে, যান্ত্রিক একপেশে বিচারে সৃষ্টি হবে আরেকটা বিভ্রান্তির ফাঁদ।"[১]

এই 'বিভ্রান্তির ফাঁদে' পড়ে মানিক-সাহিত্যবিচারে প্রমাদ ঘটিয়েছেন অনেকে। আগেই বলেছি, কেউ কেউ তাঁর সাহিত্যে দু'টি সুনির্দিষ্ট পর্ববিভাগ করে দিয়েছেন। সেই পর্বীকরণের নিরিখ হচ্ছে ফ্রয়েড-লীনতা এবং মার্কস-সংলগ্নতা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর প্রথম পর্বের লেখার চেয়ে দ্বিতীয় পর্বের লেখা শিল্পবিচারে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। এই পর্বে জীবন-বীক্ষণের চাইতে বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। আবার দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত উপন্যাস 'চতুষ্কোণ' সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছেন, "...his more recent work reads like little mannuals of sex-psychology or the case-histories of maniacs"[২]

---

১. সাহিত্য করার আগে—লেখকের কথা," নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭; পৃঃ ১৬।

২. বুদ্ধদেব বসু—An Acre of Green Grass, Orient Longmans, 1948, Page. 87.

সুতরাং কৃত্রিম পর্ব-বিভাজনের পথে না গিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারানুসারী ক্রমবিকাশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করাই বোধ হয় মানিক-বিচারের স্বয়ং মানিক-অনুমোদিত প্রকরণ।

॥ তিন ॥

আমাদের মানিক-বিচারের মূল সূত্রটি নির্দেশ করলাম। এবং মানিকের কয়েকটি উপন্যাস পর্যালোচনা করে পূর্বকথিত সমীকরণ এবং বিবর্তনের স্বরূপটি দেখাবার চেষ্টা করব। আগেই তিনটি গল্পের উল্লেখ করেছি। এখন কয়েকটি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যাক। উপন্যাসগুলি বহুপঠিত—'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) 'পুতুলনাচের ইতিকথা ; (১৯৩৬,) 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) ; অহিংসা' (১৯৪১) 'চতুষ্কোণ (১৯৪৮) আরোগ্য (১৩৬০) 'তেইশ বছর আগে পরে' (১৯৫৩)। মানিকের তথাকথিত দুই পর্বের উপন্যাসই এখানে আছে। কিন্তু প্রথম পর্বের উপন্যাসেই পরবর্তী পর্বের বৈশিষ্ট্যের বিদ্যুদাভাস স্পষ্টলক্ষ্য।

'দিবারাত্রির কাব্য' নামটি কিন্তু খুবই বিভ্রান্তিকর। এই নামের ফাঁদে পড়ে বুদ্ধদেব বসু বলেই ফেলেছেন, "'দিবারাত্রির কাব্য' শুধু নামত কাব্য নয়, সারত তাকে একটি দীর্ঘ গদ্যকবিতা বললে অত্যুক্তি হয়না। এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে কম 'পাকা লেখা,' সব চেয়ে কম স্পষ্ট...''[৩]

এই বিভ্রান্তির কোনো হেতু ছিলনা। পূর্বাপর সম্পর্কহীন সাহিত্যবিচারে এরকম প্রমাদ হওয়া স্বাভাবিক। আগেই বলেছি, কলম ধরার আগে মানিক প্রস্তুতি-পর্ব তথা সাধনা শেষ করে নিয়েছেন। কলম ধরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাকা লিখিয়ে। 'দিবারাত্রির কাব্য' তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস।[৪] ভাষা এবং অধ্যায়বিভাগে সংকেতগূঢ় তির্যক ভঙ্গি আছে বলেই একে গদ্যের আকারে একটা লম্বা কবিতা বলা ঠিক নয়। তবে এটা ঠিক, এ-রকম কাব্যব্যঞ্জনাপূর্ণ উপন্যাস পরে তিনি আর লেখেননি। উপন্যাসের তিনটি ভাগ—'দিনের কবিতা,' 'রাতের কবিতা' এবং 'দিবারাত্রির কাব্য'। এরও আগে সজনীকান্ত

৩. বুদ্ধদেব বসু—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—মানিক-বিচিত্রা, সাহিত্যম্ (১৯৭১) ; পৃ ১১৫।

৪. প্রথম উপন্যাস 'জননী' (১৯৩৫)।

দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রিকায় এর প্রথম প্রকাশ ঘটে। শুরু করেছিলেন 'একটি দিন'[৫] নামে একটি ছোটগল্পের আকারে। সজনীকান্তের তাড়াতেই এটি উপন্যাসের রূপ পায়। সজনীকান্ত 'আত্মস্মৃতি' (২য় খণ্ড)তে লিখেছেন—"অনতিবিলম্বে মানিক 'একটি দিনে'র উপসংহার 'একটি সন্ধ্যা' লইয়া উপস্থিত হইলেন। 'একটি সন্ধ্যা'তেও শেষ হইলনা, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা 'রাত্রি'তে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে 'রাত্রি' 'দিবারা'ত্রর কাব্য' হইল।"

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসও তো 'সবুজপত্র' কাগজে চারটি গল্পের আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'চতুরঙ্গে'র সংহত বাক্‌প্রতিমা একটি বহু আলোচিত বিষয়। অথচ এটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃঢ়পিনদ্ধ সংকেতগূঢ় উপন্যাস। মানিক সংকেত ব্যবহারে এবং অধ্যায়ের নামকরণে একটু তির্যক ভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন বলেই এটি উপন্যাস হবেনা কেন? বরং আমরা মনে করি, মাণিক-উপন্যাস-মালায় এটি একটি অসাধারণ সৃষ্টি। এটি নামত কাব্য, কিন্তু সারত একটি তীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণ-ধর্মী সংকেত-সংহত উপন্যাস এবং যথার্থ অর্থেই উপন্যাস। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ এ-রকম উপন্যাসকেই 'আধুনিক উপন্যাস' (Modern Fiction) বলেছেন। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির কেউই সুখী নয়। দাম্পত্য জীবনেও সুখী নয়। এমনকি অনাথ মালতীর ভালোবাসার টানে গড়ে তোলা 'দাম্পত্য'তেও সুখ নেই। তার কারণ এই নয় যে, সামাজিক নিয়মে তারা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ নয়। তারা জীবনকে দুঃখের কষ্টিপাথরে যাচাই না করে ভালোবাসার নীড় গড়েছিল। মোহ ছিল এর ভিত্তি, যৌবনের আবেগ ছিল এর প্রেরণা। ভাঙতে দেরী হয়নি।

আজ তারা পুরীতে আশ্রম করে এক অস্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। মালতী নিয়েছে গুরুর ভূমিকা। দিনের বেলা ভক্তদের প্রসাদ এবং কৃপা বিতরণ করে নিদ্রাহীন নিশিযাপনের যন্ত্রণা ভোলে সুরাপান করে। অনাথ ধ্যানে 'ভটস্থ' থাকে। আর এরই মধ্যে পড়ে তাদের কন্যা আনন্দ এক অস্বাভাবিক জীবন-বোধে আবাল্য পরিবর্ধিত। সেই অস্বাভাবিক বোধেরই পরিণতি পরীনৃত্যরত আনন্দের যজ্ঞানলে আত্মাহুতিদান। হেরম্বের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী প্রেমের স্বাদ চিরস্থায়ী অতৃপ্তির দহনে দগ্ধ করে তাকে মেরে

৫. 'বঙ্গশ্রী' (বৈশাখ, ১৩৪১) সংখ্যায় 'একটি দিন' প্রকাশিত হয়।

ফেললো। এই হেরম্বও তো সুখী নয়। উপন্যাসের শুরুতেই জানা গেল, হেরম্বের স্ত্রী আত্মঘাতিনী হয়েছে। অথচ যে কারণে এই আত্মঘাত, হেরম্বের অন্য প্রেমিকা সেই সুপ্রিয়া যখন তাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করতে চায়, তখন হেরম্বের দ্বিধার শেষ নেই। হেরম্ব প্রেমের হাওয়ায় ভাসতে চায়, গভীরে ডুব দেবার সাধনায় তার অনাগ্রহ। কতকগুলি অসুখী উৎকেন্দ্রিক নর-নারী শুধু নিষ্ফল হাত-পা ছুঁড়ছে। এরা অসম্পূর্ণ, তাই অসুখী। মানিকের নিজের ভাষায় এরা 'মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশ।' এই টুকরো বা ভগ্ন মানুষের দুঃখদীর্ণ জীবনচিত্র অঙ্কন করে মানিক দুঃখের কারণটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন। দায়িত্বহীন সম্পর্কে সুখ নেই, বিচ্ছিন্ন আত্মসুখ প্রবঞ্চনারই নামান্তর। নরনারীর সম্পর্কের স্থায়িত্ব যৌনজীবনভিত্তিক নয়, যৌথজীবনের পারস্পরিক সমঝোতার মধ্যে। মানিকের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে এ বক্তব্য স্পষ্টভাষণে উচ্চারিত, প্রথম পর্বে অনভিলক্ষ্য অথচ গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের শেষে পরম বেদনায় হেরম্বের এই অনুভব মানিকেরই বাস্তবনিষ্ঠ অথচ উপলব্ধি-ভূয়িষ্ঠ জীবনবিশ্বাসের স্বীকৃতি—'.....আকাশে আশ্রয় নেই, খাদ্য নেই, পানীয় নেই।' লক্ষ্যহীন-জীবন এবং বল্গাহীন যৌনসম্পর্ক বিকারেরই নামান্তর। এই নিতান্ত রূঢ় কথাটাই মানিক রূপকের নমনীয় আধারে পরিবেশন করেছেন। বক্তব্য খুব সোজা, একেবারে গদ্যময়। কিন্তু মুস্কিল, বিভ্রান্ত মানুষ সোজা কথাকে ঘুরিয়ে না বললে সাহিত্যরস পায়না, আর ঘুরিয়ে বললে দোষারোপ করে। এরপর আর তিনি ঘুরিয়ে বলার বিপজ্জনক পদ্ধতিতে না গিয়ে সরাসরি পথ ধরলেন। সে পথও ক্ষুরধারনিশিত। বিশ্লেষণের রুক্ষ ধূসর প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়াতে বিপদ আছে বৈকি। ভাষণে উচ্ছ্বাস নেই, ব্যাখ্যানে অলংকরণ নেই; অথচ বিশ্লেষণের দুরূহ প্রাচীর ডিঙিয়ে লেখক পাঠকদের অন্তরে ঠাঁই করে নিলেন। সেই সরাসরি পন্থার প্রথম সার্থক স্তম্ভ 'পুতুলনাচের ইতিকথা।' দ্বিতীয় স্তম্ভ 'পদ্মানদীর মাঝি'। জনপ্রিয়তার বিচারে এ দুটি আজও শীর্ষস্থানে। তবে জনপ্রিয়তাই উপন্যাস দু'টির সার্থকতার নিরিখ নয়। বিশ্লেষণী যাথার্থ্য এবং সংশ্লেষণী শিল্পদৃষ্টির রসায়নেই এগুলি জীবন্ত, পদ্মানদীর মাঝিদের মতোই প্রাণবন্ত অথচ ভূমি-সংলগ্ন। এরা আকাশে নীড় বাঁধেনা, আকাশ থেকে স্বপ্ন এনে মাটিতে জীবনের বীজহিসেবে বপন করে।

'পদ্মানদীর মাঝি'র হুসেন মিঞা সেই স্বপ্নবীজের অঙ্কুরকারক, আর 'পুতুল

নাচের ইতিকথা'র শশী ডাক্তার ভূমিসংলগ্ন স্বপ্নবীজের আবহাওয়াবিদ্। মানিকের বাস্তবতাবোধ যে স্বপ্নবঞ্চিত জড়বাদ নয়, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হুসেন মিঞা এবং শশী ডাক্তার। এরা বিপ্লবের সৈনিক। মনে চলেছে ভাঙাগড়ার উথাল-পাথাল। সেই বিপ্লব-মন্থনজাত সুধাপান করে শশী নীলকণ্ঠ আর হুসেন মিঞা উন্নতশির। এরা পুতুলনাচের নিষ্ক্রিয় পুতুল নয়, জীবননৃত্যের সক্রিয় কুশীলব।

অথচ 'পদ্মানদীর মাঝি'র কুবের-কপিলার সম্পর্ক প্রাগৈতিহাসিক গল্পের সহজ প্রাণাবেগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শশীর পিতা গোপালদাসের সঙ্গে কবিরাজ-পত্নী সেনদিদির সম্পর্কে সরীসৃপ গল্পের বক্রতা। শশীর অন্তরেও গূঢ় কামনা ছিল। কিন্তু তা বক্রপন্থায় আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেলনা শশীর আত্মবিশ্লেষণ শক্তির সহিত প্রতিরোধের জন্যেই—এতো অবদমন (repression) নয়, আত্মশাসন। অবদমন পরনির্দিষ্ট, আত্মদমন স্বেচ্ছাবৃত। সেই স্বেচ্ছাবৃত প্রশমন-শক্তিতে বলিষ্ঠ বলেই শশীর গূঢ়চারী বাসনা ক্ষণস্থায়ী হল, তাকে আক্রমণ করেও পরাভব শিকার করে ফিরে গেল। কিন্তু শশীর পিতা অস্বাভাবিক পন্থায় সেই গূঢ়বাসনা চরিতার্থ করতে প্রয়াসী বলেই মানসিক শক্তিতে দুর্বল। এমন প্রতিপত্তিশালী মানুষ অন্তরে কী অসহায়! সুন্দরী সেনদিদির অসুখে শশী যখন চিকিৎসা-রত তখন পিতার পুত্রকে পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। বসন্তরোগ যখন সেনদিদির পূর্বশ্রী নষ্ট করে দিল, তখন গোপালদাসের কী অপরিসীম কূট স্বস্তিবোধ! গোপালদাসের মতো সরীসৃপেরাই তো জীবনকে অস্বাভাবিক করে তুলে পরিবারকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। অর্থলালসা এবং বিরংসার মিলিত তা গদে এরা সহজ পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্ পর্যন্ত নড়িয়ে দেয়। অর্থলোভে তাই মেয়ে বিন্দুকে কলকাতার ধনীর গৃহে পাত্রস্থ করলো। কিন্তু বিন্দু পেলনা ঘরণীর মর্যাদা, সে হয়ে রইলো রাক্ষিতার মতন। এভাবে থেকে মদ্যপানে তার এমন আসক্তি জন্মালো যে, গ্রামের পিতৃগৃহে অগ্রজ শশী ডাক্তারের সুরামিশ্রিত ওষুধ গোপনে সংগ্রহ করতেও তার দ্বিধা নেই। স্বামী যখন গৃহে ফিরিয়ে নিতে চায়, তখন আর সে ঘরণীর সম্মান চায়না; এই অস্বাভাবিক জীবনেই সে এখন অভ্যস্ত। এই একটি জীবনের প্রেক্ষাপটে সমস্ত যুগ প্রকটিত। অর্থ এবং দেহসম্ভোগ—ধনতান্ত্রিক সমাজের এই দুই দৈত্য মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে—মানিকের প্রথম পর্বের উপন্যাসেই তার নির্মম বিশ্লেষণ।

'অহিংসা' উপন্যাসে দেখি, আগের কালের মূল্যবোধগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে। স্বার্থবুদ্ধি, অর্থলালসা এবং এমন কি দেহক্ষুধা ধর্মের ছদ্মাবরণে চরিতার্থ হতে চেয়েছে। বিপিন সদানন্দের সাহায্যে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার ফন্দীও কারবারে নেমেছে। বলা বাহুল্য, এখানে ঈশ্বর লাভের সাধনা হচ্ছে না, ঈশ্বর-নিধনের চক্রান্ত হচ্ছে। আশ্রম-গুরু সদানন্দ শেষে তারই শিষ্যের পুত্রবধূকে নিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় নিল। বলা বাহুল্য, এর আগে সম্ভবতঃ তারই নির্দেশে দাঙ্গায় শিষ্যপুত্র বিভূতির প্রাণান্ত ঘটে। কিন্তু এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মহেশ চৌধুরীর চোখে বিকারের কারণ ধরা পড়েছে। সে বলেছে, সবাই রোগী, যারা রোগ সারানোর ভার নিয়েছে, তারাও রোগগ্রস্ত। এ রোগ যে যুগব্যাধি।

এ যুগব্যাধিতে ভুগছে 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের নায়ক রাজকুমার। তার আছে এক বিকৃত কৌতূহল। নগ্ননারীর দেহসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করার এক অস্বাভাবিক বাসনা। তার বিদ্যা এবং প্রতিপত্তি আছে। একাধিক নারী তাকে চায়। সে কিন্তু নিঃসঙ্গ নিঃসম্পর্ক এক মোহের জগতে বাস করে' নিজেও মোহাচ্ছন্ন এবং তার আকর্ষণে ধরা-দেওয়া নারীগুলিকেও মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। এতগুলি মেয়েকে সে মোহপাশে বদ্ধ করে রেখেছে, কাউকে সে হৃদয় দিয়ে ভালেবাসেনা। অবশেষে সে বুঝতে পারে—প্রেম শুধু খেলা নয়, এর চেয়েও বেশি কিছু।

'আরোগ্য' এবং 'তেইশ বছর আগে পরে' উপন্যাস দু'টিতে মানিক যুগব্যাধি থেকে মুক্তির রাস্তার নিশানা দিয়েছেন। বলাবাহুল্য এখানেও ফ্রয়েড এবং মার্কসের সহাবস্থান। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে ফ্রয়েডকে ছুঁয়ে মার্কসে উত্তরণ। অবদমন থেকে আত্মোন্নয়ন, ব্যষ্টিচেতনা থেকে সামূহিক কল্যাণস্পৃহায় উর্ধায়ণ।

'আরোগ্য' উপন্যাসের নায়ক কেশব চোরাকারবারী অনিমেষের মোটর ড্রাইভার। অনিমেষের কন্যা ললনার প্রতি গূঢ় আকর্ষণে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষে চিকিৎসক তাকে বলেন যে, জীবনে সামঞ্জস্যের অভাবেই তার এই হিস্টিরিয়া রোগ। কেশবও শেষে স্বীকার করে চারদিকের বাতাসেই রয়েছে ব্যাধির বীজাণু। পরিবেশ বিষাক্ত। এই পরিবেশ পাল্টাবার লড়াইয়ে যোগ দিতে পারলে তার ব্যাধিও নির্মূল হবে।

'তেইশ বছর আগে পরে'র নায়ক জগদীশের বেলাতেও তাই ঘটেছে।

জমিদারপুত্র জগদীশ আজ নেশাগ্রস্ত, অপ্রকৃতিস্থ। ২৩ বছর আগে তার রূপ-লুব্ধ দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল চিত্রার যৌবনপুষ্ট দেহ। কিন্তু চিত্রা মোহ চায়না, প্রেম চায়। রাঁচির হুড্রু প্রপাতের ধারে হঠাৎ জগদীশকে দেখে ভয়ে পিছোতে গিয়ে চিত্রা প্রপাতের তলে হারিয়ে যায়। এরপর তেইশ বছর পরে দেখা যায়, এই প্রপাতের কাছেই তার আত্মদহনের পালা চলছে। কিন্তু শেষটায় জগদীশ বুঝতে পারে এভাবে ব্যাধি সারবে না। নেশা ছেড়ে দেওয়াতে সে 'ডেলিরিয়াম ট্রেমনেসে' আক্রান্ত হয়। তারপর হাসপাতালে যায় চিকিৎসা করাতে। পরে সুস্থ হয়ে শহরের কাছে 'মানসিক হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা করে অসংখ্য রোগীর রোগ নিরাময়ের অঙ্গীকার নেয়। ব্যক্তিগত ভুলের অপরাধ সমষ্টিগত কল্যাণ-স্পৃহার পূতাগ্নিতেই দগ্ধ হবে। এই পরিশুদ্ধ চেতনায় পৌঁছতে মানিক-কথাসাহিত্যের নরনারীদের অনেক পথ হাঁটতে হয়েছে। আর তাদের স্রষ্টাকেও কম রাস্তা অতিক্রম করতে হয়নি। 'প্রাগৈতিহাসিক' থেকে 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী'—দীর্ঘপথ পরিক্রমা। ব্যক্তিগত জীবনেও যন্ত্রণা কম নয়। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রগতিলেখক সঙ্ঘের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, অর্থাভাব এবং রোগাক্রমণ। কিন্তু সমস্ত ব্যক্তিগত দুর্দৈবের উপরে তুলে রেখেছিলেন বৃহত্তর মানব চেতনার দীপশিখাটি। শেষে অর্থাভাবে চিকিৎসা-বিভ্রাট পর্যন্ত ঘটেছে। কিন্তু চিরজীবী হয়ে থেকেছে একটি চিরবিদ্রোহী জিজ্ঞাসা—তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীল শিল্পিসত্তা। একটি নির্মম বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্তি, যা নিজেকে বিস্মৃত থেকে পরকে হাত ধরে নিয়ে যায় তার বাঞ্ছিত 'ময়না দ্বীপে', হুসেন মিঞার স্বপ্নের দেশে।

॥ চার ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য আলোচনায় বসে স্বভাবতঃ বিদেশী কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনার কথা মনে আসে। একদিক থেকে অনেকের সঙ্গেই তিনি তুলনীয়, আরেকদিকে থেকে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ যাত্রী, সেখানে তুলনা তাঁর নেই।

মনে পড়ে ডস্টয়েভ্স্কি এবং ডি, এইচ, লরেন্সের কথা, মনে পড়ে জেম্স জয়েস, টমাস মান, ফ্রানজ কাফ্কা এবং আলবেয়ার ক্যামুর কথা। কিন্তু এঁদের সকলের সঙ্গে মানিকের মিলের চেয়ে অমিলটাই বেশি। ডস্টয়েভ্স্কির এক

নায়ক অন্ধকারের স্মারকলিপি লেখে, আরেক নায়ক খুন করে আত্মদহনে দগ্ধ হয়ে শেষে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনকালে খ্রীস্টের চরণে শরণ নেয়, আরেক নায়ক খুন না করেও শাস্তি পায়। মনের গহনে ডস্টয়েভ্স্কির স্বচ্ছন্দ বিচরণ। কিন্তু পাপাচার থেকে উদ্ধারের জন্যে পতিতপাবন যীশুর শরণ নিতে তাঁর অনেক নায়ক-নায়িকাই বাধ্য হয়। খ্রীস্টীয় পাপবোধই তাদের মুক্তির পথ দেখায়। মানবশক্তির দুঃখজয়ী অভিযানে মানিকের নায়ক-নায়িকাদের মতো তারা এগোয় না।

লরেন্সের লেখায় শ্রমিক জীবনের সুষ্ঠু চিত্রায়ন আছে, (Sons & Lovers), ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিকৃতি সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ আছে। কিন্তু তাঁর মূল প্রতিপাদ্য কামশক্তির সহজ স্বীকৃতি। এর প্রবল প্রতাপকে সাদরে বরণ করে নিয়ে প্রাকৃত (natural) জীবনের রস আকণ্ঠ পান করাতেই আনন্দ। 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিকে'র মেলোস এবং কনির সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এই রকমই। কিন্তু যৌনজীবন মানিকের কোনো উপন্যাসেরই মৌল বিষয় নয়, সে জীবনের সীমাকে অতিক্রম করে যাবার প্রতিশ্রুতিতেই মানিক-সাহিত্য বলীয়ান।

জেমস জয়েসের 'ইউলিসেস'-এর নায়ক-নায়িকা পারিবারিক জীবনেও বিচ্ছিন্ন। নায়ক লিওপোল্ড ব্লুম ডাব্লিনের পথে পথে প্রায় লক্ষ্যহীন পরিক্রমা করে, বাইরে প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের রাস্তা দেখে, এদিকে স্ত্রী মেরী ব্লুম প্রেমিক-মিলনের নিশীথ-স্বপ্নে বিভোর। এরা ঘরে থেকেও ছিন্নমূল। পুরোনো মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে, নতুন কোনো আলোর ঠিকানা জানেনা।

টমাস মানের 'যাদুপর্বতে'র অদৃশ্য মায়ায় সুস্থ লোকও যক্ষ্মাবীজাণুতে আক্রান্ত হয়। হান্স্ কাস্ট্রপ সেই মায়ার শিকার। কাফ্কার নায়ক জোসেফ কে. (K.) এক অধরা কল্পলোকের স্বপ্নে বিভোর, বাস্তবের সঙ্গে সেই রহস্যময় জগতের কোনো মিল নেই। 'বিচার' এবং 'দুর্গপ্রাসাদ' উপন্যাসদ্বয়ের বিচারগৃহ ও প্রাসাদের গোলক-ধাঁধায় শুধু ঘুরে ঘুরেই মরতে হয়, এদের থই পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ক্যামুর নায়ক মিউরসল্ট জীবনের ক্ষেত্রে বহিরাগত (outsider), চিরন্তন কোনো বোধে উত্তীর্ণ হবার জন্যে তার সমাজদ্রোহ নয়, ক্ষণমুহূর্তের আনন্দ সম্ভোগেই তার তৃপ্তি।

বলা বাহুল্য, এই ছিন্নমূল ক্ষণবাদী জীবন-সম্ভোগের আঙ্গিনায় সম্ভোগ অতৃপ্তির হেতু, আঙ্গিনায় সবুজ ফসল ফলে না। সবই ধূসর 'পোড়ো জমি',

এলিয়টের ভাষায় মানুষগুলিও ফাঁপা, অন্তঃসারহীন (The Hollow Men)।

মানিক-কথাসাহিত্যে বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরোত্তর কালের অন্ধকার যুগের প্রতিফলন আছে। উচ্চবিত্তের অনাচার, মধ্যবিত্তের কুটিলতা এবং নিম্নবিত্তের রিক্ততার প্রেক্ষাপটে মানিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মানুষের স্বপ্ন দেখেছেন। আর এই স্বপ্ন দেখার মধ্যেই যে-কোনো বাস্তবতাবাদী শিল্পীর সৃষ্টিকর্মের প্রাণপাখীটি লুকিয়ে থাকে। প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছিলাম, মানিক বৈজ্ঞানিক নিরাশক্তির শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে শিল্পসাধনা করেছেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি স্বপ্নবর্জিত নয়। বৈজ্ঞানিক কি স্বপ্ন দেখেন না! জগদীশ বসু তো 'অব্যক্ত'কে ব্যক্ত করার আকাঙ্ক্ষায় উন্নত শিল্পী। এই শিল্পীর জীবন ভাবনাটি 'পোড়ে জমি'তে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মধ্যে আটকে থাকে না। বাস্তবে রূপায়িত হবার সংগ্রামে উদ্দীপ্ত হয়। মানিক নিজেই তাঁর এই জীবন-বিশ্বাসের স্পষ্ট ভাষ্য রচনা করে বলেছেন, "...লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিতটা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতার উপর। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসেরই চরিত্র, মাটির মানুষ হয়েই তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে। যত অসম্ভব ঘটনাই ঘটুক উপন্যাসে, সম্ভাব্য ঘটনাকে আশ্রয় করেই তাকে কাল্পনিক অসম্ভবতার স্তরে উঠতে হবে।"[৬]

এই ধরণের বাস্তবলগ্ন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনাসমৃদ্ধ সাহিত্যই মানিকের দৃষ্টিতে 'প্রগতি সাহিত্য'। অন্যত্র মানিকের উক্তি স্মরণযোগ্য :

"...বস্তুবাদী প্রগতিশীল লেখক বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। বস্তুবাদী লেখক অবশ্যই বাস্তবতার রিপোর্টার নন, তিনি শিল্পী—তিনিও কল্পনার রঙে-রসেই তাঁর কাহিনী রূপায়িত করবেন, কিন্তু মিথ্যার সঙ্গে তাঁর কল্পনার কারবার থাকবেনা।"[৭]

এ প্রবন্ধের গোড়ার দিকে বলেছিলাম—কথাসাহিত্যে মানিক অনুচ্চকণ্ঠ ভাববিপ্লবী। বৈজ্ঞানিক চেতনা মানব-জীবন বিশ্লেষণে তাঁকে করেছে নির্মোহ নিরুচ্ছ্বাস শিল্পী। কিন্তু কবিচেতনা তার কলমকে করেছে তরবারি। সেখানে তিনি বিপ্লবের উচ্চকণ্ঠ চারণ-কবি। নব-ভবিষ্যতের আলোকিত সৌধ-নগরী নির্মাণের দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় সেখানে কথাসাহিত্যিক বিপ্লবী কবি।

৬। উপন্যাসের ধারা—লেখকের কথা, পৃঃ ৬১-৬২।

৭। সাহিত্যসমালোচনা প্রসঙ্গে— ঐ ; ৯০-৯১

তাঁর কণ্ঠে 'পোড়োজমি' থেকে জঞ্জাল অপসারণের দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা তাঁর কথাসাহিত্যে অনতিলক্ষ্য, কিন্তু কবিতায় বলিষ্ঠ উচ্চারণের শক্তিতে স্বয়ম্প্রকাশ। এই রকম কবিতার কিছু উদ্ধৃতি দিয়েই মানিকের বৈপ্লবিক প্রতিজ্ঞার পরিচয় লাভান্তে বর্তমান আলোচনায় ইতি টানলাম :

"আমার জগতে কাল মানুষের জন্মক্ষণ থেকে
তিলে তিলে করেছে সঞ্চয়
মহাসম্ভাবনাময় যে মহাবিপ্লব,
আমি তার আত্মীয়তা চাই।"

এবং

"অনেক জমেছে আবর্জনা,
অচল হ্রদের তীরে বহুদূর পচে গেছে মাটি।
ঝড়ে ও বন্যায় তাকে ধুয়ে নিতে হবে ফাঁকি,
পচা জল, বন্ধ্যা মাটি, আতরে আচ্ছন্ন মৃত বায়ু।
এসো সাথী, একার আকাশ ছেড়ে এসো।"

ব্যক্তিসুখের নিরাপদ দুর্গ থেকে বার হয়ে সম্মিলিত মানুষের বিপদসঙ্কুল যাত্রায় সাথী হবার আহ্বানেই মানিক-সাহিত্যের চিরস্থায়ী আবেদন।

সমাজচিন্তা

৪৪-তম সংশোধনী বিল

ভারতীয় সংবিধানের ৪৪-তম সংশোধনী বিলটির খসড়া সংসদে পেশ করা হয়েছে। দেওয়ালীর পরবর্ত্তী অধিবেশনে তার উপরে বিচার বিতর্ক হবে এবং সম্ভবতঃ সামান্য অদল বদল হয়ে সেটি ঐ অধিবেশনেই গৃহীত হবে।

যেহেতু দেশে এখন আপৎকালীন জরুরী অবস্থা বলবৎ এবং আরো স্মর্ত্তব্য যে, বর্ত্তমান লোকসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে তা' এখন জরুরী অবস্থা সাপেক্ষে বর্দ্ধিত মেয়াদে কাজ করছে—সেই কারণে, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি সংশোধনী প্রস্তাব, আগামী নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত মুলতবী রাখাই সঙ্গত,—এরূপ মত আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করেছি। এখনো সেই কথাই বলি।

এই সংশোধনের ফলে সংবিধানের ৫৫টি ধারা নাকি কমবেশী বদলে

যাবে এবং এর বয়ান এতোই দীর্ঘ যে তা নাকি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অপেক্ষাও বিপুলায়তন। তা ছাড়া, এর বলে সরকারের হাত এত বেশী শক্তিশালী হবে যে প্রায় নিরঙ্কুশ ভাবে, আদালতের তোয়াক্কা না করে যে কোনো বিল বা আইন সে পাশ করাতে পারবে, শুধু এই ব'লে যে, সে-আইন সংবিধানেরকোনো নির্দ্দেশক নীতি (Directive Principle) রূপায়নে আবশ্যক। এরূপ পাইকারী হারে আদালতের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ফলে সংবিধানের ভারসাম্য,—আইনসভা, মন্ত্রীসভা ও বিচারবিভাগের মধ্যের ভারসাম্য—নষ্ট হওয়ার সমূহ আসঙ্কা। সরকারের অতিক্ষমতা প্রজাসাধারণের পক্ষেও সর্বদা কল্যাণকর হয় না। ক্ষমতার আতিশয্য আপন নিয়মেই যথেচ্ছচারিতার দিকে এগিয়ে যায়। সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে একটা দুর্গতি।

যে-সব আইন বা সরকারী নির্দ্দেশ বেআইনী বলে' বা সংবিধান-বহির্ভূত বলে' সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট দ্বারা ইতিপূর্ব্বে নাকচ হয়ে গিয়েছিল, তা ও না, কি—এই সংশোধনের বলে, শুধু যে সিদ্ধ বা চালু হবে তা-ই নয়। অতীতেও যে-যে ক্ষেত্রে সেগুলি প্রতিষিদ্ধ হয়েছিল সেই সেই স্থলে তা যেন মন্ত্রশক্তিতে জেগে উঠে অবাধে কার্য্যক্ষম হবে এবং পেছনের দিকেও ওলট-পালোট ঘটাবে। এই যে সম্মুখবর্ত্তী, পশ্চাৎবর্ত্তী, উভয়মুখী কার্য্যকারিতা, আইনের ক্ষেত্রে এটা অভিনব ;এবং নাগরিকের আইনগতনিরাপত্তা এর দ্বারা বিশেষ সঙ্কুচিত হয়। সংসারে কিছুই স্থির নয় এটা সবাই জানে এবং গণ-তন্ত্রে ক্ষমতাসীন দল বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আইনের রদবদল হয় এটাও স্বীকৃত। কিন্তু আইন যদি কেবলমাত্র পরবর্ত্তী পর্য্যায়কেই নিয়ন্ত্রিত না করে' ভূতকালেও প্রবেশ করে'তছ্‌নছ্‌ সুরু করে তা হলে মানুষ কোথায় দাঁড়াবে? আইনসভার হাতে—কার্য্যত মন্ত্রীসভার হাতেই—এত বেশী ক্ষমতা প্রজার দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে।

লোকসভার মেয়াদ ছয়বছর স্থায়ী করার প্রস্তাব

বর্তমানে লোকসভার মেয়াদ পাঁচবছর স্থায়ী। এ-কে বাড়িয়ে ছয় বছর করার একটি সরকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে।

আমরা এ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করি।

বর্তমানযুগের প্রচণ্ড গতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে—যেখানে সর্বক্ষেত্রে মানুষের যান্ত্রিক কার্যক্ষমতা ও যন্ত্রবাহন গতি অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে—পাঁচ বছরই খুব দীর্ঘ সময়।

উনবিংশ শতাব্দীতে যা করা সম্ভব ছিল এখন বহুগুণ উন্নত ও অভিনব যন্ত্র সাহায্যে তার অন্তত বিশগুণ কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। কাজেই এখনকার পাঁচ বছরে আগেকার দিনের বহুগুণ বেশী কাজ করা যায়। তাই এখন কোনো দল পাঁচবছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার অর্থই অনেক কাজ (ও অকাজ) তার দ্বারা ঘটা সম্ভব। পাঁচবছর সময় কম এই অজুহাত এখন একেবারেই টেঁকে না। বরং পাঁচবছর সময়ই আজকের 'ইলেকট্রনিক' যুগে একটু বেশী বলে' মনে হয়। এ-কে কম করে স্বচ্ছন্দে চার বছর করা চলে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের কার্য্যকাল চার বছর মাত্র, এবং দীর্ঘকাল যাবৎই তাই চলে আসছে।

আমরা লোকসভার মেয়াদ কমিয়ে চারবছর করার প্রস্তাব করি।

সংসদ-সদস্যদের 'পেনসন' দানের প্রস্তাব

আরেকটি প্রস্তাবও হয়েছে যে, সংসদ সদস্যদের পেনসন দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের ক্ষেত্রেও তা অচিরেই প্রযোজ্য হবে। সদস্যদের ভাতা ইত্যাদি বিরাট বোঝা। তার উপর যদি তাদের ঢালাও পেনসনের ব্যবস্থা করতে হয় তা হলে ঢাকের দামে মনসা বিকানোর অবস্থা হবে। এম, পি-দের অবস্থা খারাপ তো দেখিনা। অনেকে তো ধনীই। তাঁরা যদি এর উপর পেনসনও পান তা হলে একটু দৃষ্টিকটুও হবে।

ইমারজেন্সীর শিথিলীকরণ

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ইদানীং কয়েকটি সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, ইমারজেন্সী পূর্বাপেক্ষা অনেক শিথিল করা হয়েছে এবং প্রাক্-সেন্সরশিপ প্রায় সর্বত্রই তুলে নেওয়া হয়েছে। সেন্সরশিপের, কড়া-কড়িও হ্রাস করা হয়েছে। এসবই শুভ সংবাদ এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতির সূচক।

অপ্রিয় সংবাদ ও সমালোচনার অবারিত প্রকাশের মধ্যেই গণতন্ত্রের প্রাণবত্তা ঘোষিত হয়ে থাকে।

আমাদের খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন

পরপর দুই বৎসর সুবর্ষণ হওয়ায় এবং উন্নত বীজ সার সেচ ও কৃষি-বিদ্যার ব্যবহার দ্বারা ভারত খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিদেশ থেকে এখনো কিছু শস্য আমদানি করা হলেও তার পরিমাণ সামান্যই এবং তা মুখ্যতঃ দুর্দিনের বিরুদ্ধে সঞ্চয় ভাণ্ডার নির্মানের উদ্দেশ্যেই

নিয়োজিত হচ্ছে। এ নিশ্চয়ই আনন্দের সংবাদ এবং আমরা এ সাফল্যের জন্য কিছু গর্বও অনুভব করতে পারি।

তবু খাদ্যোৎপাদনে এই প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও সরকারী খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন কেন লক্ষিত হচ্ছে না তা অনেকেরই জিজ্ঞাস্য। মাথা-পিছু রেশনবরাদ্দ এখনো তেমন বাড়ানো হয়নি। এই সেদিন পর্য্যন্ত ৫০০ গ্রাম চাল, এবং তা-ও ভিন্‌দেশী আতপ, ছিল বৃহত্তর কলকাতাবাসীদের জন্য সরকারী বরাদ্দ। গমের বরাদ্দ সুপ্রতুল হলেও তণ্ডুলের পরিমাণ সেই ছয়বছর আগের মতোই নামমাত্র রয়ে গেল কেন, এ-প্রশ্ন অনেককেই উদ্বেজিত করেছে। এবং রেশনের চালের পরিমাণ ও গুণগত অপকর্ষ অপরিবর্ত্তিত থাকার কারণেই কলকাতার ফুটপাথের খোলা বাজারে চালের দাম এখনো এত চড়া। আমাদের খাদ্যোৎপাদনের 'রেকর্ড' তার উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না।

সম্প্রতি ইদ ও দুর্গাপূজা উৎসবের প্রাক্কালে কিছু বেশী চাল (৫০০ গ্রাম) এবং তার কিছু অংশ সিদ্ধ চালে দেওয়া হচ্ছে। এটা কতদিন বলবৎ থাকবে জানিনা। কিন্তু এখনো বারো আনা অংশ আতপ চাল বলে' অনেককেই বাইরে কিনতে হয় চাল।

বাজারে জিনিষ পত্রের দাম যে এখনো ঊর্দ্ধমুখী তারও একটা কারণ, চালের দামের এই চড়াভাব। রেশনে ভালো সিদ্ধ চাল মাথাপিছু দুই কিলো করে দিলে কাউকেই বোধ হয় আর বাজারে চাল কিনতে যেতে হতো না। এবং চালের দাম পড়ে' গেলেই তরি তরকারী মাছ সবেরই দাম নিম্নমুখী হতো।

উৎপাদন প্রাচুর্য্যের কথা আমরা শুনি, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রমদুর্মূল্যতা আমাদের হতবুদ্ধি করে। সাধারণ মানুষ উচ্চতর আর্থনীতিক তত্ত্ব বোঝে না,—তারা অধিক ফলনের সঙ্গে সুলভতার সাযুজ্যে বিশ্বাস করে। এটা যদি তারা না দেখে তারা নানারূপ জল্পনা করে। সরকারের খাদ্যনীতির সাফল্য জনগণের কাছে প্রত্যক্ষগম্য করতে হলে' সরকারের বরাদ্দ খাদ্যের পরিমাণ দরাজ হাতে বাড়াতে হবে। অন্ন যে বহুগুনিত হয়েছে তা তার সুলভতা দ্বারা সকলের গোচরীভূত হোক।

কলকাতার পরিবহন সমস্যা ও প্রাইভেট বাস

কলকাতার পরিবহন সমস্যা নাকি সমাধানের বাইরে। ভূগর্ভরেল হলে'

হয়তো কিছু সুরাহা হবে, কিন্তু ততদিনে হয়তো সমস্যাটার আয়তন ও জটিলতা-ও আরো বহুগুণ বেড়ে যাওয়ার ফলে ভূগর্ভরেলপথও হয়তো সমাধানের নাগাল পাবে না।

সম্প্রতি কয়েক বছর বেশ কিছু 'মিনি' বাস চালু হয়েছে। প্রাইভেট বাসের সংখ্যাও ক্রমেই বাড়তির দিকেই। এমন কি গড়ে' রাস্তায় যেখানে একটি সরকারী বাস দেখা যায় সেখানে চারটি প্রাইভেট বাস ও পাঁচটি 'মিনি' বাস চোখে পড়বে। তবু কলকাতার পরিবহন সমস্যার সামান্যই সুরাহা হয়েছে।

এই অতি কঠিন সমস্যা সমাধানের কোনো ইঙ্গিত আমরাও দিতে পারবো না। তবে দু-একটি কথা বলবো। তার একটি প্রাইভেট বাস সম্পর্কে। পশ্চিম বাংলার সর্ব্বত্রই এরাই মুখ্য পরিবাহক। কলকাতার পথেও এরা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় অনুপ্রবেশ করছে। এতে আমাদের আপত্তির কোনো কারণই থাকতো না, যদি এই বাসগুলি 'বাস' নামের যোগ্য হতো। ট্রাকের চ্যাসিসের (chassis) উপরে কাঠের খাঁচা বসিয়ে তার চার মুড়োয় চারখানি বেঞ্চির ব্যবস্থা করলেই হয়ে গেল। গায়ে টিন বা এলুমিনিয়মের চাদর। কিন্তু স্প্রিং ? তা নমনীয়তায় মালবহনের লরীরই যোগ্য। বেঞ্চগুলির পেছনের হেলান দেওয়ার জায়গাটা কেমন ? হেলান দিলে প্রতি মুহূর্তেই যন্ত্রণা, পিঠে কেটে বসবে। কিন্তু না দিয়েও উপায় নেই কারণ বাসের পড়ি-মরি ছোটার ফলে আপনি বারে বারেই সেই ঠেসের গায়ে আছড়ে পড়বেন। ভিড় একটু কম হলে দাঁড়িয়ে আসাই সুবিধার। কিন্তু সাধারণতঃ ভিড়ের ধাক্কায় আপনি আপনার জামা কাপড় দূরস্থান হাত পা'র হিসেবও রাখতে পারবেন না।

কলকাতা নাকি ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। এখানকার মানুষ নাকি বেশী সংবেদনশীল ও আরামপ্রিয়। কলকাতার এই প্রাইভেট বাসগুলি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য, এগুলি কলকাতা ও পঃ বাংলার কলঙ্ক। এতো বে-আরামের পরিবহন ব্যবস্থা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে বলে' আমরা জানিনা। বাঙ্গালী সহ্য করছে তার কারণ তারা নিরুপায়। এই ছাদবিশিষ্ট ট্রাকে গরুছাগলের মতো পরিবাহিত হয়েও তারা যে সময় মতো আপিসে পৌঁছুতে পারছে এতেই তারা সুখী ও কৃতজ্ঞ। কিন্তু এটা-যে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির অপমান তাতে তো কোনো ভুল নেই ? এই অপমান

মোচনের জন্য আমরা পঃ বঙ্গ সরকারকে আহ্বান করছি। তাঁরা প্রাইভেট বাসগুলিকে ষ্টেট বাসের মতো আরামের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করুন। অন্যথায় তাদের লাইসেন্স রদ করুন। তারা যখন ষ্টেট বাসের সমান ভাড়া নেবে তখন তারা তুল্য Passenger comfort বা যাত্রী আরামের আয়োজনে কার্পণ্য করবে কেন? কলকাতায় আরো অধিক প্রাইভেট বাস চলুক আপত্তি করিনা, কিন্তু তা যেন উন্নততর মানের বাহন হয় এটা সরকার দেখবেন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও সুভাষচন্দ্র

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী যে অহিংস আন্দোলন গড়ে ওঠে, ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ ও ভারতের স্বাধীনতালাভ কি একান্তভাবে তারই ফলশ্রুতি? অথবা সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ ফৌজের অবদানও সেখানে সমমর্যাদার? সরকারী আনুকূল্যে রচিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদহিন্দের গৌরব বিশেষ স্বীকৃত হয়নি। গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের কৃতিত্বই প্রায় ষোলআনা, এটাই তাঁদের বক্তব্য।

কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর মতে সুভাষের অবদান গান্ধীজীর সমতুল্য। আজাদহিন্দফৌজের আদর্শের অনুপ্রেরণায় নৌ-সেনা বিদ্রোহ না ঘটলে এবং ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের অভাবনীয় অপহ্নব না ঘটলে ইংরেজ আতঙ্কিত হয়ে ভারত ছাড়তো না। অন্ততঃ যখন ছেড়েছে তখন তা নয়ই—ডঃ মজুমদারের এটাই দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি তাঁর অনেক রচনায়, বিশেষ তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস-এর ৪র্থ খণ্ডে, এই মত স্থাপন করেছেন।

এই অনুষঙ্গে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ফনীভূষণ চক্রবর্ত্তীর একটি চিঠি জয়শ্রী পত্রিকার গত আষাঢ় (১৩৮৩) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিখানি ঐতিহাসিকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দালিল হিসাবে গণ্য হবে।

এই পত্রে শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী লিখেছেন যে, তিনি যখন পঃ বঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল ছিলেন (১৯৫৬) তখন ভূতপূর্ণ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড এ্যাটলি—ভারতবর্ষকে স্বাধীনতাদান যাঁর প্রধান মন্ত্রীত্বের কালে নিষ্পন্ন হয়—ভারত ভ্রমণে আসেন এবং তৎকালে দুইদিন কলকাতা রাজভবনে অতিথি রূপে বাস করেন। সেই সময় শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী তাঁকে ব্রিটিশদের ভারতত্যাগেরপ্রকৃত

কারণগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উত্তরে এ্যাটলি যা বলেন তা খুবই তাৎপর্য্য-পূর্ণ। আমরা শ্রীচক্রবর্ত্তীর চিঠিখানির উক্ত অংশটি এখানে উদ্ধৃত করছি :—

"আমি তাঁহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে গান্ধীর Quit India আন্দোলন তো ১৯৪৭ সালের বহুপূর্ব্বেই মিয়াইয়া গিয়াছিল, ১৯৪৭ সনে এমন কোন পরিস্থিতি বর্তমান ছিল না যাহার জন্য ইংরেজদের তাড়াহুড়া করিয়া এদেশ ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল—তবে তাহারা গেল কেন? উত্তরে এ্যাটলি কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নেতাজী সুভাষ বসু কর্তৃক ভারতের স্থল-বাহিনী ও নৌবাহিনীভুক্ত দেশীয় সেনানীদের ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া। অলোচনার শেষের দিকে আমি লর্ড এ্যাটলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইংরেজদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীর কার্য্যকলাপের প্রভাব কতটা ছিল? এই প্রশ্ন শুনিবার পর এ্যাটলির ওষ্ঠদ্বয় একটা অবজ্ঞাসূচক হাস্যে বিস্তৃত হইল এবং তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন, mi-ni-mal!

"লর্ড এ্যাটলির সঙ্গে আমার এই আলাপের কথা নেতাজী ভবনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম। All India Radio সেই বক্তৃতার বিবরণ broadcast করিয়াছিল, কিন্তু এ্যাটলির নেতাজীর সম্পর্কিত কথাগুলি বাদ দিয়া।"

শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তীর এই পত্রখানি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আষাঢ় (১৩৮৩) সংখ্যা "জয়শ্রী-তে" ঐতিহাসিক দলিল/ভারতের মুক্তিসংগ্রামে নেতাজীর অবদান সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অভিমত", এই আখ্যাত নিবন্ধে প্রকাশ করেছেন।

লর্ড এ্যাটলি আর ইহলোকে নেই।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তীও একদিন গত হবেন। তাই তাঁরই লিপিনিবদ্ধ এ্যাটলির এই পরম গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তীর নিভীক সত্যনিষ্ঠার কথা সর্বজনবিদিত।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিশতবর্ষজয়ন্তী—

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ৪-ঠা জুলাই—১৩টি রাজ্য নিয়ে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র রূপ সাধারণতন্ত্রের পত্তন হয়। তৎপূর্ব্বে তাঁরা বীর্যবলে ব্রিটিশ শাসনের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করেন। পরবর্ত্তী মানব-ইতিহাসে আমেরিকান যুক্ত

রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আদর্শ—গণতান্ত্রিক আদর্শের উদাত্ত ঘোষণা।—স্বাধীনতাকামী সকল জাতিকেই অনুপ্রাণিত করেছে। আমেরিকা শুধু গণতন্ত্রের আদর্শই ঘোষণা করেনি সেই আদর্শকে এই দু'শো বছরকাল অপরিক্লান্ত উদ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছে। শুধু তাই নয়, সেই আদর্শকে আরও ব্যাপক, আরও উদার, আরও উত্তুঙ্গ, আরও সংগ্রামী করে তুলেছে। আমরা এখানে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার দলিল (Declaration of Independence) থেকে একটি অতিখ্যাত অংশ উদ্ধৃত করছি :

"We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that They are endowed by the Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে আদালতের ক্ষমতা, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা সর্বোচ্চে। জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারের "গ্যারান্টি"-ও আদালতের ঐ অপ্রতর্ক্য ক্ষমতায়। স্বয়ং প্রেসিডেন্টও আদালতের অধীন। তাঁর অপরাধও—এমনকি রাজনৈতিক দুর্নীতির অপরাধও—আদালতেই বিচার্য্য এবং আদালতের রায়কেই নতশিরে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে তিনিও বাধ্য। সাম্প্রতিক কালে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে যেভাবে আদালতের নির্দ্দেশে ক্ষমতার আসন থেকে সরে যেতে হলো গণতন্ত্রের ইতিহাসে সেরূপ কোনো নজির আর নেই। গণতান্ত্রিকতা আমেরিকার প্রাণবায়ু ও জীবনচর্য্যায় ওতপ্রোত,—শুধুমাত্র সেনেট বা পার্লিয়ামেন্টের সামগ্রী নয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক ৯/৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ স্থিত ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ কলিকাতা ৩২ হইতে প্রকাশিত।

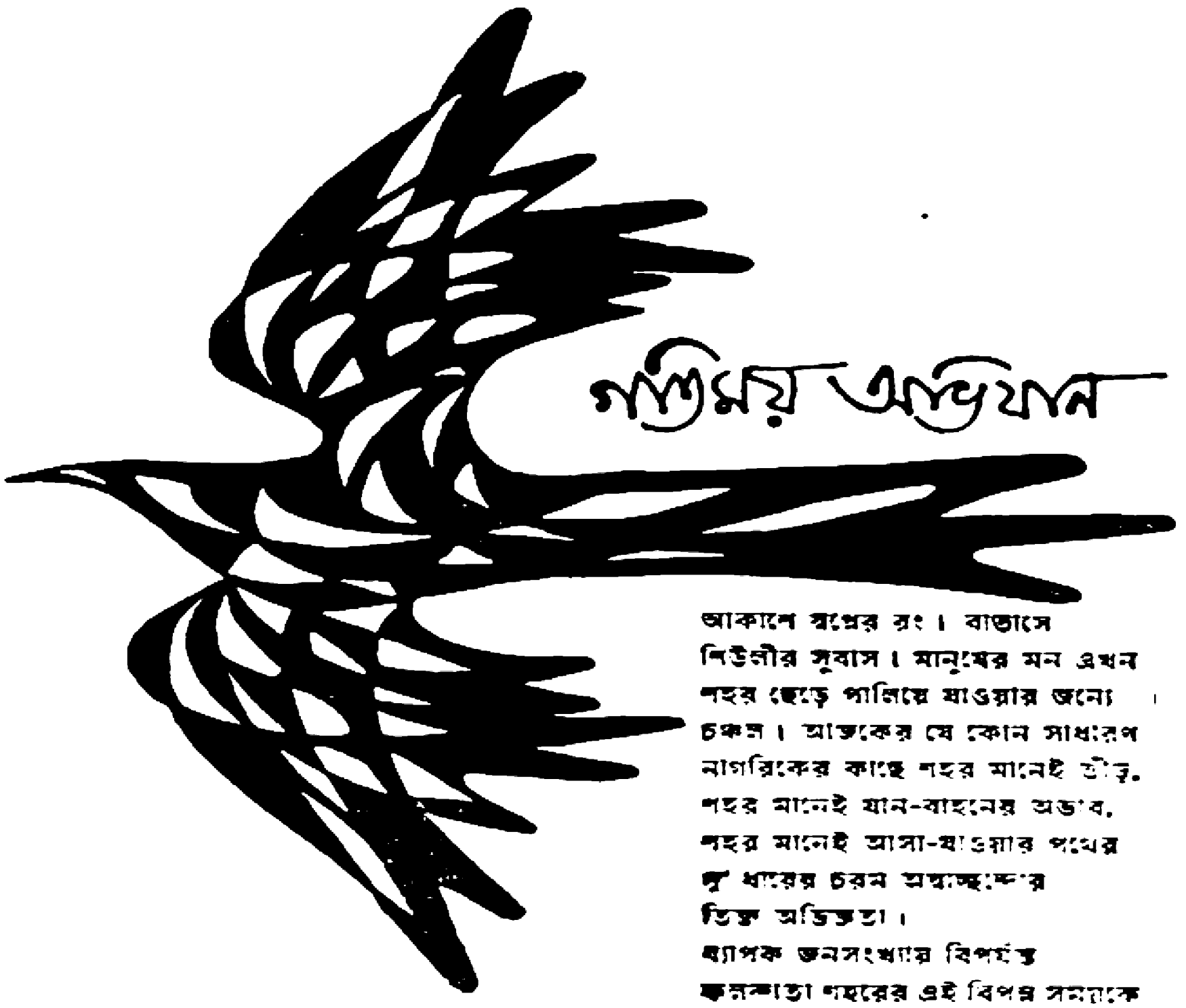

গতিময় অভিযান

আকাশে স্বপ্নের রং। বাতাসে
নিউলীর সুবাস। মানুষের মন এখন
শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে
চঞ্চল। আজকের যে কোন সাধারণ
নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়,
শহর মানেই যান-বাহনের অভাব,
শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের
দু'ধারের চরম অব্যবস্থাদীর্ণ
ভিক্ত অভিজ্ঞতা।
ব্যাপক জনসংখ্যার বিপর্যস্ত
কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সমস্যাকে
পটভূমিকায় রেখেই ভূগর্ভ-রেলের
ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা। ভূগর্ভ
রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ
যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের
প্রতিশ্রুতি। ভূগর্ভ রেল মানেই
জাতীয় শক্তি সমৃদ্ধির পথে এক
গতিময় অভিযান।

MJ

কলকাতার মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

Registration No. R. N. 18431/70
ALEKHYA Vol. VII Nos. 1 & 2 July—O

CENTRAL LIBRARY

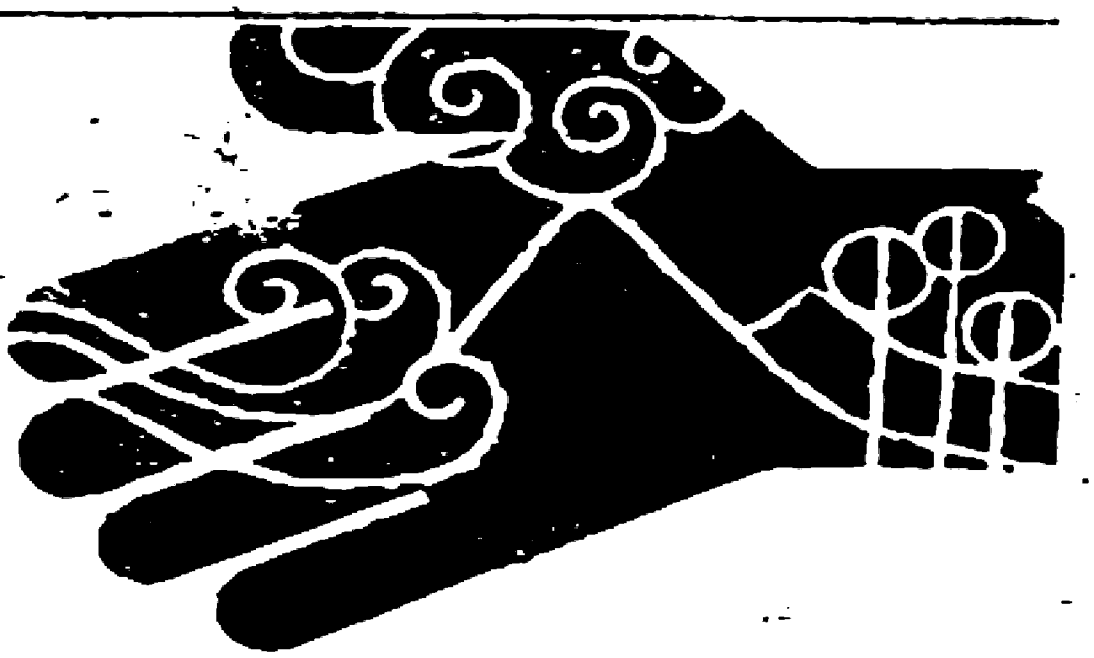

আকাশে শরৎ। মানুষের মন
এখন মেঘের সঙ্গী। ছুটতে চায়
দূর দিগন্তে যেদিকে নদী, সমুদ্র,
পর্বত, যেদিকে সৌন্দর্য এবং
সুষমা। আমরা জানি। এবং
আমরা প্রস্তুতও। মানুষের আসা-
যাওয়ার পথের ধারে আমরা
বাড়িয়ে আছি হাত সাহায্যের,
সৌজন্যের, সহযোগিতার।
বিনিময়ে প্রত্যাশা শুধু একটাই।
তার নাম শৃঙ্খলা। জীবনের
চলা-হাঁটার সাথে শৃঙ্খলাও এক
সৌন্দর্য।

পূর্ব রেলওয়ে

1978